রাজনৈতিক মতবাদের ইতিহাস

রাজনৈতিক মতবাদের ইতিহাস

চার খণ্ডে

রাজনৈতিক মতবাদের ইতিহাস

খণ্ড ১ প্রাচীন জগৎ ও মধ্য যুগ

ধ্রুবপদী ১২, বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট, কলকাতা-৭০০০৭৩

Anti Duhring · Frederick Engels : a Bengali Translation by Deepak Roy.

প্রকাশিকা : প্রীতি মুখার্জী, ১২ বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট, কলকাতা-৭০০০৭৩

মুদ্রক : অমি প্রেস, ৭৫ পটলডাঙ্গা স্ট্রীট, কলকাতা-৭০০০০৯

প্রকাশকাল : ডিসেম্বর, ১৯৬০।

প্রচ্ছদ : প্রবীর সেন

সূচী

ভূমিকা

মার্কসীয় ঐতিহ্য অনুসারে সোভিয়েত ব্যবহারশাস্ত্র যেমন রাজনৈতিক চিন্তার ঐতিহাসিক বিকাশ, তেমনি তার বর্তমান অবস্থার গবেষণায় সর্বদাই মনোনিবেশ করে থাকে।

রাজনৈতিক মতবাদের ইতিহাস বিশ্লেষণকে সত্যিই ফলপ্রদ হতে হলে সর্বাগ্রে সে মতবাদের বিষয়বস্তু, তার গবেষণা ও প্রস্তাবাদি, রাজনৈতিক ভাবনা সমাহারের ব্যবস্থা ও কাজ, তার নির্ধারক সামাজিক-ঐতিহাসিক করণিকা, ইতিহাস ও সমকালের পারস্পরিক সম্পর্কের পরিষ্কার ধারণা থাকা চাই; শেষোক্ত বিষয়টির জ্ঞান রাজনৈতিক তত্ত্বের ক্রমবর্ধমান সামাজিক গুরুত্বের পরিস্থিতিতে, বিপরীত মতাদর্শের গ্রহব্যাপী সংগ্রামের তীব্রতা বৃদ্ধির ক্ষেত্রে অতি জরুরি।

যে বনিয়াদী প্রশ্নগুলির কথা বলা হল, তার সঙ্গে অন্যান্য কতকগুলি প্রশ্নও নিবিড়ভাবে জড়িত, হয়ত সেগুলি তেমন সাধারণ চরিত্রের নয়, কিন্তু সমান গুরুত্বপূর্ণ। যেমন: রাজনৈতিক মতবাদ জিনিসটা কী; রাজনৈতিক তত্ত্বে অবজেকটিভ ও সাবজেকটিভ; পারস্পরিক প্রতিক্রিয়ায় রাজনৈতিক তত্ত্ব ও প্রয়োগ; ভাবাদর্শ ও শ্রেণী সংগ্রাম, রাজনৈতিক চিন্তার বিকাশে উত্তরাধিকার ও 'উল্লম্ফন'; মানসিক কর্মের ক্ষেত্র হিশেবে রাজনৈতিক বৈজ্ঞানিক সৃজনশীলতা।

পরবর্তী কোঠার প্রশ্নগুলি আরো বেশি মূর্ত-নির্দিষ্ট, কিন্তু কম গুরুত্বপূর্ণ নয়। এগুলি সম্পর্কে কোনো সিদ্ধান্তে আসা যায় কেবল মূর্ত-নির্দিষ্ট মালমশলার ঐতিহাসিক, তুলনামূলক ইত্যাদি বিশ্লেষণ মারফত (যেমন, মার্কসবাদ ও প্রাক্‌মার্কসবাদী রাজনৈতিক চিন্তা; ক্লাসিক্যাল ও আধুনিক ইউটোপিয়া; মার্কসবাদবিরোধী ভাবাদর্শের বিরুদ্ধে মার্কসবাদী-লেনিনবাদী বিজ্ঞানের সংগ্রাম বিকাশের পর্যায়; গতকাল ও আজকের শোধনবাদ ইত্যাদি)।

এই ভূমিকায় আলোকপাত করা হচ্ছে প্রধানত তিনটি প্রশ্নে, যথা: রাজনৈতিক মতবাদের বিষয়বস্তু, তাতে ইতিহাস ও সমকালের সম্পর্ক, বর্তমান ভাবাদর্শীয় সংগ্রামে তাদের স্থান।

রাজনৈতিক মতবাদের বিষয়বস্তু নির্দিষ্ট হয়েছে একদিকে গবেষণার বিষয় এবং অন্যদিকে এ গবেষণার লক্ষ্য ও কর্তব্য দ্বারা।

সামাজিক ভাবনার জটিল যে চিত্র নিয়ে বেশ কতকগুলি বিজ্ঞান ভাবিত, তার ভেতর থেকে সেইসব দিক আলাদা করা যায় যা রাজনৈতিক মতবাদের বিশেষ ক্ষেত্র। রাজনৈতিক মতবাদের উদ্ভব, পারস্পরিক প্রতিক্রিয়া, বিকাশ, শ্রেণী সমাজের রাজনৈতিক জীবনের ওপর সক্রিয় প্রভাবপাত থেকে গড়ে উঠেছে এই ক্ষেত্রটা। যেমন রাজনৈতিক মতবাদের গতিপথের নিয়মানুগত্য, তেমনি তার সমস্ত ঐতিহাসিক মূর্ত-নির্দিষ্টতা এ ক্ষেত্রটার অন্তর্গত। এতে করে যেমন সাধারণ-তাত্ত্বিক, তেমনি মূর্ত-নির্দিষ্ট ঐতিহাসিক একটা চরিত্র অর্জন করে এ বিদ্যা। জ্ঞানলাভের যৌক্তিক-তাত্ত্বিক আর ঐতিহাসিক-বর্ণনামূলক, দুই রকমেরই পদ্ধতিই প্রযুক্ত হয় তাতে।

ঐতিহাসিক ও সামাজিক-রাজনৈতিক ক্রিয়াকর্মে ব্যাপকতম জনগণের যোগদানে বর্তমান যুগ চিহ্নিত। তাতে মার্কস ও এঙ্গেলসের যে ভবিষ্যদ্বাণী সূত্রবদ্ধ হয়েছিল 'পবিত্র পরিবার' গ্রন্থে, তাই সমর্থিত হয়, যথা: ঐতিহাসিক ক্রিয়াকর্মের গভীরতার সঙ্গে সঙ্গে বাড়ছে ও বাড়বে সেটা যাদের কাজ সেই জনগণের বহুলতা।*

ঐতিহাসিক কর্মের প্রত্যক্ষ কর্তারূপে জনগণের পরিণতিতে নির্দিষ্ট হচ্ছে সামাজিক, রাষ্ট্রিক, আইনী এবং সাধারণভাবেই রাজনৈতিক সমস্যাদির গুরুত্ব, রাজনৈতিক জ্ঞানের খরবেগ প্রসার, যেমন সামাজিক বিকাশের

———

বিশ্বব্যাপী পরিপ্রেক্ষিত নির্ধারণে, তেমনি লোকেদের দৈনন্দিন জীবনে সে জ্ঞানের ভূমিকা ও তাৎপর্য বৃদ্ধি।

মার্কসবাদ ও সমাজতন্ত্রের রাজনৈতিক বাস্তবতার বিরুদ্ধে আক্রমণ চালাবার সঙ্গে সঙ্গে বুর্জোয়া ভাবাদর্শীরা ইতিহাস ও বর্তমান ঘটনাবলিকে মিথ্যা করে দেখাবার প্রণালী সূক্ষ্মতর করে তুলছে, জনগণের ওপর ভাবাদর্শীয় প্রভাবপাতের গুরুত্ব সম্পর্কে তারা সচেতন। রাজনৈতিক ক্ষমতার প্রয়োগ এবং সমাজকে নিয়ন্ত্রণের জন্য অর্থনৈতিক প্রভুত্বের সঙ্গে সঙ্গে গোটা শোষণ ব্যবস্থা সংরক্ষণের শর্ত হিশেবে ভাবাদর্শীয়-মনস্তাত্ত্বিক কারসাজি চালানো হচ্ছে জনচেতনা নিয়ে।

রাজনৈতিক জ্ঞানের ব্যাপারে মূল তাত্ত্বিক দায়টা হল রাজনৈতিক মতবাদের। এ হল রাজনীতি সম্পর্কে তাত্ত্বিক প্রস্তাবাদির নির্দিষ্ট এক-একটা সমষ্টি। যুগের সামাজিক সম্পর্ক থেকে উদ্ভূত রাজনৈতিক মতবাদে সুবিন্যস্ত হয় রাজনৈতিক জ্ঞানের মূর্ত-নির্দিষ্ট রূপগুলি। তাতে পুঞ্জীভূত রূপে প্রকাশ পায় রাজনৈতিক প্রতিপাদ্য, প্রবণতা, আদর্শ এবং নির্দিষ্ট এক-একটা সামাজিক গ্রুপের অবস্থান থেকে তার মূল্যায়ন। রাজনৈতিক মতবাদ হল রাষ্ট্র, রাজনৈতিক ক্ষমতা ও সামাজিক (শ্রেণীগত, জাতিগত, আন্তর্জাতিক ইত্যাদি) সম্পর্ক বিষয়ে তত্ত্বাদি। যেসব ব্যবহারশাস্ত্রীয় মতবাদের সাধারণ-তাত্ত্বিক ও সাধারণ-রাজনৈতিক প্রাসঙ্গিকতা আছে, সেগুলিও তার অন্তর্গত। আধুনিক পরিভাষায় যাকে বলা হয় 'শাখাগত' ব্যবহারশাস্ত্র, তার কোনো কোনো ধারণাও এতে স্থান পেতে পারে, কিন্তু শুধু সেইগুলি যাদের স্বকালে একটা বিশ্ববীক্ষামূলক-নীতিগত ও সাধারণ-রাজনৈতিক চরিত্র ছিল (যেমন, বেক্কারিয়ার মোটামুটি মানববাদী ফৌজদারি-আইনী ধারণা)।

কোনো একটা মূর্ত-নির্দিষ্ট সমাজজীবনের সামাজিক-শ্রেণীগত পরিস্থিতি থেকে রাজনৈতিক তত্ত্বের উদ্ভব ঘটে এবং সেটা তার সঙ্গে অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত।

রাজনৈতিক মতবাদের ইতিহাস শুধু কালানুক্রমিকতায়, সময় পর্বেই নয়, ভৌগোলিকতাতেও ব্যাপ্ত। শেষটার কারণ হল রাজনৈতিক ধ্যানধারণার বিকাশ ঘটেছে এবং ঘটছে সুনির্দিষ্ট এক-একটা সামাজিক-নরকৌলিক জনগোষ্ঠীর জমিতে, পরস্পর থেকে যথেষ্ট পৃথক সাংস্কৃতিক-ঐতিহাসিক অঞ্চলের পরিসীমার মধ্যে। পশ্চিমের বুর্জোয়া পণ্ডিতেরা দীর্ঘকাল ধরে এ বিবর্তনের যে ইউরোপকেন্দ্রিক দৃষ্টিভঙ্গি বপন করে গেছেন, মার্কসবাদ-

লেনিনবাদ তা অগ্রাহ্য করে। মার্কসবাদী-লেনিনবাদী দৃষ্টিকোণ থেকে রাজনৈতিক-আইনী চিন্তার বিশ্ব ইতিহাসের যেকোনো আঞ্চলিক বা নরকুলকেন্দ্রিক অনুধাবন ও ব্যাখ্যা নীতিগতভাবে ভ্রান্ত। প্রত্যেক জাতিই রাজনৈতিক-আইনী জ্ঞানের ভান্ডারে নিজ নিজ স্বকীয় অবদান যোগ করেছে, অন্যকিছু যার স্থান নিতে পারে না। সাম্প্রতিকতম রাজনৈতিক চিন্তার বৈশিষ্ট্য হল তার ভৌগোলিক পরিধির সবিশেষ বিস্তার। ভূতপূর্ব ঔপনিবেশিক দেশগুলির রাজনৈতিক ভাবনা বিশ্বপরিসরে আবির্ভূত হয়েছে অসংকোচে এবং বিশ্ব সংস্কৃতিকে সমৃদ্ধ করেছে। তার ছাপ পড়ছে নবীন রাষ্ট্রগুলির অভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক নীতিতে, বিশ্বের ঘটনাধারা তা প্রভাবিত করছে কম নয়।

যে কোনো তত্ত্বই (রাজনৈতিক সমেত) এক অর্থে কল্পিত বোধের বানিয়ে তোলা একটা নিয়মতন্ত্র। তা নির্মাণের উপায়, তত্ত্বে ঘনীভূত জ্ঞানের সারার্থের গঠন হয় তত্ত্বে প্রতিফলিত বাস্তবতা অনুযায়ী। সাধারণত রাজনৈতিক তত্ত্ব গড়ে ওঠে পরস্পরের সঙ্গে কোনো না কোনো ভাবে সংশ্লিষ্ট রাজনীতির মূল উপাদানগুলি সম্পর্কে প্রণালীবদ্ধ ধারণা নিয়ে। যেমন: ক্ষমতা, রাজনৈতিক সম্পর্ক ও প্রতিষ্ঠান, রাজনীতির কাজ ও ভূমিকা, রাজনৈতিক জীবনের আচরণবিধি, রাজনৈতিক ক্রিয়া ও চেতনা। এই সব উপাদানের প্রত্যেকটির তাৎপর্য বিভিন্ন রাজনৈতিক তত্ত্বে বিভিন্ন; তাদের গ্রন্থনক্রমও একই ছকে নয়। কোনো একটা সামাজিক-শ্রেণীগত ও প্রাজ্ঞানিক পরিস্থিতিতে উল্লিখিত উপাদানগুলির কোনো একটা প্রধান স্থানে আসে ও সবিশেষে আলোচিত হয়, অন্য পরিস্থিতিতে — অন্য কোনোটা।

রাজনৈতিক-আইনী মতবাদের বিবর্তন হল পুঞ্জীভবনের একটা প্রক্রিয়া। প্রজ্ঞান বিষয়ক ক্রিয়াকলাপের সুকৃতি হারিয়ে যায় না, পুঞ্জীভূত হয়ে তা বর্তায় উত্তরপুরুষদের কাছে। রাজনৈতিক-তাত্ত্বিক জ্ঞানের সমস্ত 'গঠনকে' একত্রে গ্রথিত করার জীবন্ত সূত্র হল উত্তরাধিকার। কিন্তু একই সাধারণ শৃঙ্খলে মিলিত হলেও সেগুলি ধাপে ধাপে যমজ নয়। তাদের প্রত্যেকটিতে আছে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য ও অনন্যতার ছাপ।

রাজনৈতিক তত্ত্বের বিকাশ মসৃণ ও সমতালে চলে না। লেনিন লিখেছেন, '...ভাবকল্পের ইতিহাস তার পরিবর্তনের, **সুতরাং সংগ্রামের** ইতিহাস'*।

যেকোনো রাজনৈতিক তত্ত্ব অধ্যয়নের প্রধান একটা শর্ত হল নির্দিষ্ট যুগটার পরিস্থিতির সঙ্গে তার সম্পর্ক পরিষ্কার করে নেয়া। স্থির করা প্রয়োজন, যুগের সমস্যার উপস্থাপন ও **উপলব্ধির** গভীরতা কতটা, মনীষী তাঁর কালের রাজনৈতিক জ্ঞানের কোন মানে দণ্ডায়মান।

রাজনৈতিক তত্ত্বে স্বকালের পরিস্থিতির প্রতি মনোভাবে সর্বদাই থাকে বাস্তবের মূল্যায়ন।* রাজনৈতিক তত্ত্বে মূল্যায়নের দিকটা অনৈচ্ছিক: প্রত্যেক মনীষীই তেমন একজন ব্যক্তি, সমাজীভূত বিষয়ী, যিনি নিজেকে সচেতন বা অচেতন ভাবে কোনো একটা সামাজিক গ্রুপের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট করেন, তার রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গিতে সায় দেন। লেনিনের মতে, তাঁর মূল্যায়ন হল সমাজে সক্রিয় এক বিষয়ীর মূল্যায়ন, যাঁর চিন্তা ও অনুভূতি গড়ে ওঠে তাঁর জীবনের পরিস্থিতি থেকে**। এইভাবে মূল্যায়নে একটা পার্টিপক্ষপাতিত্ব ধরে নিতে হয়।

রাজনৈতিক ভাবকল্প হল রাজনৈতিক সংগ্রামের হাতিয়ার। তার গতিপথে সংগ্রামরত শ্রেণীগুলি নির্দিষ্ট এক-একটা লক্ষ্য রাখে নিজেদের সামনে। রাজনীতির অতি গুরুত্বপূর্ণ দিক হল রাষ্ট্রীয় ক্রিয়াকলাপের রূপ, লক্ষ্য ও সারার্থ স্থির করা। সমাজের, রাষ্ট্রের রাজনৈতিক গঠন সম্পর্কে, তার পলিসি ও ক্ষমতার চরিত্র সম্পর্কে ধারণা হল সমস্ত রাজনৈতিক তত্ত্বের অপরিহার্য উপাদান।

ইতিহাস ও বর্তমান কাল। রাজনৈতিক তত্ত্বের ক্ষেত্রে 'ইতিহাস ও বর্তমান কালের' প্রশ্ন একাধিক তাৎপর্য ধরে। তা পরস্পর সম্পর্কিত হলেও তাদের নিজ নিজ জ্ঞানতাত্ত্বিক ও প্রায়োগিক মূল্য আছে।

আধুনিক রাজনৈতিক তত্ত্বের সঙ্গে সম্পর্কের দিক থেকে অতীতের রাজনৈতিক মতবাদ সর্বাগ্রে দেখা দেয় তার বোধ ও ধারণা, নির্মিতি ও ভাষার ঐতিহাসিক কাঠামো হিশেবে। প্রথমে যথানুযায়ী প্রাক্জ্ঞানিক ও সামাজিক পরিস্রাবণের মধ্য দিয়ে চুইয়ে এসে তা স্বাভাবিকভাবেই বর্তমান কালের রাজনৈতিক তত্ত্বের দেহে আশোষিত হয়।

---

* রাজনৈতিক তত্ত্বকে রাজনৈতিক শিক্ষামালার বিপরীতে রাখার যে চেষ্টা কিছু বুর্জোয়া পণ্ডিত করে থাকেন, মনে হয় তা অসিদ্ধ। রাজনৈতিক তত্ত্ব বলতে বোঝা হয় বিভিন্ন তথ্যের মধ্যে সম্পর্ক স্থাপন বা প্রকল্প, পরীক্ষা দ্বারা যার যাথার্থ্য প্রমাণ করা সম্ভব। অনেক বুর্জোয়া পণ্ডিতের মতে, রাজনৈতিক শিক্ষামালা হল গবেষকের ধ্যানলব্ধ মূল্যবান বিচারগুলির সমষ্টি; তথ্যগুলির মূল্যায়ন করে শিক্ষামালা ব্যবহারিক রাজনীতির পথনির্দেশ করে।

রাজনৈতিক মতবাদের ইতিহাস শুধুই একটা সজীব স্মৃতি এবং সেইসঙ্গে আধুনিক রাজনৈতিক তত্ত্বের এক ধরনের পদ্ধতিবিষয়ক ল্যাবরেটরির ভূমিকাই পালন করে না। এটা এক ধরনের পরীক্ষা ক্ষেত্র, যেখানে যাচাই হয় অসংখ্য রাজনৈতিক ভাবনার। রাজনৈতিক-আইনী চিন্তার ঐতিহাসিক বিকাশের বৈশিষ্ট্য, প্রবণতা ও নিয়মানুগতার সর্বাঙ্গীণ, অনুপুঙ্খ বিশ্লেষণ ও প্রগাঢ় সাধারণীকরণ প্রয়োজন রাষ্ট্র ও আইন সম্পর্কে বর্তমানের তাত্ত্বিক জ্ঞানের ভবিষ্যৎ বিকাশের পথ ও পদ্ধতির পূর্বাভাষ দান আর পূর্ণতাসাধনের জন্য। রাষ্ট্র ও আইন বিষয়ক সাম্প্রতিক বিদ্যার পুরো একরাশ জরুরি প্রশ্নের মীমাংসা প্রায়ই সম্ভব হয় রাজনৈতিক মতবাদের ইতিহাস অবলম্বনে।

রাজনৈতিক-আইনী* মতবাদের ইতিহাসের সক্রিয় বিচার ছাড়া, তার তথ্যাদির ওপর দখল ছাড়া, প্রজ্ঞাতের মূল্যায়ন ছাড়া যেসব বনিয়াদী প্রশ্নের গবেষণায় রাষ্ট্র ও আইন বিষয়ে আধুনিক বিদ্যার বিকাশে সাহায্য হওয়ার কথা, তা খানিকটা যুক্তিসিদ্ধরূপে নির্দিষ্ট করা অসম্ভব। এই ধরনের প্রসেসিঙে সহজ হবে রাষ্ট্রবিদ্যা ও ব্যবহারশাস্ত্র বিকাশের নতুন মৌলবিন্দু খুঁজে পাওয়া, রাষ্ট্র ও আইনের চর্চায় নিয়োজিত বিভিন্ন বিষয়ের মধ্যে সম্পর্ক ও পারস্পরিক নির্ভরশীলতা আবিষ্কারে সাহায্য হবে, ঘটবে এই সমস্ত বিষয়ের তাত্ত্বিক-প্রাজ্ঞানিক, ভাবাদর্শীয় ও ব্যবহারিক-ফলিত সম্ভাবনার ফলপ্রসূ রূপায়ণ।

তবে একথা ধরে নেয়া ঠিক নয় যে, সাম্প্রতিক রাজনৈতিক-আইনী তত্ত্বগুলি রাজনৈতিক মতবাদের ইতিহাসের কাছে একান্তই ঋণী, অবিরাম তার কাছ থেকে কিছু না কিছু নিচ্ছে, ধার করছে ইত্যাদি, শেষোক্তটি তার চিরকালীন উদার উত্তমর্ণ। 'ইতিহাস — বর্তমানকাল' সম্পর্কটা উভমুখী, পারস্পরিক। সাম্প্রতিক রাজনৈতিক তত্ত্বের শিখর থেকে উন্মোচিত হচ্ছে অতীতের রাজনৈতিক মতবাদের অন্তর্বস্তু, রূপ ও কাজের বেশি প্রভেদক ও সূক্ষ্ম বিচারের, তাদের বহু যুগের ইতিহাসে যেসকল জ্ঞানতাত্ত্বিক ও সমাজতাত্ত্বিক চরিত্রের জটিল প্রক্রিয়াদি সক্রিয় ছিল, তা নিয়ে পূর্বাপেক্ষা গভীরতর মননের সম্ভাবনা। রাজনৈতিক তত্ত্বের বিবর্তন বিশ্লেষণে তার গঠনের জটিলতার কথাটা মনে রাখা উচিত। যেকোনো তত্ত্বের ভেতরে প্রধানত

অনুধাবনীয় বিষয়বস্তুর মূর্ত-নির্দিষ্ট ঐতিহাসিক বৈশিষ্ট্যের এক ধরনের ধারণা- ও উপলব্ধিগত কোষকেন্দ্র আর মনীষীর নিজস্ব ব্যক্তিগত প্রজ্ঞানমূলক উপস্থাপন ইত্যাদিকে আলাদা করা যায়।

রাজনৈতিক তত্ত্বে তৎসাময়িক সমস্যাদি ও তৎসাময়িক জ্ঞানের সঙ্গে সঙ্গে 'চিরকালীন সমস্যার' কিছু একটা কোষ এবং তদুপযোগী অপেক্ষাকৃত সুস্থির একটা ভাষা থাকায় নিশ্চিত হয় তার পরমার্থক দিকটার সুস্থিরতা ও উত্তরবর্তিতা। শুধু তাই নয়, জ্ঞানের একটা স্বাধীন ও বিকাশমান শাখা হিশেবেও তার প্রতিষ্ঠা ধার্য হয়ে যায়।

বর্তমান সামাজিক-রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে অতীতের এক-একটা রাজনৈতিক মতবাদের ধ্যানধারণা নতুন অর্থ লাভ করছে। বিজ্ঞানের ঐতিহাসিকের প্রত্যক্ষ কর্তব্য হল অতীতে আধুনিক ভাবকল্পের ভ্রূণ আবিষ্কার। কিন্তু এ কাজটা মোটেই আত্মসম্পূর্ণ নয়। সেটার সাধন ফলপ্রদ হতে পারে যদি তা রাজনৈতিক-তাত্ত্বিক জ্ঞানের মূল উদ্ঘাটন ও উপলব্ধির অনুকূল হয়। যথা, তার ঐতিহাসিক পরিস্থিতি, সামাজিক-অর্থনৈতিক কারিকা, সামাজিক-শ্রেণীগত সম্পর্ক, রাষ্ট্রপাটের অবস্থা ইত্যাদি; যদি তা এ জ্ঞানের উদ্ভব, রূপায়ণ, বিকাশের ব্যাখ্যা দিতে পারে, তাহলে তার নিজস্ব গতিবেগের মূল পথও আলোকিত হয়।

এ কর্তব্য সাধনে রাজনৈতিক চিন্তার বিবর্তন ব্যাখ্যায় কোনো টেলিওলোজিকাল* প্রবণতার স্থান নেই, কেননা রাষ্ট্র ও আইন বিষয়ক মতবাদের ইতিহাসেই (তথা, সাধারণভাবে সামাজিক মতবাদের ইতিহাসেও) কোনো অমোঘ পূর্বার্পিত ব্যাপার নেই। অর্থাৎ এমন অবস্থা ঘটে না, যেখানে অতীতের কোনো যুক্তিসিদ্ধ, সাঁচ্চা বা কার্যকর ভাবনা অবশ্য-অবশ্যই বর্তমানের রাজনৈতিক-আইনী জ্ঞানকে প্রভাবিত করবে, জনগণের রাজনৈতিক চেতনায় স্থান পাবে। বস্তুবাদী, ঐতিহাসিক-দ্বান্দ্বিক দৃষ্টিভঙ্গিতে যেমন অতীতের, ঐতিহাসিকভাবে সুনির্দিষ্ট অর্থে, তেমনি তার সত্যকার আধুনিক অর্থে রাজনৈতিক মতবাদের সঠিক মূল্যায়ন সম্ভব হয়। এদিক থেকে রাষ্ট্রের ভূমিকা ও মর্মার্থে আলোকপাতে, এ প্রশ্নে বুর্জোয়া ধ্যানধারণার সমালোচনায় লেনিনীয় দৃষ্টিভঙ্গি উল্লেখযোগ্য। 'রাষ্ট্র প্রসঙ্গে'

বক্তৃতায় আলোচ্য প্রশ্নের ঐতিহাসিক বিচারের দাবিকে তিনি (কিভাবে ব্যাপারটার উদ্ভব ঘটল, কী তার শর্ত, বিকাশের কোন কোন স্তর তা পেরিয়ে এসেছে, এখন তা কী দাঁড়িয়েছে, ইত্যাদি) বিবেচনা করেছেন ঠিক আধুনিক অর্থে সমস্যাটা ব্যাখ্যার আলোকে।

অতীতের রাজনৈতিক চিন্তা তার বর্তমানের সঙ্গে যুক্ত হয় কেবল তাত্ত্বিক জ্ঞানের উত্তরাধিকার সূত্রেই নয়। রাজনৈতিক মতবাদের ইতিহাসকে রাষ্ট্র ও আইন বিষয়ক বর্তমান মতবাদের সঙ্গে অচ্ছেদ্য একতায় বেঁধে রাখার মতো তেমনি একটা সুদৃঢ় গ্রন্থি হল শ্রেণী সংগ্রামে রাজনৈতিক-আইনী মতবাদের অবিচ্ছিন্ন অন্তর্ভুক্তি।

বর্তমান ভাবাদর্শীয় সংগ্রামে রাজনৈতিক মতবাদ। আজকের শ্রেণীগত-ভাবাদর্শীয় সংগ্রামে রাজনৈতিক মতবাদের ভূমিকা দ্বিবিধ। একদিকে, যে রণক্ষেত্রে বর্তমান প্রতিদ্বন্দ্বী ভাবাদর্শগুলির মধ্যে নির্মম সংঘর্ষ চলেছে, নিজেই সে তার একটা অংশ। অন্যদিকে, বিগত যুগগুলির কোনো একটা মূর্ত-নির্দিষ্ট রাজনৈতিক মতবাদ বিশেষভাবে বেছে নিয়ে এমনভাবে তার ব্যাখ্যা (বৈজ্ঞানিক অথবা মিথ্যা) করা হয় যাতে ইতিহাসের প্রামাণিকতা দ্বারা আলোকিত, পরিপুষ্ট অথবা খণ্ডিত করা যায় তেমন মতবাদকে যার প্রধান কাজ হল কেবল বর্তমান সমাজের কোনো শ্রেণীর স্বার্থে 'খাটা'।

রাজনীতি, রাষ্ট্র ও আইনের প্রশ্নে সাম্প্রতিক ভাবাদর্শীয় সংগ্রাম সার্থকভাবে চালাবার জন্য, বর্তমানে চালু কোনো প্রতিক্রিয়াশীল রাজনৈতিক-আইনী মতবাদের বৈজ্ঞানিক, চোখে আঙুল দিয়ে দেখানো সমালোচনা ও তার যুক্তিসিদ্ধ প্রত্যয়জনক স্বরূপমোচনের জন্য প্রয়োজন আইন ও রাষ্ট্র বিষয়ক মতবাদের ইতিহাস, তার অভিজ্ঞতা ও শিক্ষায় যৎপরোনাস্তি মনোনিবেশ, যেমন প্রয়োজন তা নিয়ে বিশাল গবেষণা সাহিত্যের পাকাপোক্ত জ্ঞান।

মার্কসবাদ-লেনিনবাদের সমাজতান্ত্রিক ক্রিয়াকর্ম ও ভাবাদর্শের বিরুদ্ধে সংগ্রামে বুর্জোয়া মতাদর্শীরা তাদের তাত্ত্বিক অস্ত্র সংগ্রহ ও সমৃদ্ধ করছে রাজনৈতিক মতবাদের ইতিহাস থেকে। রাজনৈতিক চিন্তার প্রাচীন ও নূতন ক্লাসিকদের সুনাম বর্তমানেও কাজে লাগানো হচ্ছে অর্থনৈতিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক অন্যায়কে সঙ্গত প্রতিপন্ন করার জন্য, শোষণ ও নিপীড়ন বজায় রাখা, প্রগতিশীল, গণতান্ত্রিক শক্তিগুলিকে আক্রমণ করার জন্য।

তাত্ত্বিক ভিত্তিহীনতা, এবং প্রায়ই রাজনৈতিক মতবাদের ইতিহাস থেকে আহরিত ধ্যানধারণার মিথ্যাচারী অপব্যবহার অতি প্রকট হয়ে ওঠে

আধুনিক বুর্জোয়া লেখকদের পক্ষে টিপিক্যাল সেইসব গবেষণায়, যাতে রাজনৈতিক মতবাদের ইতিহাসকে লাগানো হয় বর্তমান কালের সেবায় জনবিরোধী লক্ষ্যে। এইভাবে নিজের মতো করে বোঝা মার্কসবাদ-লেনিনবাদ ও সমাজতান্ত্রিক বাস্তবতার ব্যাখ্যা ও 'পরিপূরণ' করা হচ্ছে প্লেটো, রুসো, হেগেল প্রভৃতি রাজনৈতিক চিন্তানায়কদের মতবাদের আলোয়। তাতে করে বিকৃত হচ্ছে ভাবকল্পের পূর্বতন গোটা ইতিহাসটাই। যেমন, 'সর্বগ্রাসিতার মূল' খোঁজা হচ্ছে অতীতের সত্য সত্যই প্রতিক্রিয়াশীল ভাবনা ও মতবাদে নয়, জ্ঞানপ্রচার আন্দোলন ও ফরাসি বিপ্লবের ধারণায়।

অতীতের রাজনৈতিক মতবাদের ভাষ্যে বুর্জোয়া পক্ষপাতদুষ্টতা বিশেষ করে ফুটে ওঠে যেখানে কথা ওঠে মার্কসীয় ভাবনা গড়ে ওঠার ইতিহাস, মার্কসবাদের পূর্বসূরীদের নিয়ে। কমিউনিস্টবিরোধী বুর্জোয়া ভাবাদর্শীরা অতীতের কোনো একটা রাজনৈতিক মতবাদের সত্যকার, মূর্ত-নির্দিষ্ট ঐতিহাসিক অর্থটা যেমন উপেক্ষা করে, তেমনি যে ঐতিহাসিক, সামাজিক, রাজনৈতিক-আইনী বাস্তবতার ভিত্তিতে সে মতবাদের উদ্ভব তার কারণ, সে বাস্তবতায় তাদের ভূমিকা ও তাৎপর্যও গ্রাহ্য করে না।

অতীত ও বর্তমানের রাজনৈতিক মতবাদের ব্যাখ্যায় ইতিহাসবিরোধিতা প্রকাশ পায় সে মতবাদের কোনো একটা বক্তব্য নিয়ে একদেশদর্শিতায়, রাজনৈতিক মতবাদের ইতিহাসে ভাবনা উত্তরাধিকারের কোনো একটা দিকের অতিপুষ্টিতে, মতবাদের মূর্ত-নির্দিষ্ট ঐতিহাসিক চরিত্র, তার সামাজিক ও শ্রেণীগত কারণ ইত্যাদির উপেক্ষায়।

রাজনীতির সঙ্গে ভাবাদর্শের ঘনিষ্ঠ সম্পর্কের নিদর্শন হল বর্তমানে, বিশেষ করে উন্নয়নশীল দেশগুলি। এইসব দেশে রাজনৈতিক ভাবনা হল তীব্র শ্রেণী সংগ্রামের একটা ক্ষেত্র, তার প্রধান বিষয়বস্তু হল বিকাশের পথ সন্ধান, সমাজতন্ত্র-নাকি পুঁজিতন্ত্রমুখিতার প্রশ্ন। রাষ্ট্রের মর্মার্থ, তার রূপ ও কাজ, গণতন্ত্র ইত্যাদি বিষয়ে যেসব প্রতিপাদ্য জাতীয়-মুক্তি আন্দোলনের নেতাদের ধ্যানধারণায় বড়ো একটা স্থান নিয়েছে, সেগুলিকে বিচার করতে হবে ঠিক এই প্রিজম মারফত।

এশীয় ও আফ্রিকীয় দেশগুলির সাম্প্রতিক রাজনৈতিক ভাবনায় অতীত ও বর্তমানের মতবাদ ভয়ানক জড়াজড়ি করে আছে। একদিকে, সে ভাবনা ভবিষ্যৎমুখী, প্রগতি হয়ে উঠছে তার আদর্শ আর সেটা খুবই নিয়মসঙ্গত। কিন্তু অন্যদিকে, তাদের ভাবাদর্শীরা প্রাচীন জাতীয় ঐতিহ্য, সামাজিক-রাজনৈতিক চিন্তার ইতিহাস, বিশেষ করে ধর্মীয় উৎসের দিকে চাইছেন,

চেষ্টা করছেন আধুনিকতার সঙ্গে তাদের সংশ্লেষ ঘটাতে। উপনিবেশবাদ কর্তৃক পূর্বে যা অবরুদ্ধ ছিল বিকাশের সে পথ তারা যে পরিস্থিতিতে নিচ্ছে তাতে অন্যরকম কিছু হতেও পারে না।

রাজনৈতিক মতবাদের বহু প্রকার সমস্ত সমস্যার গভীর তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ এবং সেইসঙ্গে ইতিহাসের ও সামাজিক, রাষ্ট্রিক-আইনী চিন্তার বর্তমান অবস্থার নানা ধরনের অপভাষ্যের স্বরূপমোচন — এ হল সাম্প্রতিক বৈজ্ঞানিক গবেষণার গুরুত্বপূর্ণ কর্তব্য এবং সেইসঙ্গে বর্তমান ভাবাদর্শীয় সংগ্রামের জরুরি একটা দিক।

এই গ্রন্থে অতীত ও বর্তমানের রাজনৈতিক-আইনী মতবাদের পারস্পরিক ক্রিয়ার গতিপ্রকৃতি দেখিয়ে সেই ভিত্তিতে নির্বাচিত পরিসরে প্রাক্‌মার্কসবাদী রাজনৈতিক-আইনী চিন্তার একসারি ক্লাসিক দিক্‌পালের দৃষ্টিভঙ্গি, বর্তমান ভাবধারণার সংগ্রামে সেগুলির তাৎপর্য ও স্থান বিশ্লেষণের চেষ্টা হয়েছে।

প্রথম অধ্যায়

ঐতিহাসিক-তাত্ত্বিক গবেষণা হিশেবে রাজনৈতিক মতবাদ

বর্তমান পর্যায়ে রাষ্ট্র ও আইনের সমস্যাদি নিয়ে প্রগাঢ় বিচার এদুটি অতি গুরুত্বপূর্ণ সামাজিক প্রতিষ্ঠানের আরো বিকাশ ও সুসম্পূর্ণতার অপরিহার্য শর্ত। রাজনৈতিক-আইনী তত্ত্বের সর্বাঙ্গীণ গবেষণা আবার রাজনীতি, রাষ্ট্র ও আইনের ক্ষেত্রে বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের অগ্রগতির পক্ষে আবশ্যক পূর্বশর্তের একটা।

কিন্তু রাজনৈতিক মতবাদের ইতিহাস বিশ্লেষণ না করে এরূপ গবেষণা সম্ভব নয়। রাজনৈতিক-তাত্ত্বিক জ্ঞানের পূর্ববর্তী পর্যায়গুলিতে বহুল পরিমাণে তৈরি হয়ে উঠেছিল এ বিদ্যার ধারণা ও বোধের নির্দিষ্টতা, নির্ণীত হয়েছিল সমস্যাদি, গড়ে উঠেছিল পদ্ধতিধারা। পূর্ববর্তী পর্যায়গুলির সঙ্গে একটা অবিচ্ছিন্নতা এ বিদ্যায় বজায় আছে।

আধুনিক কাল হল পরিবিকাশমান ঐতিহাসিক বাস্তবতা। বর্তমান ঘটনাবলির সমস্ত রহস্যই যে কেবল তার উদ্ভব ও অতীতের রহস্যোদ্ধার করে জানা যাবে না তা বলাই বাহুল্য। ইতিহাস যে সম্ভাবনা তুলে ধরে সর্বদা তা কার্যে রূপায়িত করে না বর্তমান কাল। পক্ষান্তরে, অতীতের জ্ঞান না থাকলে কিন্তু বর্তমানের পরিপূর্ণ ও নির্ভুল উদ্‌ঘাটনের, রাজনৈতিক-আইনী তত্ত্বের ভবিষ্যৎ বিকাশের যে পরিপ্রেক্ষিত বর্তমানে খুলে যাচ্ছে তা বোঝার সম্ভাবনা থাকে না।

রাজনৈতিক-তাত্ত্বিক জ্ঞান হল রাজনৈতিক চেতনারই ঈষৎ পরিবর্তিত রূপ। রাজনৈতিক-তাত্ত্বিক জ্ঞানের মূল বৈশিষ্ট্যগুলি আসছে এই থেকেই। তাই প্রথমে রাজনৈতিক চেতনার ব্যাপারটাকেই যুক্তিযুক্তভাবে দেখতে হবে সমগ্রভাবে।

§১। রাজনৈতিক চেতনা

রাজনৈতিক চেতনা একটা জটিল সামাজিক ব্যাপার। তাকে কতকগুলি ভাবকল্প, বুদ্ধিবৃত্তিক নির্মিতি ও মনন কর্মের সমষ্টি বলে ধরা চলে না। বহু দিক আছে তার, সামাজিক বাস্তবতার শুধু একটা সমতলে তা আঁটে না।

রাজনৈতিক যোগাযোগ ও পারস্পরিক নির্ভরতা, প্রথা-প্রতিষ্ঠান, আচরণবিধি ইত্যাদি সম্পর্কে জ্ঞানের একটা ব্যাপার হওয়ায় তার সামনে বিষয়বস্তু হিশেবে রাজনীতির যে জগৎটা রয়েছে, রাজনৈতিক চেতনা তাকে প্রতিফলিত ও সক্রিয়ভাবে অভিব্যক্ত করে।

তা ছাড়া, রাজনৈতিক চেতনা সর্বদাই হল প্রতিফলিত রাজনৈতিক বাস্তবতার প্রতি মনোভাবও (ইতিবাচক বা নেতিবাচক), তার অনুমোদন বা অগ্রহণ।

সমস্ত শ্রেণীভিত্তিক সামাজিক-অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় রাজনৈতিক চেতনা তার গুরুত্বপূর্ণ দিকটায় গ্রুপ ও ব্যক্তিবর্গের ক্রিয়াকলাপের সঙ্গে জুড়ে যায়। রাজনীতির ক্ষেত্রে ক্রিয়াকলাপের গঠন, ধরন ও শ্রেণীগত অভিমুখ যেরূপ, রাজনৈতিক চেতনার গঠন, অন্তঃসার ও শ্রেণী অভিমুখও হয় তেমনি। রাজনৈতিক ক্রিয়াকলাপের 'শারীরস্থান' হল রাজনৈতিক চেতনার 'শারীরস্থানের' চাবিকাঠি। তাই অতীতের রাজনৈতিক চেতনার বিভিন্ন ব্যবস্থা ও রূপবৈচিত্র্যের প্রকৃতি বোঝার উপায় হল ইতিহাসে সংগঠিত রাজনৈতিক ক্রিয়াকলাপের গঠন ও ধরনের বৈশিষ্ট্য বিশ্লেষণ।

রাজনৈতিক চেতনা হল রাজনৈতিক শাসন প্রক্রিয়ার অঙ্গাঙ্গি একটা গ্রন্থি এবং পুরোপুরি বাস্তব একটা দিক। সামাজিক-রাজনৈতিক ব্যবস্থার কাজ চলা তাতে নিশ্চিত হয়।

রাজনৈতিক চেতনা বহুতল হওয়ায় এবং নানা ধরনের সামাজিক বিষয় তার আওতায় থাকায় সে সম্পর্কে সঠিক সর্বাঙ্গীণ খবর পেতে হলে তাকে যুগপৎ কয়েকটি খাতে বিচার প্রয়োজন।

রাজনৈতিক চেতনাকে সামাজিক-রাজনৈতিক দেহের প্রাণবত্তার একটা কারিকা হিশেবে দেখার যাত্রাবিন্দু হল কী কী ধরনের ক্রিয়াকলাপে তা প্রত্যক্ষ অংশ নিচ্ছে এবং কী এই চেতনার কারণ, সেই প্রশ্নের বিচার। সেই ধরনের ক্রিয়াকলাপে আমরা আগ্রহী যার বিষয় হল অবজেকটিভ পারস্পরিক সম্পর্কের সমাহার, যার মারফত শ্রেণী সমাজের সাধারণ

পরিচালনার কাজ চলে। এই ক্রিয়াকলাপের কল্যাণে উল্লিখিত পারস্পরিক সম্পর্ক ও নির্ভরতার সমাহারটা পুনরুদ্ভূত, পরিবর্তিত হয় ও বিকাশ লাভ করে। শ্রেণী সমাজের সাধারণ পরিচালন কার্যের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সম্পর্কগুলির বেশ কয়েকটা বৈশিষ্ট্য আছে। প্রথমত, এ সম্পর্কগুলিই হল এরূপ সমাজের রাষ্ট্রীয় সংগঠন অথবা কোনো-না-কোনোভাবে রাষ্ট্রপাটের সঙ্গে যুক্ত। দ্বিতীয়ত, এ সম্পর্কগুলি রাষ্ট্র প্রসঙ্গে সামাজিক স্তর, গ্রুপ, পার্টি ইত্যাদির মধ্যে উদ্ভূত, অর্থাৎ সর্বদা এটা হল শ্রেণী সম্পর্ক। তৃতীয়ত, এ সম্পর্কগুলির ভিত্তি হল সমাজের অর্থনৈতিক গঠন।

ক্রিয়াকলাপের যেসব ধরনে আমাদের আগ্রহ, প্রধান প্রধান লক্ষণে তাতে প্রতিফলিত ও পুনরাবৃত্ত হয় পূর্বোল্লিখিত সম্পর্কগুলির অবজেকটিভ গুণাগুণ। এইসব লক্ষণ চেতনায় ঝাড়াই-মাড়াই হয়ে রাজনৈতিক ক্রিয়া-কলাপের মনস্তাত্ত্বিক উপাদান হয়ে দাঁড়ায়, নিয়ন্ত্রণ করে রাজনৈতিক আচরণ।

কথাটা হচ্ছে লোকেদের ব্যবহারিক-রাজনৈতিক চেতনা নিয়ে যা বহুলাংশে সচেতনের হেতু প্রদর্শনী ক্ষেত্রটার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট (মাতন আর চাহিদা, আগ্রহ আর উত্তেজন, সাময়িক মত্ততা আর ভাবাবেগ)। সমস্ত রাজনৈতিক কর্মই এরূপ চেতনায় সঞ্চারিত। সেই কারণে তা হল শ্রেণী সমাজে রাজনৈতিক সম্পর্কের অবজেকটিভ মননঘটিত রূপ, ব্যাপক ব্যক্তিবর্গের ক্রিয়াকলাপে পরিণত হবার উপায়।

তবে যা বলা হল তা থেকে একথা ভাবা অনুচিত যে ব্যক্তিবর্গের মধ্যে মনস্তাত্ত্বিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া, চিত্ত বুঝি হয়ে উঠছে রাজনীতির উৎস ও ভিত্তি। রাজনীতি সর্বদাই অর্থনীতির ঘনীভূত অভিব্যক্তি। সামাজিক শ্রেণীগুলির বৈষয়িক অর্থনৈতিক স্বার্থের প্রভাবাধীন তা সবচেয়ে বেশি এবং এইসব অর্থনৈতিক স্বার্থের নির্ধারক ছাপ তা বহন করে।

রাজনৈতিক চেতনা হল শ্রেণী চেতনা। এটা হল তার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ঐতিহাসিক-সমাজতাত্ত্বিক দিক। ইতিহাসে রাজনৈতিক চেতনার কয়েকটা টাইপ আছে, যেমন, দাসমালিক আর দাসের চেতনা, সামন্ত আর তদধীন কৃষকের চেতনা, বুর্জোয়া ও প্রলেতারিয়েতের চেতনা। এও পরিষ্কার যে রাজনৈতিক চেতনার কম তাৎপর্যপূর্ণ অন্যান্য রূপও আছে যাতে প্রকাশ পায় অন্তর্বর্তী গ্রুপগুলির চেতনা। কিন্তু সমাজে প্রভুত্বকারী শ্রেণীর রাজনৈতিক চেতনাও একস্তরী হয় না। নির্দিষ্ট একটা ঐক্যের অভ্যন্তরে খুবই বিভিন্নতা থাকে যা সমস্ত সামাজিক শ্রেণীরই আভ্যন্তরিক বিভিন্নতা অনুসারী। রাজনৈতিক মতবাদের টাইপনির্ণয় বিদ্যা সংরচনে এবং কোনো

একটা রাজনৈতিক ধারণা কোন টাইপের অন্তর্গত তা ব্যাখ্যায় রাজনৈতিক চেতনার শ্রেণীমূলকতা হল বনিয়াদী নিরিখ।

রাজনৈতিক চেতনার মার্কসীয় বিশ্লেষণে শ্রেণীমূলকতা যাত্রাবিন্দু, তবে সেইটেই সব নয়*। শ্রেণীর মার্কসীয় তত্ত্বের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গিরূপে জড়িত সামাজিক-অর্থনৈতিক ব্যবস্থার মতবাদ: তাতে দাস সমাজ, সামন্ততান্ত্রিক সমাজ, পুঁজিতান্ত্রিক ব্যবস্থা, সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার (কমিউনিস্ট ব্যবস্থার প্রথম পর্যায়) রাজনৈতিক চেতনাকে আলাদা করা সম্ভব হয়। প্রাক্‌সমাজতান্ত্রিক শ্রেণী ব্যবস্থাগুলির রাজনৈতিক চেতনা দেখা দেয় বিভিন্ন শ্রেণীর বিপরীত (অন্ততপক্ষে বিভিন্ন) রাজনৈতিক 'চেতনার' সমষ্টি হিশেবে। তাহলেও এই চেতনাগুলি বিদ্যমান থাকে একই সময়ে এবং একই অর্থনৈতিক ভিত্তি, সমাজের একই রাজনৈতিক কৃষ্টির তা অনুরূপ (প্রত্যেকটি নিজের নিজের ধরনে)। সামাজিক ঘটনাবলি **উপলব্ধির** মোটামুটি একই **মান**, নির্দিষ্ট ব্যবস্থাটিতে প্রাধান্যকারী **চিন্তনের** একই **শৈলী** (যেমন, ঐহিক, ধর্মীয় ইত্যাদি) প্রকাশ পায় এগুলিতে।

সামাজিক শ্রেণীর রাজনৈতিক চেতনার মূর্ত-নির্দিষ্ট সামাজিক অন্তঃসার কখনোই সে শ্রেণীর অর্থনৈতিক স্বার্থের সরাসরি সূক্ষ্ম নির্যাস হয় না। যেসব জটিল বৈষয়িক ও ভাবাদর্শীয় নির্ভরশীলতায় শ্রেণী সমগ্র সমাজের সক্রিয়তার সঙ্গে জড়িত, যার সুবাদে সে শ্রেণী হিশেবে বিদ্যমান, তাও আশোষিত হয় সে অন্তঃসারে। এ থেকে আসে যে শ্রেণীর রাজনৈতিক চেতনাকে সঠিকভাবে বোঝা যাবে কেবল তার উপযোগী সামাজিক-অর্থনৈতিক ব্যবস্থার পটে।

রাজনৈতিক চেতনার (সমাজ, শ্রেণী, ব্যক্তিবর্গের) মানের তারতম্য ঘটে টাইপ অনুসারে নয়, সর্বাগ্রে অস্তিত্বের উপায় অনুসারে। গোটা সমাজ ও শ্রেণীগুলির রাজনৈতিক চেতনা যদি 'ব্যক্তি থেকে ঊর্ধায়িত' ও সামাজিক ও আত্মিক সংস্কৃতির ব্যবস্থায় অবজেকটিভীভূত, ভাষায় নিবদ্ধ, বিদ্যায় সঞ্চিত ইত্যাদি হয়ে থাকে, তাহলে ব্যক্তিগত রাজনৈতিক চেতনা আলাদা আলাদা ব্যক্তির মানসিকতায় সীমিত থাকে। শ্রেণী সমাজের এবং সামাজিক শ্রেণীগুলির রাজনৈতিক চেতনা হাজার হাজার বছর ও শতক ধরে টিকে থাকে। মূর্ত-নির্দিষ্ট ব্যক্তিগত রাজনৈতিক চেতনার আয়ু অনেক কম।

রাজনৈতিক চেতনা গড়ে ওঠার ছকটা এইরকম: 'সাধারণ — বিশেষ — একক', 'সমগ্র — অংশ'। অসংখ্য ব্যক্তিগত রাজনৈতিক চেতনার তুলনায় সমাজের রাজনৈতিক চেতনা হয়ে দাঁড়ায় তাদের পারস্পরিক সম্পর্কের রূপ। বিশেষ ও এককের সমস্ত সম্পদ তাতে বিধৃত।

সমাজের রাজনৈতিক চেতনা গড়ে ওঠে ব্যক্তিগত রাজনৈতিক চেতনাগুলির সমষ্টি থেকে। আলাদা আলাদা প্রত্যেকটি ব্যক্তি কোনো একটা রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি পোষণ করে, তার দ্বারা চালিত হয়ে অংশ নেয় সামাজিক রাজনৈতিক চেতনার গঠন, পরিবর্তন ও নবীকরণে, তার রূপলাভে নিজ নিজ অবদান যোগ করে। এধরনের রূপলাভের প্রক্রিয়াটা চেতনার অসংখ্য এককের সরল পাটীগণিতের যোগফল নয়। নির্দিষ্ট ব্যক্তিটির চেতনায় তাৎপর্যবিশিষ্ট যে উপাদানগুলি অনন্য নয়, সামাজিক-সক্রিয়, এক্ষেত্রে চলে তাদের কেলাসন।

ব্যক্তিগত চেতনার সামাজিকে এবং সামাজিক চেতনার ব্যক্তিগততে রূপান্তর নিশ্চিত হয় সামাজিক আদান-প্রদানে। মানবিক আদান-প্রদানের একটা প্রধান উপায় হল সংবাদ বিনিময়। সংবাদ বিনিময়ের জন্য প্রয়োজন নতুন নতুন খবর পাওয়া, নতুন মূল্যায়ন হাজির করা, নতুন জ্ঞানলাভ করা। জ্ঞানের বৃদ্ধি ও গভীরতা সাধনের প্রশ্নগুলি পড়ে প্রজ্ঞান তত্ত্বের এক্তিয়ারে। এই থেকে আসে রাজনৈতিক চেতনাকে জ্ঞানতত্ত্বের দিক থেকে দেখার প্রয়োজন।

রাজনৈতিক চেতনা রাজনীতির জগৎকে প্রতিফলিত ও সক্রিয়ভাবে অভিব্যক্ত করে। তবে চেতনাকে ঘটনাবলির অবজেকটিভ বাস্তবতার তুলনায় আদর্শায়িত, গৌণ (দার্শনিক দিক থেকে) বলে ধরলেও জ্ঞানতাত্ত্বিক সমস্যাদি ফুরিয়ে যায় না। সত্যের প্রশ্নও এই সমস্যাগুলির অন্তর্গত।

জ্ঞানতত্ত্বের আলোয় রাজনৈতিক চেতনা একটা প্রজ্ঞানমূলক ক্রিয়া হিশেবে দেখা দেয়, যাতে রাজনৈতিক দুনিয়াব বিষয়গুলিকে তুলে ধরা সম্ভব হয়।

রাজনৈতিক দুনিয়ার প্রজ্ঞান চলে দুই মূল মাত্রায় — আভিজ্ঞতিক ও তাত্ত্বিক। মানবিক প্রজ্ঞানে আভিজ্ঞতিক ও তাত্ত্বিক স্তরের অস্তিত্ব মানুষ কর্তৃক জ্ঞেয় পরিবর্তনশীল বিশ্বের স্থিতিমাপের সঙ্গে কার্যকারণক্রমেই জড়িত। উল্লিখিত মাত্রা দুটি পরস্পর থেকে দুর্ভেদ্য প্রাচীরে বিচ্ছিন্ন নয়। তাহলেও তাদের মধ্যে পার্থক্য আছে। পার্থক্যটা সর্বাগ্রে তাদের প্রত্যেকের বাস্তব রাজনীতি প্রতিফলনের গভীরতায়। আভিজ্ঞতিক মাত্রায় প্রজ্ঞান

আসে সরাসরি দৈনন্দিন ব্যবহারিক অভিজ্ঞতা থেকে এবং সুস্পষ্টরূপে গ্রাহ্য, যেন উপরিতলে স্থিত গুণ ও সম্পর্ক, বিষয় ও ঘটনার চৌহদ্দির মধ্যে তা ঘোরাফেরা করে। বাহ্যিক ঘটনানতেই তা থেমে যায়। তাদের পেছনে লুক্কায়িত গুরুত্বপূর্ণ অভ্যন্তরীণ অধীনতা-সম্পর্ক ও নিয়মানুগতা তার অনায়ত্ত। তাত্ত্বিক প্রজ্ঞান কিন্তু অব্যবহিত ধ্যেয়ের সীমা ছাড়িয়ে দৃষ্টিগোচরতার আবরণতলে লুকনো সেইসব আসল শক্তিগুলিকে উদ্‌ঘাটনে চেষ্টিত, যাতে গড়ে ওঠে রাজনীতির আভিজ্ঞতিকভাবে লক্ষিত ঘটনাবলির সত্যকার পরিচালক ব্যবস্থা।

বাস্তবতার মানবিক প্রতিফলনের আভিজ্ঞতিক মাত্রাকে সাধারণত বলা হয় মামুলি চেতনা। এরূপ মূল্যায়নে কিন্তু এ চেতনার তাৎপর্য হ্রাস পায় না। মামুলি চেতনায় পুঞ্জীভূত হয় সামাজিক আদান-প্রদানের (ব্যক্তিবর্গ, গ্রুপ, শ্রেণীর) শরিকদের অতি সমৃদ্ধ আভিজ্ঞতিক ভূয়োদর্শন আর শেষ পর্যন্ত সেটাই হল সামাজিক বিজ্ঞান কৃত সিদ্ধান্তের ভিত্তি। বিপরীত সম্পর্কও বিদ্যমান: সমাজবিদ্যার কতকগুলি ধারণা ও বোধকে মামুলি চেতনা আত্মস্থ করে নেয়।

দৈনন্দিন সামাজিক ব্যাপার-স্যাপার দ্বারা সংশোধনীয় ও পরীক্ষণীয় এবং ইতিহাস দ্বারা সমর্থনীয় মামুলি চেতনায় এমন বিষয়বস্তু সঞ্চিত হয়ে ওঠে যাতে থাকে একরাশ আপেক্ষিক সত্য, বাস্তব বিচার। সেইজন্য একথা মনে করা ভুল যে জ্ঞানতাত্ত্বিক দৃষ্টিকোণ থেকে মামুলি চেতনা বুঝি-বা তাত্ত্বিক চেতনার বিপরীত এবং মিথ্যা, অসত্য জ্ঞান থেকে অভিন্ন। এরূপ ধারণা মামুলি চেতনা গড়ে উঠতে 'প্ররোচনা' জোগায় কম নয়: স্বতঃস্ফূর্তভাবে তা গড়ে ওঠে সামাজিক বাস্তবতা থেকে। সব ধরনের মামুলি চেতনার ভালো মন্দ দিক এর সঙ্গে জড়িত। ভালোটা এই যে মামুলি চেতনা বিচক্ষণ কান্ডজ্ঞানের অবস্থান নিয়ে ভাববাদী কুহেলি ও কুসংস্কারকে সাফল্যের সঙ্গে প্রতিরোধ করতে পারে। মন্দটা এই যে মামুলি চেতনায় থাকে না (তার উদ্ভবের প্রধানত স্বতঃস্ফূর্ত চরিত্রের দরুন) উপযুক্ত সমালোচনী-বিশ্লেষণী প্রতিবর্ত। এ অবস্থাটা তার ইররাশানালিজমের* অনুপ্রবেশ, অবজেকটিভ বিশ্বের একসারি মূলগত সম্পর্ক ও নিয়মানুগতার বিকৃত প্রতিফলনের খুবই অনুকূল।

মামুলি চেতনা গড়ে ওঠার আরেকটা বৈশিষ্ট্য হল যুক্তিযুক্তভাবে চিন্তা করতে সক্ষম, সমাজের এমন সমস্ত সদস্যই তার বাহক। মামুলি চিন্তার বিষয়ী নয়, এমন ব্যক্তি প্রকৃতিতে স্রেফ নেই, যেমন নেই জীবনযাপনের প্রয়োজন, প্রযত্ন, স্বার্থ থেকে একেবারে বহির্ভূত কোনো লোক।

বাস্তবতা প্রতিফলনের তাত্ত্বিক মাত্রার ছবিটা অন্যরকম। তাত্ত্বিক চেতনা গঠন সেই লোকেদের সাধ্যায়ত্ত যারা মানসিক সৃজনকর্মে আত্মনিয়োগ করেছে এবং বিশেষভাবে চিন্তা করছে সমাজজীবনের নিয়ম নিয়ে। তাত্ত্বিক চেতনা হল গবেষক, ভাবাদর্শী, বিজ্ঞানী অর্থাৎ মনীষীদের প্রজ্ঞানমূলক প্রয়াসের ফল। যে সামাজিক গ্রুপগুলি থেকে ভাবাদর্শী, পণ্ডিত প্রভৃতিরা এসেছেন, ইতিহাসের গতিপথে তাদের পরিবর্তন হয়েছে। কিন্তু প্রকৃতি ও মানুষের জগৎটাকে, সমাজ, রাষ্ট্র, রাজনীতি প্রভৃতিকে তাত্ত্বিকভাবে জানাটা মনীষীদের প্রধান কাজ হিশেবেই রয়ে গেছে।

মামুলি চেতনার স্বতঃস্ফূর্ত উদ্ভবে নির্ধারিত হয় তার বিন্যাস। সাধারণত বলা হয় যে এ চেতনা সুসম্বদ্ধ নয়। সুসম্বদ্ধতার মান হিশেবে যদি বৈজ্ঞানিক-তাত্ত্বিক জ্ঞানের সংগঠনকে ধরি, তাহলে এরূপ দৃষ্টিকোণের ন্যায্যতা অস্বীকার করা যাবে না। তবে এ মানদণ্ডের নির্বাচন কতটা সঠিক সে প্রশ্ন খোলাই থাকছে।

এটা খুবই পরিষ্কার যে মামুলি চেতনা সুসম্বদ্ধ নয়, এ থিসিস বিশ্লেষণ থেকে বিবেচ্য ব্যাপারটার জটিল গঠনটা বাদ দেয়। এর অভ্যন্তরীণ গঠনের সমস্ত খুঁটিনাটির মূর্ত-নির্দিষ্ট তথ্য হাতে না থাকায় আপাতত খুব সাধারণভাবে এই কথা বলা যায়: মামুলি চেতনা হল এমন একটা অখণ্ডতা যাতে শৃঙ্খলাবন্ধনের ভিত্তি আছে, যা যৌক্তিকও হতে পারে, অযৌক্তিকও হতে পারে। এবং নিজের ধরনে তা সুসম্বদ্ধ। সেইসঙ্গে অন্য কোনো চেতনার চেয়ে তা বাইরের বহুবিধ প্রভাবের অধীন।

প্রজ্ঞানমূলক কর্মের প্রক্রিয়া ও ফলাফল রূপায়িত হয় ভাষায়। ভাষা হল সামাজিক চেতনার অস্তিত্বের বাস্তব রূপ। সেই কারণে ভাষাকে এড়িয়ে সামাজিক চেতনা ব্যাপারটাকে উদ্ঘাটিত ও উপলব্ধ করা অসম্ভব।

প্রতিফলনের আভিজ্ঞতিক ও তাত্ত্বিক মানের পার্থক্য অনুসারে মামুলি ও বৈজ্ঞানিক-তাত্ত্বিক জ্ঞান প্রকাশক ভাষাতেও একটা পার্থক্য দেখা দেয়। প্রথমটা সেই ভাষায় বিধৃত যার মাধ্যমে লোকেরা দৈনন্দিন জীবনের অভিজ্ঞতা প্রকাশ করে, নিজেদের মধ্যে আদান-প্রদান চালায়। বৈজ্ঞানিক-তাত্ত্বিক জ্ঞানও 'কথা বলে' একই ভাষায়। তবে তার শব্দসম্ভার ও গঠনে

নির্দিষ্ট সংখ্যক পরিভাষা, প্রতীক, রীতি থাকে যা বৈজ্ঞানিক গবেষণা ও আদান-প্রদানে ব্যবহৃত হয়। এই ধরনের পার্থক্য কেবল সাম্প্রতিক মামুলি ও বৈজ্ঞানিক-তাত্ত্বিক জ্ঞানের বৈশিষ্ট্যসূচক নয়। বিগত যুগগুলিতেও এ দুই জ্ঞানের ভাষায় পার্থক্য কম ছিল না।

ভাষা ও চেতনা অচ্ছেদ্য ঐক্যে বাঁধা থাকলেও একথা ভাবা ভুল যে সামাজিক চেতনায় যা-কিছু আছে ভাষায় তা মুকুরের মতো প্রতিফলিত হয়। এই থেকে, চেতনার মর্মার্থ ও আত্মপ্রকাশ নিয়ে গবেষণার সঙ্গে একেবারে মিলে না যাওয়ায় ভাষার বিশ্লেষণ একটা স্বাধীন অর্থ লাভ করে, দাবি করে বিশেষ প্রয়াস। জ্ঞানের অস্তিত্বের (উদ্ভব, সংরক্ষণ, চলাচলের) একটা রূপ হওয়ায় ভাষা হল জটিল বহুদিকসমন্বিত একটা সাংকেতিক ব্যবস্থা।

বলাই বাহুল্য রাজনৈতিক জ্ঞানও ভূষিত হয় নিজের ভাষায়।

আগে যা বলা হয়েছে, রাজনৈতিক-তাত্ত্বিক জ্ঞান হল রাজনৈতিক চেতনার এক ধরনের অদল-বদল, তার তাৎপর্যময় একটা খন্ড। রাজনৈতিক চেতনার যে মূল্যায়ন আগে করা হয়েছে, তা থেকে এবার রাজনৈতিক তত্ত্বের প্রকৃত বর্ণনায় আসা যেতে পারে।

§২। রাজনৈতিক তত্ত্বের সাধারণ ধর্ম

রাজনীতির জগৎ দেখা দিতে পারে (এবং বস্তুত দেখা দিচ্ছে) সামাজিক চেতনার অতি বিভিন্ন সব 'ছেদে'। কিন্তু ধর্মীয় চেতনার কাছে ধরা যাক, তাকে মনে হবে একটা মল্লভূমি যেখানে 'প্রাকৃতের', 'পার্থিবের' সঙ্গে সংঘর্ষ চলছে 'অতিপ্রাকৃতের', 'ঐশ্বরিকের'। নৈতিক চেতনার কাছে কিন্তু তা সর্বাগ্রে 'সু' ও 'কু'-এর দ্বন্দ্বে আলোকিত। দার্শনিক ইত্যাদির কাছে তা আবার অন্য কিছু রূপে প্রতিভাত।

পূর্বোল্লিখিত বিষয়গুলির রাজনৈতিক-তাত্ত্বিক চৈতন্য যার সাহায্যে সাধিত হচ্ছে, সে নিরিখটার ভূমিকা নেয় এই দ্বিভাজন: 'আদেশ — বশ্যতা'। যুগ থেকে যুগে তার সামাজিক অন্তঃসার বদলেছে। তাতে পক্ষভুক্তরা ছিল বিভিন্ন সামাজিক শ্রেণীর বিষয়ী। প্রাক্‌সমাজতান্ত্রিক শ্রেণী সমাজে আদেশের একাধিপত্য ছিল ব্যক্তিগত সম্পত্তির মালিকদের, শোষকদের; শোষিতদের মেনে নিতে হত বশ্যতা। ইতিহাসে নানা পন্থায় ও পদ্ধতিতে

'আদেশ — বশ্যতা' সম্পর্ক রূপায়িত হয়েছে। কিন্তু সর্বদাই এই রয়ে গিয়েছে রাজনীতির সরলতম ও সর্বজনীন 'কোষ', রাজনীতির ব্যবস্থাগঠনী নীতি।

রাষ্ট্র, আইন, রাজনীতির তাত্ত্বিকেরা তাঁদের কাজে এই 'কোষটাকে' মনন কেন্দ্র করে তোলেন ক্বচিৎ-কদাচিৎ। সাধারণত এটাকে দেখা হয় রাজনৈতিক ক্ষমতার প্রসঙ্গে। এক্ষেত্রে গবেষণা করার মতো সমস্যাবলি অতি ব্যাপক, এখানে যেগুলির উল্লেখ করছি. তাতেই সেগুলি সীমিত নয়, যথা: সাধারণ ক্ষমতার উদ্ভব, সামাজিক-অর্থনৈতিক প্রক্রিয়া ও শ্রেণী সংগ্রামের সঙ্গে তার পরস্পর সম্পর্ক, ঐতিহাসিক-সাংস্কৃতিক ব্যাপারাদির (প্রথা ও ঐতিহ্য, আত্মিক উৎপাদন ও পরিভোগের উপায়) সঙ্গে ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া; রাষ্ট্র এবং অন্যান্য রাজনৈতিক সংস্থার সংগঠন ও কর্মসম্পাদন, সেগুলির প্রথাসিদ্ধি, আইনসঙ্গতি, বণ্টনপ্রবণতার রূপ; রাজনৈতিক ক্ষমতার সংস্থার সঙ্গে ব্যক্তিগণ, গ্রুপ, শ্রেণীগুলির সম্পর্ক, ক্ষমতাসম্পর্কের বর্গবিভাগ, রাজনৈতিক ভূমিকা ও আচরণের টাইপ নির্ণয়, রাজনৈতিক ক্ষমতার স্থিতিশীলতা ও ধ্বংস।

মূর্ত-নির্দিষ্ট রাজনৈতিক তত্ত্বে স্বভাবতই উল্লিখিত সমস্যাগুলির মাত্র একাংশই স্থান পায়। এক-একটা রাজনৈতিক তত্ত্বের সীমার মধ্যে তা বিন্যস্ত হয় নানাভাবে। তদুপরি সামাজিক ও জ্ঞানতাত্ত্বিক দিকগুলি তাতে একই ছকে সন্নিবিষ্ট হয় না। তাদের প্রধান প্রধান প্রজ্ঞানমূলক ও ভাবাদর্শীয় দিকগুলিও একই জাতের নয়।

সেটা খুব পরিষ্কার দেখা যায় রাজনৈতিক চিন্তার ইতিহাসে। যেমন, চীনের প্রাচীন যুগের প্রখ্যাত একজন লেগিস্ট শান ইয়ানের (খ্রিঃ পূঃ ৩৯০-৩৩৮) রাজনৈতিক মতবাদের নাভিকেন্দ্র ছিল সম্রাটের ক্ষমতাকে পরম করে তোলা, ব্যক্তির ওপর রাষ্ট্রের সর্বগ্রাসী নিয়ন্ত্রণের পদ্ধতি, প্রজাদেরকে ক্ষমতাধরের অন্ধ হাতিয়ারে পরিণত করার উপায়, রাষ্ট্রিক ক্রিয়াকলাপের অত্যাবশ্যক ধারা হিশেবে চিন্তার একীকরণ ও জনগণের সকলকেই বিমূঢ়করণের প্রণালী। ভারতের 'অর্থশাস্ত্র' জোর দিয়েছে অন্য দিকে। রাষ্ট্র চালনা বিষয়ক মতবাদে সঠিক ও বেঠিক রাজনীতি নিয়ে তা যৌক্তিক গবেষণায় ব্যাপৃত থেকেছে। 'রাষ্ট্র বিষয়ে' গ্রন্থে (খ্রিঃ পূঃ ৫৪-৫১) সিসেরো-র যে মতবাদ আমরা পাই, তাতে প্রধানত আলোচিত হয়েছে আদর্শ রাষ্ট্র ব্যবস্থার রূপ এবং শ্রেষ্ঠ রাষ্ট্রীয় কর্মকর্তার গুণ। মহান ফরাসী বিপ্লবী গ্রাখাস বাবেফের (১৭৬০-১৭৯৭) রাজনৈতিক মতবাদ প্রধানত শোষক

শ্রেণীদের সামাজিক ও রাজনৈতিক প্রভুত্ব উচ্ছেদের প্রশ্নে, মেহনতীদের বৈপ্লবিক একনায়কত্বের রাষ্ট্র সংগঠনের প্রশ্নে কেন্দ্রীভূত। ইতিহাসে একই রকমের দুটো রাজনৈতিক মতবাদ বড়ো একটা জানা নেই*।

এক-একটা মূর্ত-নির্দিষ্ট রাজনৈতিক তত্ত্ব দ্বারা যে জ্ঞান রচিত, তার সাধারণ দিকগুলির মধ্যে পড়ে তার একটা বিশেষ ধরনের যৌক্তিক শৃঙ্খলা, সুসমন্বয়, যার কল্যাণে তাতে প্রমাণ করে দেখানোর, ভবিষ্যদ্বাণীর শক্তি বর্তায়, যেটা রাজনীতির আভিজ্ঞতিক প্রজ্ঞানের অনায়ত্ত।

তত্ত্বের যৌক্তিক দিকটাকে কেবল খানিকটা দূরকাল্পনিক-অবরোহী কিছু রীতির যোগাযোগ বলে দেখা ঠিক নয়। মৌল যৌক্তিক রীতিগুলির যে একটা সামাজিক-ঐতিহাসিক চরিত্র আছে তা বলা সম্ভব এবং বলা আবশ্যক। বৈজ্ঞানিক-প্রজ্ঞানমূলক ক্রিয়া যে সামাজিক কারণপ্রসূত এই ধারণায় উত্তরণ হয় ঐ পথেই, আর রাজনৈতিক-তাত্ত্বিক জ্ঞানের বৈশিষ্ট্য বোঝার পক্ষে এ ধারণাটা অতীব গুরুত্বপূর্ণ।

রাজনীতির তাত্ত্বিক চৈতন্য যে সামাজিকভাবে নির্ধারিত, এ ঘটনা এখন সর্বস্বীকৃত। বর্তমানে সমস্যাটার আসল কথা হল অতি জটিল এই প্রক্রিয়াটার মূর্ত-নির্দিষ্ট আখ্যান এবং উপযুক্ত বৈজ্ঞানিক মানে তা নিয়ে প্রণালীবদ্ধ গবেষণা। কঠিন একটা কাজ হল সেইসব কলকাঠিগুলোকে জানা যার সুবাদে বাহ্যিক পরিস্থিতি (সর্বাগ্রে সামাজিক-অর্থনৈতিক, শ্রেণীগত, ঐতিহাসিক, সাংস্কৃতিক ইত্যাদি) পরিণত হয় ব্যক্তিগত ও সামাজিক রাজনৈতিক-তাত্ত্বিক জ্ঞানের সারগর্ভে পটে।

সামাজিক-কারণোদ্ভূত একটা ব্যাপার হিশেবে রাজনৈতিক তত্ত্বের বৈশিষ্ট্য ব্যাখ্যায় বলা হয়ে থাকে যে তা উদ্ভূত ও গঠিত হয়েছে এমন পরিস্থিতিতে যেখানে সমাজের উৎপাদনী শক্তি একটা নির্দিষ্ট মাত্রায় উঠেছে, এবং বিদ্যমান অর্থনৈতিক সম্পর্ক বৈষয়িক উৎপাদনী শক্তির এই বিকাশের মাত্রার উপযোগী (বা অনুপযোগী)। শ্রেণীগুলির অবস্থা, তাদের বৈরিতা, সামাজিক-রাজনৈতিক চাহিদা, যুগের প্রবণতা ও করণীয় এবং সেইসঙ্গে রাষ্ট্র ব্যবস্থা ও আইনের সঙ্গে সম্পর্কিত প্রশ্নাদি আলোচিত হয় তাতে।

রাজনৈতিক-তাত্ত্বিক জ্ঞানের সামাজিক কারণ আছে এ থিসিসের পক্ষে এই ধরনের যুক্তিতে, যদি তা কড়াভাবে, কোনো সংশোধন ছাড়াই মেনে

চলা হয়, রাজনৈতিক তত্ত্বের সামাজিক প্রকৃতির অন্যান্য অবশ্যগ্রাহ্য নির্ধারকগুলি আড়ালে পড়ে যায়, যা রাজনৈতিক চেতনাকে প্রভাবিত করে। উপরোক্ত ছক অনুসরণের বিপদ এই যে ভাষা, যুক্তিবিদ্যা, চিন্তাপ্রকরণ তাতে বিস্মৃত হয়, যদিও তারাও রাজনৈতিক-তাত্ত্বিক জ্ঞানকে সামাজিক-ভাবে নির্ধারিত করে।

রাজনৈতিক-তাত্ত্বিক জ্ঞান যে সামাজিক কারণোদ্ভূত এ থিসিসের ঐরূপ প্রতিপাদনের দুর্বলতা শুধু এই নয় যে রাজনৈতিক মতবাদের উদ্ভব ও বিকাশের ২২টি (নাকি ৩৩টি?) বাহ্যিক শর্তের সবকটিকে স্মরণে রাখায় বাধা হয় তাত্ত্বিকের। এই শর্তগুলিকে একটা পট হিশেবে বোঝা, যা ছাড়া রাজনৈতিক ভাবকল্পের অস্তিত্ব অসম্ভব -- এইটাই হল তার ঘাটতি।

রাজনৈতিক তত্ত্বের পক্ষে বাহ্য শর্তগুলি কোনো একটা পথ ধরে তার সারার্থ, গঠন ও বাহ্যিক রূপে প্রবেশ করে এমন নয়। তা আসে বিজ্ঞানীর সৃজনী ক্রিয়াকলাপের মধ্যস্থতায়। অবজেকটিভ বাস্তবতা তার পরিপূর্ণতায় কখনোই ব্যক্তিগত, এমনকি সামাজিক রাজনৈতিক-তাত্ত্বিক চেতনায় পৌঁছয় না। হাজার হাজার জিনিস, ঘটনা, লক্ষণ বাস্তবে বিদ্যমান থাকলেও বিজ্ঞানীর তাত্ত্বিক জ্ঞানে নাও থাকতে পারে। মধ্যযুগে বাস্তবতার যেরূপ বোধের প্রাধান্য ছিল, তার কথা বলতে গিয়ে খ্যাতনামা ফরাসি ঐতিহাসিক মার্ক ব্লক লিখেছেন: 'অবিরাম যে পরিবর্তনকে মোটেই অস্বীকার করা হয় নি, তাকে তার সমস্ত ব্যাপকতায় ধরতে লোকে কার্যত ছিল একেবারেই অক্ষম। বলাই বাহুল্য, অজ্ঞতার দরুন। কিন্তু প্রধান কথা এই যে অতীত ও বর্তমানের মধ্যে মিলটায় তাদের বৈষম্য চাপা পড়ত, এমনকি তা লক্ষ করার প্রয়োজনীয়তা থেকেও অব্যাহতি মিলত। যখন মনে করা হত যে রোমক সাম্রাজ্য টিকে আছে, স্যাকসনিয়ার বা সালিসিয়ার রাজারা সিজার আর অগাস্টাসের বংশধর, তখন প্রাচীন রোমের সম্রাটদের সঙ্গে বর্তমান শাসকদের পুরোপুরি সাদৃশ্য কল্পনার প্রলোভন জয় কী করে সম্ভব?... এরূপ ঐতিহ্যপরায়ণতা বর্তমানকে অবিরাম টানে অতীতে এবং তাতে করে উভয়ের বর্ণ মিশিয়ে ফেলে। যে ঐতিহাসিক উপলব্ধিতে বৈচিত্র্যের বোধ বিরাজমান, এটা কি তার বিপরীত নয়?'*

বাস্তবতা থেকে আসা সবকিছু তাগিদই যে রাষ্ট্র ও আইন বিষয়ে কোনো

একজন তত্ত্বকারের কাছে বোধনী শক্তি ও 'নির্মাণকল্পের' যাত্রাবিন্দুতে পরিণত হয়, এমন মোটেই নয়। এ প্রক্রিয়াটা সর্বাগ্রে নির্ভর করে বিজ্ঞানীর পক্ষ থেকে সামাজিক পরিবেশকে দর্শন ও তার তাত্ত্বিক আত্তীকরণের ব্যক্তিগত প্রবৃত্তির ওপর। প্রথমত, সমাজ জীবনের একই বাহ্যিক পরিস্থিতিতে কেন বিভিন্ন মনীষীর কাছে সে পরিস্থিতির বিভিন্ন দিক ব্যক্তিগতভাবে তাৎপর্যপূর্ণ হয়ে ওঠে এবং দ্বিতীয়ত, কেন একই বিষয়ের বিভিন্ন ব্যাখ্যা দেন বিভিন্ন মনীষী, সেটা বোঝা যায় এই থেকে।

ইউরোপের জ্ঞান প্রচারণী যুগের দুই দিক্‌পাল ভাবাদর্শী ভল্টেয়ার ও রুসোর সামাজিক-রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গির তুলনা করে সেটা চমৎকার দেখিয়েছিলেন আ. ই. গের্ৎসেন: 'ভল্টেয়ার এবং রুসো প্রায় সমসাময়িক, কিন্তু কতই না তাঁদের ব্যবধান! ভল্টেয়ার অজ্ঞতার সঙ্গে লড়ছেন সভ্যতার জন্য, আর রুসো এই কৃত্রিম সভ্যতাকেই ধিক্কার দিচ্ছেন। ভল্টেয়ার ছিলেন বিগত যুগের অভিজাত যিনি রোকোকো স্থাপত্যের সেণ্ট-সুরভিত হলের দরজা খুলেছিলেন নবযুগে; তিনি ছিলেন লেস-পরিহিত রাজ দরবারের লোক; দুম করে গিয়েছিলেন বড়ো ফটকের দিকে, আর পঞ্চদশ লুই যখন চলে যান, অনুষ্ঠানকর্তা তাঁর পরিচয় দেন ফ্রাঁসুয়া-মারি-আরুয়েত নামে; দরজার ওপাশে ছিলেন প্লিবিয়ান রুসো, তাঁর মধ্যে du bon vieux temps (শুভ অতীত কালের) কিছুই ছিল না। ভল্টেয়ারের বিষাক্ত বিদ্রূপে মনে পড়ে ডিউক সাঁ-সিমোঁ ও ডিউক রিশেলিয়ের কথা; রুসোর রসিকতা কিছুই মনে পড়ায় না, সামাজিক কল্যাণ কমিটির'* শ্লেষগুলির তা অগ্রদূত।'** প্রত্যেক তাত্ত্বিকই বাস্তবতার পর্যবেক্ষণ ও মূল্যায়ন করেন নিজের ঐতিহাসিক ও বৈজ্ঞানিক-প্রজ্ঞানমূলক অবস্থান থেকে।

রাজনৈতিক-তাত্ত্বিক চেতনায় বেশ কিছু পরিমাণে থাকে সক্রিয়-নির্বাচনমূলক একটা অভিমুখ। যে সামাজিক-শ্রেণীগত ব্যবস্থার সঙ্গে বিজ্ঞানী নিজেকে অভিন্ন বলে দেখেন (অথবা যার প্রতি তিনি একটা সমালোচনামূলক অবস্থান নেন) তাতে নির্ধারিত হয়ে যায় তাঁর তাত্ত্বিক দৃষ্টিপথে কী পড়বে এবং কিভাবে পড়বে, তাঁর মনোযোগ ও চিন্তনের বাইরে থেকে যাওয়াই বা কার নির্বন্ধ। এই বাস্তবতার দৃষ্টিকোণ থেকে মূলগতভাবে গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপারগুলি কেবল ধরা পড়ে ও চেতনায়

স্থান পায়। এ থেকে পরিষ্কার যে কোনো রাজনৈতিক তত্ত্ব যদি ব্যাপক ও আমূলভাবে বিকশিত হয়েও থাকে, তাহলেও তার মধ্যে রাজনীতির গোটা বাস্তব জগতের প্রতিফলন দেখতে চাওয়াটা কত অযৌক্তিক ও নিষ্ফল।

রাজনৈতিক তত্ত্বের সামাজিক নির্ধারণের শেকলে একটা আবশ্যিক আংটা হল দৈনন্দিন ব্যবহারিক-রাজনৈতিক চেতনা, যা চিন্তনের জন্য সংবাদ যোগায় তত্ত্বকারকে। এদিক থেকে আভিজ্ঞতিক চেতনার প্রত্যক্ষতার তাত্ত্বিক পুনর্নির্মাণে যেসব ঘটনা নির্ভরস্থলের কাজ করে তাদের ভাঁড়ারের কাজ করে তা। ঐ একই দৈনন্দিন ব্যবহারিক-রাজনৈতিক চেতনা রাষ্ট্র, আইন ও রাজনীতির তত্ত্বকারকে সেসব সমস্যার 'ইঙ্গিত' দেয় যা নিয়ে তাঁকে খাটতে হবে, বলে দেয় তাদের উপস্থাপনা ও সমাধান। ঘটনার নিজস্ব মূল্যায়নের 'সুপারিশ' করে তাঁর কাছে, সে মূল্যায়ন সূত্রবদ্ধ করার মতো ভাষার 'প্রভাব' দেয়। এই দিকে মনোযোগ অর্পণ করা উচিত যে দৈনন্দিন চেতনার এরূপ সক্রিয়তা তাদের চিহ্ন না রেখে যায় না। দৈনন্দিন শব্দ ও ধারণাগুলি এত তাৎপর্যবহুল ও পরিবর্তনশীল যে তাত্ত্বিক জ্ঞানের 'দেহে' স্থান পেয়ে তা শেষোক্তকে কার্যত নষ্ট করে। প্রত্যেকবার রাজনৈতিক-তাত্ত্বিক জ্ঞানের তন্ত্রের কোনো একটা জায়গায় শূন্যতার সৃষ্টি হয়, তৎক্ষণাৎ তা ভরে ওঠে দৈনন্দিন ধারণায়।

দৈনন্দিন ব্যবহারিক-রাজনৈতিক চেতনার ওপর নির্ভরশীল হলেও রাজনৈতিক-তাত্ত্বিক জ্ঞান কখনো তার দ্বারা পূর্বনির্ধারিত নয়। রাষ্ট্র ও আইনের গবেষকের অন্তত দুটি উপায়ান্তর আছে। একটা হল চেতনার প্রাথমিক গঠনের চাপ ও প্রতিক্রিয়ার নিকট নিষ্ক্রিয়ভাবে আত্মসমর্পণ এবং তদ্দ্বারা স্থাপিত পরিসীমার মধ্যে আটকে থাকা। এরূপ ক্ষেত্রে ঘটনা থেকে ভাবকল্প নিষ্কাশন, অর্থাৎ ঘটনাদির মর্ম, অভ্যন্তরীণ নিয়মাদি উপলব্ধির কাছাকাছি আসতে পারবেন না তিনি। তাত্ত্বিকের সন্ধানগুলির যোগফল হয়ে দাঁড়ায় সেই একই দৈনন্দিন, আভিজ্ঞতিক চেতনার পুনরুৎপাদন (কিন্তু কেবল জটিলকৃত, তাত্ত্বিক ধারায় সুবিন্যস্ত রূপে)।

তবে আরেকটা পথও আছে — আভিজ্ঞতিক জ্ঞানকে এমন বর্গবিন্যস্ত করা যাতে রাজনীতির জগতের ব্যাপার-স্যাপারের মূলে পৌঁছনো যাবে, দৈনন্দিন ব্যবহারিক-রাজনৈতিক চেতনার সীমা ছাড়িয়ে যাওয়া সম্ভব হবে। তবে এক্ষেত্রে কতকগুলি শর্ত মেনে চলা প্রয়োজন: প্রজ্ঞানের বিষয় ও বিষয়ীর মধ্যে পরিষ্কার সীমা রেখা টানা; বিচার্য বিষয়ের প্রতি বিষয়ীর

নিজস্ব অবস্থান নিয়ে বিচারমূলক উপলব্ধি; তাত্ত্বিক বিশ্লেষণে যেসব প্রজ্ঞানমূলক যৌক্তিক প্রণালী অনুসৃত হয়, দৈনন্দিন চেতনার স্বভাবসিদ্ধ চিন্তাধারা, বিচারাদিকে তার স্থান গ্রহণ করতে না দেয়া। সমস্যাটা এই নয় যে দৈনন্দিন চেতনা যে আত্মিক আবহ সৃষ্টি করে তা থেকে বেরিয়ে আসতে হবে। ওটা একটা ইউটোপীয় প্রয়াস। কথাটা হল দৈনন্দিন আভিজ্ঞতিক চেতনার ভৌতশক্তি যেন রাজনৈতিক-তাত্ত্বিক জ্ঞানকে গ্রাস করে ফেলতে না পারে। সেইসঙ্গে এই দৈনন্দিন চেতনার অভিব্যক্তির মান, অন্তঃসার, রূপের কথাটাও বিবেচনায় রাখতে হবে।

এইসব শর্ত পালন এবং সত্যকার তত্ত্বায়ন নিবিড়ভাবে জড়িয়ে আছে তাত্ত্বিকের সামাজিক সহানুভূতি ও বিরূপতা, তাঁর শ্রেণীগত অবস্থানের সঙ্গে। শেষোক্তটি প্রগতিশীল বা প্রতিক্রিয়াশীল দুই হতে পারে যাতে অবজেকটিভ সত্য লাভে সহায়তা বা প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি হয়। কিন্তু নির্দিষ্ট শ্রেণী পরিস্থিতির সঙ্গে বন্ধনে আভিজ্ঞতিক জ্ঞানের ঊর্ধ্বে ওঠা, দৈনন্দিন 'কান্ডজ্ঞানের' মাত্রা অতিক্রম করার ক্ষমতা থেকে রাজনৈতিক মনীষী মোটেই বঞ্চিত হয় না। এখানে দেখা দেয় সর্বকালের অসাধারণ জরুরি একটা সমস্যা — সমাজবিদের প্রজ্ঞানমূলক দায়িত্ব। প্রশ্নটা দাঁড়ায় এই আলোচ্য মনীষী কি শ্রেণীর তাত্ত্বিক চেতনার মানে বুঝে উঠতে সক্ষম, নাকি তাত্ত্বিকের কাজ চালাবার যে দায়িত্ব তাঁর ওপর অর্পিত তা নিশ্চিত করার মতো গুণগুলি তাঁর নেই?

ঐতিহাসিক অভিজ্ঞতা থেকে দেখা যায় যে এরূপ ভূমিকা গ্রহণের সুস্পষ্ট প্রতিবন্ধক আছে কয়েকটি: মেধা ও প্রতিভার অপ্রতুলতা, জ্ঞানের দীনতা, মনোদিগন্তের সীমাবদ্ধতা, স্বাধীন মননে অক্ষমতা। এর অনিবার্য পরিণাম এই যে এইসব ত্রুটি যার থাকবে, সে নিজেরই শ্রেণী স্বার্থ বুঝতে অসহায় হয়ে পড়বে, তার স্বতঃস্ফূর্ত চেতনার আঁচল ধরে চলবে। এ ব্যক্তি স্বভাবতই শ্রেণীর ঐতিহাসিক স্বার্থকে তার বাস্তবিক অবস্থা, তার দাবির পরিসর ও চরিত্র ইত্যাদির সঙ্গে অন্বিত করতে পারে না। এরূপ ব্যক্তি তত্ত্বকে উচ্ছিষ্ট করে, তাতে নিয়ে আসে ধার-করা অন্ধভক্তি, বিভ্রম, কুসংস্কার, বৈজ্ঞানিক মননের রীতিকে স্থূল করে তোলে, সঞ্চার করে মতান্ধতার প্রেরণা।

সামাজিক জীবনের যেসব বাহ্য পরিস্থিতি রাজনৈতিক জ্ঞানের অন্তঃসার ও রূপকে প্রভাবিত করছে, রাজনৈতিক তত্ত্বের সামাজিক নির্ধার্যতার প্রশ্নকে তাদের অস্তিত্ব প্রতিষ্ঠায় পর্যবসিত করাও অনুচিত। কী মূর্ত নির্দিষ্ট রূপে আলাদা আলাদা প্রতিটি নির্ধারক এবং সবকটি একত্রে রাজনৈতিক

তত্ত্বের প্রতিটি উপাদান এবং সমগ্র তত্ত্বকে প্রভাবিত করছে সে সম্পর্কে যথাযথ তথ্য হাতে থাকাই আদর্শ হওয়ার কথা।

কিন্তু মূল সুরের একটা প্রশ্ন আছে যাতে নির্ধারিত হয় রাজনৈতিক তত্ত্বের সামাজিক অর্থ। সেটা হল শ্রেণী স্বার্থ। এক্ষেত্রে শ্রেণী স্বার্থ বলতে ধরা হচ্ছে শ্রেণীর পক্ষে সমাজ জীবন, ঐতিহাসিক বাস্তবতার তাৎপর্যপূর্ণ ব্যাপারাদির প্রতি তার মনোভাব।

রাজনৈতিক তত্ত্বে শ্রেণী স্বার্থের প্রতিফলন প্রক্রিয়ার স্বকীয়তা (কিংবা বলা যেতে পারে আপাতবৈপরীত্য) হল এই যে প্রক্রিয়াটা প্রায়ই চলে অজ্ঞাতে। সেটা এই অর্থে যে একটি শ্রেণীর যে স্বার্থ তিনি অনুমোদন (নাকচ) করছেন তার মর্মার্থ সব তত্ত্বকারই যে বোঝেন এমন নয়। এই ঘটনাটা যে সাধারণভাবে সামাজিক মতবাদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য সেটা আবিষ্কার করে কার্ল মার্কস প্রুধোঁর মতবাদ প্রসঙ্গে প. ভ. আন্নেনকভের নিকট পত্রে উল্লেখ করেন: 'প্রুধোঁ সোজাসুজি এই দাবি করেন না যে **বুর্জোয়া জীবন** তাঁর কাছে **চিরন্তন সত্য**। এটা তিনি করেন পরোক্ষে, বর্গবিভাগগুলিতে দেবত্ব আরোপ করে, ভাবকল্প রূপে যা প্রকাশ করে বুর্জোয়া সম্পর্ক। বুর্জোয়া সমাজের ব্যাপারগুলো যতই তাঁর কাছে ক্যাটেগোরি, ভাবকল্প রূপে প্রতিভাত হয়, ততই তিনি সেগুলিকে স্বয়ম্ভূ, নিজ জীবনে শাশ্বত জিনিস বলে ধরেন। এভাবে, তিনি বুর্জোয়া দিগন্তের বাইরে যেতে পারেন না।'*

একই সমাজতাত্ত্বিক-প্রজ্ঞানমূলক অবস্থা মার্কস এর সামান্য কিছু পরে আরো সাধারণীকৃত ধরনে বর্ণনা করেছিলেন ১৮৪৮ সালের ফরাসি পেটি-বুর্জোয়া বিপ্লবী গণতন্ত্রের মতাদর্শীদের আসল শ্রেণীগত দৃষ্টিভঙ্গির মূল্যায়ন করে। তিনি লেখেন: 'একথা ভাবা উচিত নয় যে গণতন্ত্রের সমস্ত প্রতিনিধিই দোকানদার অথবা দোকানদারের পক্ষপাতী। শিক্ষাদীক্ষা ও ব্যক্তিগত অবস্থানের দিক দিয়ে তাদের মধ্যে থাকতে পারে আসমান-জমিন ফারাক। পেটি বুর্জোয়ার প্রতিনিধি তারা হয়ে দাঁড়ায় এই ঘটনাটায় যে পেটি বুর্জোয়ার জীবন যে সীমা অতিক্রম করে না, তাদের চিন্তাও সে সীমা অতিক্রমে অক্ষম, তাই তত্ত্বের ক্ষেত্রে তারা ঠিক সেইসব কর্তব্য ও সমাধানে পেঁছয় যাতে কার্যত পেটি বুর্জোয়াকে ঠেলে দেয় তার বৈষয়িক স্বার্থ ও সামাজিক অবস্থা। সাধারণভাবে এই হল শ্রেণীর **রাজনৈতিক ও সাহি-**

ত্যিক প্রতিনিধি এবং যে শ্রেণীর তারা প্রতিনিধি, তাদের মধ্যে সম্পর্ক।'* এ থেকে পরিষ্কার বোঝা যায়, যে শ্রেণীর স্বার্থ মনীষী বস্তুত প্রতিফলিত ও যুক্তিসিদ্ধ করছেন, তার ওপর তাঁর অবজেকটিভ নির্ভরশীলতা অব্যবহিত ও সহজ নয়। প্রায়ই মনীষী কল্পনা করেন যে তিনি বুঝি খাটছেন সর্বজনীন, সর্বগ্রাহ্য ক্যাটেগোরি নিয়ে; ব্যক্তিগতভাবে তিনি নিশ্চিত যে তিনি কথা কইছেন সমগ্র মানবজাতির (হয় অধিকাংশের নয় শ্রেষ্ঠাংশের) পক্ষ থেকে ও তাদের হিতার্থে। তাহলেও তাঁর রচনায় শ্রেণী স্বার্থ সুপ্রকট। এই সুপ্রকটতার প্রধান লক্ষণ হল তাঁর মূল্যবোধ।

শ্রেণী স্বার্থ আর তার মূল্যবোধ, এ দুটো জিনিস এক প্রকৃতির নয়। সম্পর্কের সামাজিক-ঐতিহাসিক বাস্তবতায় যে শ্রেণী স্বার্থ অবজেকটিভ ক্ষেত্রে বিদ্যমান তা তত্ত্বের ভাবাদর্শীয় পূর্বসূরীদের 'নির্বাচন', প্রসঙ্গের রূপরেখা, ভাষা ইত্যাদিকে প্রভাবিত করে। তত্ত্বের পরিসীমার মধ্যে যে সাধারণীকৃত মূল্যবোধাশ্রিত বিচার স্থান পায় তা রাজনৈতিক আহ্বানবিধি, কর্মসূচি ও আদর্শের রূপ পরিগ্রহ করে যা সর্বাগ্রে শ্রেণীগুলির পারস্পরিক সম্পর্ক ও সংগ্রামে, রাষ্ট্রের কাজে এবং সমাজের আইনী জীবনে রাজনৈতিক তত্ত্বের ব্যবহারিক ভূমিকাকে রূপায়িত করে।

এটা বেশ ভালো দেখা যায় সতেরো শতকের বিশিষ্ট ইংরেজ ইউটোপীয় সমাজতন্ত্রী জেরার্ড উইনস্টেনলির দৃষ্টান্ত থেকে। 'মুক্তির আইন' গ্রন্থে তিনি যে সামাজিক-রাজনৈতিক মতবাদ উপস্থিত করেন তা শুরুই হচ্ছে 'ইংলন্ডের প্রজাতান্ত্রিক ফৌজের জেনারেল মহামহিম অলিভার ক্রমওয়েল' এবং 'বন্ধুস্থানীয় ও অপক্ষপাতী পাঠকদের' নিকট এই আবেদন জানিয়ে যে তাঁরা উৎপীড়কদের ক্ষমতার উৎপাটন নিশ্চিত করুন এবং 'উৎপীড়িত সাধারণ লোকে যাতে জমির ওপর অবাধ অধিকার পায় ও স্বাধীনতা ভোগ করে' তার জন্য যত্নশীল হোন। উইনস্টেনলি যে রাজনৈতিক আদর্শ উপস্থিত করেছেন তা হল প্রজাতান্ত্রিক শাসন, তা প্রাচীন জগৎ ও মুক্তিকে পুনরুজ্জীবিত করবে, যেখানে 'স্বৈরশাসন বা পীড়ন কেউই তাতে উঁকি দিতে গিয়ে জীবন্ত থাকতে পারবে না'। সমাজের রাজনৈতিক পুনর্গঠন (নির্বাচনের ভিত্তিতে সমস্ত রাষ্ট্রীয় কর্মকর্তা নিয়োগ, রাষ্ট্রীয় পদে কেবল যোগ্য ব্যক্তির অধিষ্ঠান, প্রজাতন্ত্রের সমস্ত পদাধিকারীর বার্ষিক পুন-নির্বাচন ইত্যাদি) এবং ন্যায্য আইনপ্রণয়নীর একটা কর্মসূচি দিয়েছেন

তিনি। যে মূল্যবোধাশ্রিত বিচারের মাধ্যমে উইনস্টেনলি ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট* প্রজাতন্ত্রের রক্ষণাধীনে সংগ্রামী জনগণের শ্রেণী স্বার্থ প্রকাশ করেছিলেন, তা বিশ্লেষণের পক্ষে 'মুক্তির আইন' পুস্তিকাটির পাঠ খুবই সুবিধাজনক।

সাধারণ রাজনৈতিক-তাত্ত্বিক জ্ঞানপুঞ্জে মূল্যবোধ ছাড়াও একটা বড়ো জায়গা নেয় রাজনৈতিক ঘটনার নিয়ম ও ধর্ম বিষয়ে সংবাদ এবং পদ্ধতিমূলক প্রকরণ (বোধোদ্দীপক উপায়, যৌক্তিক প্রকরণ ইত্যাদি) যার সাহায্যে শ্রেণী সমাজের রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানগুলির বিকাশ সম্পর্কে অবিরাম বিশ্বাসযোগ্য নতুন জ্ঞান অর্জিত হয়।

রাজনৈতিক-তাত্ত্বিক চেতনা যে রাষ্ট্র, আইন ও রাজনীতি বিষয়ে অবজেকটিভভাবে সত্য জ্ঞান লাভের নির্ভরযোগ্য উপায় ও সে জ্ঞানের ঘনীভূত রূপ হতে সক্ষম তা সবাই স্বীকার করেন না। যেমন, পশ্চিম জার্মানির লেখক ভালটের টাইমার মনে করেন যে সমস্ত রাজনৈতিক মতবাদেরই চরিত্র বিষয়ীমুখী ও আপেক্ষিক, সুতরাং রাজনীতি সম্পর্কে অবজেকটিভ বৈজ্ঞানিক জ্ঞান নীতিগতভাবে সম্ভব নয়**। কালিফোর্নিয়ার সান হোসে কলেজের প্রফেসর ওয়াইটেকার টি. ডেইনিঙ্গারও সমাজবিদ্যার প্রজ্ঞানমূলক মূল্য প্রসঙ্গে তাঁর সহযোগীদের, পশ্চিমী বুর্জোয়া পণ্ডিতদের দৃষ্টিভঙ্গির উপর মন্তব্য করে এই নৈরাশ্যবাদী সিদ্ধান্তে পৌঁছেছেন: 'ঐতিহাসিক ও দার্শনিক প্রকৃতির একসারি কারণের দরুন বহু আধুনিক মনীষী রাজনৈতিক ও সামাজিক প্রজ্ঞান ও ক্রিয়ার পূর্ণ অবজেকটিভ চরিত্রে বিশ্বাস হারিয়েছেন'***

রাজনৈতিক-তাত্ত্বিক জ্ঞান প্রজ্ঞানমূলক হওয়া সম্ভব, এ বোধে প্রমাদ ঘটতে না দিতে হলে এবং অজ্ঞেয়বাদে পতিত না হতে হলে রাজনৈতিক মতবাদের বহু যুগব্যাপী বিকাশের গোটা ইতিহাসটাই সংস্কারমুক্ত মন নিয়ে দেখতে হবে, তাদের আধুনিক অবস্থা লক্ষ করতে হবে সুস্থ মস্তিষ্কে। ইতিহাসের অভিজ্ঞতা এই সাক্ষ্য দেয় যে রাজনৈতিক তত্ত্বে প্রজ্ঞানের অগ্রগতি চলেছে এবং চলছে,রাজনীতির সঙ্গে নানাভাবে সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রাদি

বিষয়ে যতরাজ্যের আত্মমুখী মতামতের বিশৃঙ্খল পুঞ্জীভবনের এক প্রক্রিয়া তা নয়। অর্জিত ও সঞ্চিত হচ্ছে রাজনৈতিক ঘটনাদির যে জগৎ তার প্রকৃতিগত অতি বিভিন্ন ধরনের নিয়মবদ্ধতার অবজেকটিভ দিক দিয়ে সত্য সংবাদ যা ইতিহাসের বাস্তবতায় যাচাই করে নেয়া যায়। প্রকৃতি জগৎ থেকে রাজনৈতিক-তাত্ত্বিক জ্ঞানের পার্থক্য হল তার বিষয়বস্তু একটা সামাজিক-অর্থনৈতিক ব্যবস্থা থেকে অন্যটায় আমূল বদলে যায়, বিশেষ করে ইতিহাসের প্রাক্‌সমাজতান্ত্রিক পর্যায় থেকে কমিউনিস্ট ব্যবস্থায় উৎক্রমণ কালে। এমনকি একই টাইপের শ্রেণী সমাজের গোটা বিদ্যমানকাল জুড়েও তা অপরিবর্তিত থাকে না। কিন্তু এই ঘটনা থেকে এবং রাজনৈতিক-তাত্ত্বিক জ্ঞানে মূল্যবোধের আপেক্ষিক গুরুত্ব যে সমধিক তা থেকে মোটেই এই দাঁড়ায় না যে রাজনৈতিক মতবাদ সর্বদাই আপেক্ষিক, তা থেকে অবজেকটিভভাবে বিশ্বাসযোগ্য সাধারণভাবে তাৎপর্যপূর্ণ সংবাদ মেলে না।

রাজনৈতিক মনীষী (যদি শুধু তিনি প্রজ্ঞানের অনুকূল একটা সামাজিক অবস্থানে থাকেন এবং বৈজ্ঞানিক তত্ত্বায়নের নির্দিষ্ট দাবিগুলি মেনে চলেন, তাহলে) তর্কাতীতভাবেই এরূপ সত্য সংবাদ লাভে তিনি সমর্থ। এর প্রমাণ হল প্লেটো আর আরিস্টটল, কনফুশিয়াস আর কৌটিল্যের যুগ থেকে শুরু করে আমাদের বিশ শতক পর্যন্ত রাজনৈতিক চিন্তার ক্লাসিকদের সৃষ্টি। সাধারণভাবেই বৈজ্ঞানিক-তাত্ত্বিক জ্ঞানের যে চরিত্রবৈশিষ্ট্য লেনিন দিয়েছেন, তা রাজনৈতিক মতবাদেও বিস্তৃত: '...সমস্ত ভাবাদর্শই ঐতিহাসিকভাবে আপেক্ষিক, কিন্তু এতে কোনো সন্দেহ নেই যে সমস্ত বৈজ্ঞানিক (দৃষ্টান্তস্বরূপ, ধর্মীয় থেকে যা পৃথক) ভাবাদর্শেরই থাকে অবজেকটিভ সত্য, পরম প্রকৃতি'*। রাজনীতির জগৎ অতিরহস্যময়, অতি-প্রহেলিকাপূর্ণ একটা ক্ষেত্র নয় যা মানসশক্তির পক্ষে দুর্ভেদ্য কুহেলীতে আচ্ছন্ন। কিন্তু তার বৈজ্ঞানিক অবধারণার পথে যত দুরূহতা থাকে তা প্রকৃতিবিদ্যার ক্ষেত্রে যা দেখা যায় তার চেয়ে শতগুণ বেশি।

যেসব মূল্যায়নে শ্রেণী স্বার্থ প্রকাশ পায় এবং সামাজিক আদান-প্রদানে কোনো একজন বিষয়ীর পক্ষ থেকে সমাজে নিজের অবস্থান ও লক্ষ্য, তথা চারিপাশের সামাজিক জগৎ প্রসঙ্গে তার ব্যবহারিক ও তাত্ত্বিক মনোভাব বিধৃত হয়, তার সমষ্টিকে আজকাল ভাবাদর্শ বলা হয়। ভাবাদর্শ হল যেকোনো রাজনৈতিক মতবাদের সারাংশ। ভাবাদর্শের দিক দিয়ে

নিরপেক্ষ, সঠিক বললে ভাবাদর্শ থেকে মুক্ত কোনো রাজনৈতিক মতবাদ সম্ভব নয়।

বর্তমান পর্যায়ে শ্রেণী স্বার্থ উদ্ঘাটিত ও প্রতিষ্ঠিত করায়, সামাজিক শ্রেণীগুলির কর্তব্য ও লক্ষ্য এবং গোটাগুটি এক-একটা সমাজের লক্ষ্য নির্ণয়ে বিজ্ঞানের অংশ গ্রহণ ক্রমেই সমাজ জীবনের একটা বাস্তব ঘটনা হয়ে দাঁড়াচ্ছে। বিশেষ করে বুর্জোয়া তাত্ত্বিকেরা খুবই চান বৈজ্ঞানিক জ্ঞান দিয়ে নিজেদের ভাবাদর্শ প্রতিষ্ঠা করতে, এই দুই উপাদানের সামঞ্জস্য ঘটাতে। কিন্তু তাঁদের অবলম্বিত ঐতিহাসিকভাবে রক্ষণশীল সামাজিক অবস্থান, প্রচারিত দর্শন, অনুসৃত পদ্ধতিবিদ্যা এই সংকল্পটাকে এমন সমস্যায় পরিণত করে, বুর্জোয়া চৈতন্যমুখী গবেষকের পক্ষে যার সমাধান অসম্ভব।

উক্ত সমস্যার ইতিবাচক সমাধান মিলেছে মার্কসবাদ-লেনিনবাদে। এখানেই প্রথম ভাবাদর্শ হয়ে দাঁড়াচ্ছে নিজের ও ইতিহাসের বিষয়ে পুরোপুরি গোটা সত্যটা উদ্ঘাটনে সামাজিক শ্রেণীর গুরুত্বপূর্ণ আগ্রহবোধের অভিব্যক্তি। প্রলেতারিয়েতের মূর্তিতে সামনে এগিয়ে এসেছে এমন সামাজিক গ্রুপ যার একটা মৌল শ্রেণী স্বার্থ হল জীবনের সমস্ত সত্যটা জানা, সমাজে যা ঘটছে, যেসব প্রক্রিয়া চলেছে, যেসব নিয়মে তা চালিত হচ্ছে, সে সম্পর্কে অবজেকটিভ বৈজ্ঞানিক জ্ঞান আয়ত্ত করা।

মার্কসীয় রাজনৈতিক তত্ত্বের বিকাশ চলে দ্বান্দ্বিক প্রজ্ঞানের নিয়ম অনুসারে, লেনিন যেটাকে বর্ণনা করেছেন এইভাবে: '...মানবিক চিন্তনের প্রকৃতিই এমন যে আমাদের তা দিতে পারে ও দেয় পরম সত্য যা দানা বাঁধে আপেক্ষিক সত্যগুলির সমষ্টি থেকে। বিজ্ঞানের বিকাশের প্রত্যেকটা ধাপ এই পরম সত্যের স্তূপে নতুন নতুন দানা যোগ করে, কিন্তু জ্ঞানের বিকাশ দ্বারা প্রসারিত বা সংকুচিত হওয়ায় প্রতিটি বৈজ্ঞানিক বক্তব্যের সত্যের পরিসীমা আপেক্ষিক'*। পরম সত্য দেখা দেয় আপেক্ষিক সত্যের সমষ্টি থেকে। কিন্তু তার মানে এই নয় যে সেটা বিভিন্ন তৈরি সত্যগুলির যান্ত্রিক যোগফল। সত্য হল প্রজ্ঞানের একটা অন্তহীন প্রক্রিয়া যার সারার্থ হল অবজেকটিভের দিকে, পরমের দিকে গতি। রাজনীতির মার্কসীয়-লেনিনীয় প্রজ্ঞানের বিশ্বাসযোগ্যতা ও নির্ভরযোগ্যতা, তার দ্বারা প্রাপ্ত ফলাফলের অখণ্ডনীয়তা একটা বাস্তব ব্যাপার। এইসব ফলাফলে বৈজ্ঞানিক-

প্রজ্ঞানমূলক কর্ম থেকে বিচ্ছিন্ন আড়ষ্ট কোনো কিছু একটা ব্যাপার বোঝায় না। নতুন নতুন অন্তঃসার দিয়ে রাজনৈতিক-তাত্ত্বিক জ্ঞানের অবিরাম সমৃদ্ধিতে তা বিরাজমান।

রাজনৈতিক তত্ত্বের ভাবাদর্শীয়তা দেখা দেয় শ্রেণীগুলির পারস্পরিক সম্পর্কের বাস্তবতায় দলীয়তার নীতি হিশেবে, নির্দিষ্ট একটা শ্রেণী স্বার্থ রক্ষার দাবি হিশেবে। সব ধরনের রাজনৈতিক-তাত্ত্বিক জ্ঞানে এ নীতি বিধৃত এবং এই অর্থে তা নিঃসন্দেহেই দলীয়, যদিও তাদের সবকটাতেই সে দাবিটা পরিষ্কার উচ্চারিত হয় না।

ভাবাদর্শের দিক থেকে নিরপেক্ষ, সুতরাং পার্টির দিক থেকেও নিরপেক্ষ, 'নির্দলীয়' রাজনৈতিক মতবাদ কিছু নেই। কোনো না কোনো ভাবে এই সিদ্ধান্তের দিকে ঝোঁকেন বুর্জোয়া তত্ত্বকারেরাও (বলাই বাহুল্য নিজেদের অবস্থানে থেকে এবং মোটেই তাঁদের সবাই নন)। যেমন, নিউ ইয়র্ক-ব্রুকলিন নগর বিশ্ববিদ্যালয়ের মার্টিন লান্ডাউ তাঁর মনোগ্রাফে বলেছেন: 'গবেষককে কোনো এক ধরনের নির্বীজিত, একেবারে নিরপেক্ষ পর্যবেক্ষকে পরিণত করা কার্যত একটা অসম্ভব কল্পকথা'*। অবশ্য অনেক ভালো হত যদি তিনি গবেষকের তাত্ত্বিক কর্মের শ্রেণীগত-দলীয় ধারা, নির্দিষ্ট একটি সামাজিক শ্রেণীর জন্য তাঁর সেবার কথাটা স্বীকার করতেন। তবে উক্ত গ্রন্থে লেখক এই প্রশ্নটা সযত্নে এড়িয়ে গেছেন।

প্রজ্ঞানরত বিষয়ীর দলীয়তা বৈজ্ঞানিক গবেষণাক্রমে তিনি যে ফল পেতে পারেন তার অবজেকটিভ সত্যতার সঙ্গে জড়িত।** কিন্তু এই সম্পর্কটা পুনরপি অব্যবহিত, সরাসরি নয়, পরোক্ষ — আপেক্ষিকভাবে বিশ্বাসযোগ্য, আপেক্ষিকভাবে সত্য জ্ঞানের বহুধাপী জটিল এক ব্যবস্থার মাধ্যমে তা গ্রথিত। সম্পর্কটা গাঁথা হয় প্রজ্ঞানের পক্ষে অনুকূল বিশ্ববীক্ষামূলক উপস্থাপনের মাধ্যমে, সমাজসত্য জানতে ইচ্ছুক সামাজিক গ্রুপটির মূল্যবোধ ও মূল্যায়ন গ্রহণ করে। ফরাসি ঐতিহাসিক ম. ওজুফ-এর 'তেমির্দোর থেকে

ব্রুমেয়ার: বিপ্লব নিজেই নিজের কথা বলে' প্রবন্ধের মালমশলাকে ভিত্তি করে 'বিপরীতের নিয়ম' অনুসারে এ থিসিসের সঠিকতা প্রমাণের চেষ্টা করা যাক। প্রতিক্রিয়াশীল তের্মিদোরিয়ান (ফরাসি প্রজাতন্ত্রকালীন পঞ্জিকায় মাসের নাম। — অনুঃ) কনভেণ্টে* উৎসবের প্রশ্ন আলোচনায় বিপ্লবের স্মৃতি সংরক্ষণের উদ্দেশ্যে ১৭৮৯ সালের ১৪ জুলাই থেকে শুরু করে গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাবলিকে স্মারক করা প্রয়োজন বলে অধিকাংশ বক্তা স্বীকার করেন। বক্তারা উৎসবের জন্য শুধু সেইগুলিকে নির্বাচনের দাবি করেন 'যা জাতিকে সংযত করতে, বিপ্লবের অবসান হয়ে গেছে, এই চেতনার উদ্রেক করতে পারে। সুতরাং যে বিবরণ তাঁরা দেবেন তাতে ফাঁক থেকে যাবে। এই ফাঁকের মধ্য দিয়ে অন্তর্ধান করবে কতকগুলি ঘটনা: ৩য় সনের ১২ জার্মিনাল ও ১ প্রেরিয়াল, যাদের হতোদ্যম স্মৃতিতে ৯ তের্মিদোরকে বিপ্লবের অবসান বলে ঘোষণার ইচ্ছাটা ভেস্তে যাবার কথা। খসে পড়বে ১ম সনের ৩১ মে, কনভেণ্টের পক্ষে অসহনীয় স্মৃতির সঙ্গে যা জড়িত, ১৭৯২ সালের ২ সেপ্টেম্বর যার কাছে ম্লান হয়ে যাবে ১০ অগস্টের ছটা। বিভিন্ন স্মারক ঘটনার মাঝে মাঝে বিছিয়ে আছে বিস্তীর্ণ বিস্মৃতি। বহু বক্তা যৌথ স্মৃতি থেকে 'শহীদ বাহুল্য' উপড়ে ফেলতে চান, কেননা দুর্ভাগ্যকে চিরন্তন করে তোলা উচিত নয়, তার কথা শুধু ততটা মনে রাখা দরকার যতটা তা সঠিক শিক্ষা দিতে পারে।

নাটকের পাত্রপাত্রীদের ব্যাপারেও একই রকম বাছাই চলছে... আসল কথা হল নির্ভেজাল বীর খুবই কম আর স্মারক করে কোনো একজন কর্মকর্তার জীবনের সব কথা বলা কঠিন।'** তের্মিদোরী প্রতিনিধিরা ছিল প্রতিবিপ্লবী বৃহৎ বুর্জোয়ার ইচ্ছার বাহক, যে ফরাসি বিপ্লব ঘটেছিল, সে সম্পর্কে সত্য কথাটা বলার আদৌ কোনো আগ্রহ ছিল না তাদের। তারা চাইছিল জনগণের বৈপ্লবিকতা দমন করতে, ভবিষ্যৎকে জনগণের বিপজ্জনক অনির্দিষ্টতা থেকে মুক্ত রাখতে। তাই বিপ্লবের সত্যকার চিত্রটাকে ভিন্ন করে তুলে জনগণের রাজনৈতিক চেতনা থেকে তা মুছে দেবার জন্য তারা যথাসাধ্য করে। আইনপ্রণেতাদের প্রয়াসে নাকচ হয়ে গেল বিপ্লবের সত্যকার ইতিহাস।

রাজনৈতিক-তাত্ত্বিক জ্ঞানের যেমন ভাবাদর্শীয়, তেমনি তার বৈজ্ঞানিক-প্রজ্ঞানমূলক কাজটাও দেখা দরকার।* কোনো একটা তাত্ত্বিক প্রতিপাদ্য কার পক্ষে লাভজনক এ প্রশ্নের জবাব পাবার পর আরেকটা প্রশ্ন থাকে: প্রতিপাদ্যটা কতখানি সত্য। এই পার্থক্যটা উপেক্ষা করলে সমাজবিদ্যার বিষয়বস্তু, গঠন ও কাজ, তার সম্ভাবনার যে কোনো বিশ্লেষণই আজ হবে ত্রুটিযুক্ত। ঐ পার্থক্যটা তার পদ্ধতিগত ভূমিকা ছাড়াও মার্কসীয়-লেনিনীয় তত্ত্বের বিকাশে একটা অত্যাবশ্যক ভূমিকা পালন করে, যে বিকাশ চলেছে প্রলেতারিয়েতের কাছে বিজাতীয় ভাবধারার সঙ্গে অবিরাম দ্বন্দ্বের মধ্য দিয়ে।

যে তত্ত্বকাররা প্রলেতারিয়েতের নয়, অন্যান্য সামাজিক শ্রেণীর সামাজিক-রাজনৈতিক স্বার্থ প্রকাশ করছে, তাদের বৈজ্ঞানিক-প্রজ্ঞানমূলক ক্রিয়াকলাপের পদ্ধতি ও ফলাফলের প্রতি বিরূপ মনোভাব নিতে হবে, তা জাজ্বল্যমানরূপে দেখিয়ে গেছেন মার্কস, এঙ্গেলস ও লেনিন। এইসব পদ্ধতি ও ফলাফলের মধ্যে যুক্তিযুক্ত ও কার্যকরী যাকিছু রাষ্ট্র ও আইন বিষয়ে দ্বান্দ্বিক-বস্তুবাদী তত্ত্বের বৈজ্ঞানিক সম্ভাবনা বৃদ্ধিতে সহায়ক হতে পারে তা বেছে তাদের অবজেকটিভ সত্যের তন্নতন্ন সমালোচনামূলক যাচাইয়ের পর গ্রহণ করেছেন। এমনকি প্রতিপক্ষের অনুসন্ধান পদ্ধতি ও সিদ্ধান্তের সঙ্গে যখন অমিল ঘটত, তখনো তা খন্ডনের আগে প্রতিপক্ষের কাজের ইতিবাচক, সবল দিকটা অবশ্য অবশ্য তলিয়ে দেখেছেন এবং তা দিয়ে নিজের ভাবনাকে যাচাই করে নিয়েছেন।**

প্রলেতারীয় শ্রেণীগত অবস্থানের বিরোধী ভাবাদর্শীয় অবয়বের (তাত্ত্বিক নির্মিতিপ্রসূত সিদ্ধান্তের) প্রতি একেবারেই ভিন্ন মনোভাব নিতেন মার্কস, এঙ্গেলস ও লেনিন। এদের সঙ্গে তাঁরা সংগ্রাম চালিয়েছেন প্রচন্ড এবং আপোসহীন। প্রলেতারীয় সাধনার পক্ষে বিপজ্জনক, সর্বনাশা এদের চরিত্র উদ্ঘাটনে মার্কসবাদ-লেনিনবাদের প্রতিষ্ঠাতারা ছিলেন অনমনীয়। শাণিত যুক্তিতে তাঁরা এই ধরনের মূল্যবোধকে ঝেঁটিয়ে সাফ করেছেন, শ্রমিক শ্রেণীর, মেহনতী জনগণের ওপর তাদের অনিষ্টকারী প্রভাবকে দুর্বল ও নিষ্ক্রিয় করে দিয়েছেন। মার্কস, এঙ্গেলস ও লেনিনের ঐতিহ্য বর্তমানের

মার্কসীয়-লেনিনীয় রাজনৈতিক তত্ত্বেও সজীব ও প্রবহমান।

রাজনৈতিক-তাত্ত্বিক জ্ঞানে 'ভাবাদর্শীয় — প্রজ্ঞানমূলক' ব্যাপারটা একই রকম সমতল নয়। যেকোনো তাত্ত্বিক জ্ঞানের মতোই তা ধারকত্বময়, স্তরবহুল। বিশ্লেষণে তার ভেতর বিভিন্ন 'ছেদ' ধরা পড়ে, তাদের প্রত্যেকটিতে আছে মনন সামগ্রীর সংগঠন ও প্রতিবেদনের নিজস্ব বিশেষ প্রণালী।

সামাজিক সম্পর্কের বিভিন্ন ব্যবস্থায় রাজনৈতিক উপাদানের অন্তর্ভুক্তি, সামাজিক জীবনের নানান দিকের সঙ্গে তার বিজড়নে নির্ধারিত হয়ে যায় রাজনৈতিকভাবে 'আড়াআড়ি' পথে ঘটনা বিশ্লেষণের সম্ভাবনা ও তর্কাতীত প্রয়োজনীয়তা, বিভিন্ন বিষয়গত-প্রজ্ঞানমূলক দৃষ্টিকোণ থেকে তাদের তাত্ত্বিক অধ্যয়ন বাধ্যতামূলক হয়ে ওঠে। রাজনৈতিক-তাত্ত্বিক জ্ঞান যে গড়ে ওঠে বহুতল বহুবিভাগীয় ভবনের মতো, এই অবজেকটিভ চাহিদাটাই তার কারণ। তার বিভাগ ও তলাগুলি হল: দার্শনিক-রাজনৈতিক, সামাজিক-রাজনৈতিক. রাষ্ট্রিক-আইনী (প্রাতিষ্ঠানিক-ব্যবহারশাস্ত্রীয়), রাজনৈতিক-মনস্তাত্ত্বিক জ্ঞান। রাজনীতির টেকনিকাল-প্রশাসনিক দিকটার চর্চা থেকে রাজনৈতিক সাইবারনেটিক্স, রাজনীতির সাংকেতিক ব্যবস্থার বৈজ্ঞানিক নিরীক্ষা থেকে রাজনৈতিক সেমিওটিক্স ইত্যাদি প্রবর্তনের তাগিদ আসছে। কিন্তু রাজনৈতিক-তাত্ত্বিক জ্ঞানরূপী ভবনের শেষ ইটটি গাঁথতে এখনো বহু বাকি আছে।

সামগ্রিক রাজনৈতিক-তাত্ত্বিক জ্ঞানের পূর্বোল্লিখিত প্রতিটি বিভিন্নতা ও অঙ্গের আছে নিজ নিজ বিশেষ বিষয়, রাজনৈতিক জগতের সেই টুকরোটার জন্য সে 'দায়ী' যা তার ভাগে পড়ে। এদের প্রত্যেকটির আছে বোধের নিজস্ব উপায় ও যৌক্তিক পদ্ধতি। তাদের প্রত্যেকটি তদুপযোগী জ্ঞান সূত্রবদ্ধ ও প্রস্তাবিত ক'রে নিজেদের কর্তব্য পালন ও লক্ষ্য সিদ্ধ করে।

অন্য ধরনের সামাজিক-তাত্ত্বিক জ্ঞানের সঙ্গে প্রতিতুলনায় (দার্শনিক, নান্দনিক, অর্থনৈতিক, সমাজতাত্ত্বিক ইত্যাদি) রাজনৈতিক-তাত্ত্বিক জ্ঞানের অখণ্ডতা লক্ষণীয়। কিন্তু ওই জ্ঞানটাকেই বিচার করার সময় শুধু ঐ কথাটা প্রতিপাদনেই সীমাবদ্ধ থাকা অনুচিত। এমন একটা সামান্য বিষয়ের উত্থাপন না করলেও চলত যদি না প্রচলিত থাকত এই মত যে প্রতিটি রাজনৈতিক তত্ত্বই হল যুগপৎ দর্শন, রাজনীতির সমাজতত্ত্ব, রাষ্ট্রবিদ্যা, ব্যবহারশাস্ত্র, রাজনৈতিক মনোবিদ্যা, রাজনীতির নৈতিকতা, সবই। এরকম ধারণা থাকলে রাজনৈতিক-তাত্ত্বিক জ্ঞানকে একটা জটিলগঠন সমগ্ররূপে বোঝায় অসুবিধা হয়।

রাজনৈতিক-তাত্ত্বিক জ্ঞানের একটা বিস্তারিত ছক দিয়েছেন পশ্চিম জার্মানির রাজনীতিবিদ মানফ্রেড হেট্রিথ তাঁর 'রাজনীতিবিদ্যার পাঠ্যপুস্তকে'। তিনি লিখেছেন: 'রাজনীতিবিদ্যা একটা ব্যবহারিক বিজ্ঞান হওয়ায় তার তন্ত্রে প্রজ্ঞানের আরো বিজ্ঞানধর্মী উপায় অন্তর্ভুক্ত হওয়া উচিত।'* হেট্রিখের মতে এ উপায় হল সংবাদ, ব্যাখ্যা, সিদ্ধান্ত ও ভাষ্য। এই বর্গবিভাগ অনুযায়ী তিনি পৃথক করেছেন: রাজনৈতিক সমাজবিদ্যা (সংবাদ ও ব্যাখ্যা), রাজনৈতিক তত্ত্ব (সমস্যার সমাধান), রাজনৈতিক দর্শন (ভাষ্য)। রাজনৈতিক তত্ত্বে অনুধাবনের বিষয়বস্তু হল লক্ষ্য, শৃঙ্খলা, ব্যাপারাদির ক্ষেত্র, প্রথা-প্রতিষ্ঠান; রাজনৈতিক সমাজবিদ্যায় — গঠন, পরিস্থিতি, আচরণ। রাজনৈতিক তত্ত্বে এই বিষয়গুলিকে বিচার করা হয় 'সঠিক' ও 'সম্ভবপর', দুই দিক থেকে। রাজনৈতিক সমাজবিদ্যায় 'বিদ্যমানতার' দিক থেকে। এ ছক অগ্রহণযোগ্য এইজন্য যে প্রথা-প্রতিষ্ঠান, আচরণবিধি, গঠন কোন কোন মূর্ত-নির্দিষ্ট সামাজিক শ্রেণী সম্পর্কাদির মধ্যস্থতা করে, রাজনীতির সমস্যার তাত্ত্বিক সমাধান দেয়া হচ্ছে কাদের শ্রেণীগত লক্ষ্যে এবং কোন মূর্ত-নির্দিষ্ট দার্শনিক ও পদ্ধতিগত অবস্থান থেকে সে সম্পর্কে ইচ্ছে করেই চুপ করে থাকা হয়েছে।

বোঝাই যায় যে রাজনৈতিক মতবাদের কোনো না কোনো বিভাগে রাজনৈতিক-তাত্ত্বিক জ্ঞানের উল্লিখিত বিভিন্নতাগুলি কম বা বেশি পরিমাণে থাকতেও পারে, আবার আদৌ না থাকতে পারে। বর্তমান যুগে, রাজনৈতিক-তাত্ত্বিক জ্ঞানে 'বিযুক্তি' ও বিশেষীকরণের প্রক্রিয়া যখন চলেছে প্রখরভাবে, তখন 'বহুমাত্রিক', সর্বধারক (অর্থাৎ রাজনৈতিক-তাত্ত্বিক জ্ঞানের সমস্ত বিভিন্ন দিক যাতে বিধৃত) রাজনৈতিক মতবাদের দেখা মিলছে অনেক কম। বেশি দেখা যাচ্ছে রাজনীতি নিয়ে দার্শনিক গবেষণা, রাজনৈতিক-সমাজতাত্ত্বিক ধারণা, রাষ্ট্রিক-ব্যবহারশাস্ত্রীয় শিক্ষামালা ইত্যাদি। যা বলা হল তাতে এই বোঝায় না যে রাজনৈতিক-তাত্ত্বিক জ্ঞানের সমস্ত বিভিন্ন দিকের ঐক্য বুঝি-বা অন্তর্ধান করছে। তবে বর্তমানে এ ঐক্য থাকছে অন্য রূপে, অতীত যুগের চেয়ে ভিন্ন, উচ্চতর তাত্ত্বিক ভিত্তিতে।

রাজনৈতিক-তাত্ত্বিক জ্ঞান যে রাজনীতির জগৎ সম্পর্কে সম্পূর্ণ ও অখণ্ড তাত্ত্বিক জ্ঞান দিতে সমর্থ, তার জন্য তা এই ঐক্যের নিকট ঋণী।

এই ঐক্য ভাঙলে, তা থেকে এমনকি একটা উপাদান খসে গেলেই এরূপ জ্ঞানলাভের আশা হয়ে দাঁড়ায় অনিশ্চিত।

এই প্রসঙ্গে 'ভাবাদর্শের অস্তগমন' ধারণার মতাবলম্বী মার্কিন পণ্ডিত জেরালড ওয়ালটার্সের যুক্তির পরিপূর্ণ অসারতার উল্লেখ করা প্রয়োজন। এই 'ভাবাদর্শবিরোধীটি' ঘোষণা করেছেন যে রাজনৈতিক দর্শন মৃত ন্যায়, আদর্শ রাষ্ট্র ইত্যাদি নিয়ে ঐতিহ্যাগত কথাবার্তা অর্থহীন হয়ে দাঁড়িয়েছে। তাঁর সন্দেহ নেই যে রাজনৈতিক চিন্তার ক্ষেত্রে দৃষ্টবাদ নাকি একটা বিপ্লব ঘটিয়েছে এবং প্লেটোর সময় থেকে রাজনীতি বিষয়ে দার্শনিক যে চিন্তা চলে আসছে তার চেয়ে অনেক সাফল্যের সঙ্গে রাজনীতির প্রকৃতি উদ্ঘাটিত করতে পারে রাজনৈতিক ব্যবস্থার আভিজ্ঞতিক নিরীক্ষা (রাজনৈতিক সমাজতত্ত্ব)।

কোনো একটা বিশেষ-স্কুলের দর্শন নয়, সাধারণভাবেই দর্শনের জ্ঞানতাত্ত্বিক সামর্থ্য বিষয়ে এরূপ স্কেপটিসিজমে* প্রকাশ পায় এই সত্য সম্পর্কে অজ্ঞানতা যে প্রথমত, দার্শনিক জ্ঞান — হিউরিস্টিক্স** বা আবিষ্কার ধর্মের দিক থেকে — মূর্ত-নির্দিষ্ট বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের সমাধিকারী, এবং দ্বিতীয়ত, নির্দিষ্ট বিষয়টির গুণ, গঠন, কাজ, বাহ্যিক নির্ভরশীলতা, সাময়িক অবস্থা ইত্যাদি সম্পর্কে যেকোনো তাত্ত্বিক জ্ঞান তার গঠনের দিক থেকে পরিপূরণাত্মক, তা দানা বাঁধে পরস্পরের পরিপূরক সমস্ত বিভিন্ন দিক নিয়ে।

রাজনৈতিক ব্যাপারাদির অখণ্ড উপলব্ধি সম্ভব হয় রাজনীতির দুনিয়ার নানান বিষয়গত-প্রজ্ঞানমূলক অভিমুখের সমন্বয় এবং অবিরাম 'সম্মিলনের' মাধ্যমে। এইসব অভিমুখে পাওয়া সমস্ত জ্ঞানের অঙ্গীভবনে তা বাস্তব হয়ে ওঠে। এগুলির কোনোটার কোনোরকম গুরুত্ব হ্রাস বা উপেক্ষায় রাজনৈতিক ব্যাপারাদির অখণ্ড বোধ সম্ভব নয়।

রাজনীতির জগতে (যেমন সবধরনের জটিল তন্ত্রেই) এমন কিছু প্রবণতা আছে যা তার জটিলতার মাত্রাহ্রাসে 'সক্রিয়'। কিন্তু এই অবজেকটিভ প্রক্রিয়াটা মোটেই রাজনৈতিক ব্যাপারাদির বৈজ্ঞানিক-তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ ও বর্ণনার

অত্যধিক সরলীকরণ ও সর্বাধিগম্যতায় ঠেলে দেয় না।*

বলাই বাহুল্য, বিষয়ের মর্মোপলব্ধি কেবল তাকে গোটাগুটি ধরায়, তার 'ছেদ' ও 'অভিক্ষেপগুলিকে' যথাসম্ভব বেশি সংখ্যায় লিপিবদ্ধ করাতেই ফুরিয়ে যায় না। প্রজ্ঞাত বৈশিষ্ট্যগুলির ভিত্তিরূপে বিষয়টাকে অখণ্ড একটা ব্যবস্থা বলে প্রকাশ করা গুরুত্বপূর্ণ।

মূর্ত-নির্দিষ্ট রাজনৈতিক মতবাদে তার সাংস্কৃতিক-প্রজ্ঞানমূলক পট গঠনকারী সমস্ত ব্যবস্থাই প্রতিসৃত ও অভিব্যক্ত হয়। তা রূপ নেয় সে মতবাদের গঠন, অন্তঃসার এবং ভাষাতেও। তদনুযায়ী তার মধ্যে দেখা ও ভাগ করা যায়: ক) বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের 'প্যারাডিগমায়' জমে ওঠা একটা স্তর ;** খ) দার্শনিক-পদ্ধতিমূলক ও নির্বিশেষ সমাজবিদ্যাগত ধারণাদির স্তর; গ) মতবাদ গঠনের মুহূর্তে প্রচলিত বিমূর্ত-রাজনৈতিক-তাত্ত্বিক বোধের সমষ্টি।

বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের 'প্যারাডিগমার' চাপ রাষ্ট্র, আইন, রাজনীতির তত্ত্বকার বোধ করেন সচেতনভাবে নয়: দার্শনিক-পদ্ধতিমূলক অবস্থানটা তিনি বেছে নেন, আর রাজনৈতিক-তাত্ত্বিক 'ব্যাপারটা' নিজে সৃষ্টি করেন। এটা একটা মোটামুটি ছক; কিন্তু সাংস্কৃতিক-প্রজ্ঞানমূলক পটের বিভিন্ন মানের ক্রিয়ার বৈশিষ্ট্য এবং রাজনৈতিক মতবাদের ওপর তার প্রভাব বুঝতে খানিকটা সাহায্য হয়।

বিজ্ঞানের ঐতিহাসিকেরা এই সিদ্ধান্তে এসেছেন যে মধ্য যুগ থেকে সাম্প্রতিক কালে উৎক্রমণের পর্বে, পুঁজিতান্ত্রিক সামাজিক সম্পর্ক যখন দেখা দেয় ও দানা বাঁধে, তখন থেকে যান্ত্রিক চিন্তা, যান্ত্রিক বিশ্ববীক্ষাও দেখা দেয় ও প্রাধান্য লাভ করে। রেনেসাঁসের যুগে, এমনকি পরবর্তী কয়েক শতক যাবৎ ঘড়ি ছিল মহাবিশ্বের মডেল। বিশ্বের যান্ত্রিক বোধের বিকাশকে

তা বেশ প্রভাবিত করে। বিশ্ব ব্যাপারের মাপকাঠি এবং তা ব্যাখ্যার প্রধান নীতি হিশেবে ঘড়ি তখন পরিণত হয় বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের 'প্যারাডিগমায়'।

বলবিদ্যা ও গণিত হয়ে উঠল বিজ্ঞানের শীর্ষ, বিশ্বের ওপর আধিপত্য করল তাদের দৃষ্টিকোণ। এই অবস্থান থেকে বিশ্বব্যবস্থা ব্যাখ্যার অর্থ হল বিশ্বকে (এবং তার অন্তর্গত সমস্ত বস্তুকে) বিমূর্ত এবং সেইসঙ্গে জাজ্বল্যমান রূপে কল্পনা করা, সবচেয়ে ভালো হয় তাকে যুক্তিযুক্তভাবে জুড়ে তোলা ও খুলে ফেলা ঘড়ির যন্ত্রব্যবস্থার সদৃশ বলে ধরা। এই শতকগুলির পণ্ডিতদের চিন্তায় প্রায় একাধিপত্য করেছে যান্ত্রিকতার প্রবণতা। রাজনীতি বিষয়ক চিন্তাও এই প্রবণতায় আচ্ছন্ন। ১৭-১৮ শতকে রাষ্ট্রব্যবস্থাকে একটা যান্ত্রিক ব্যবস্থার সঙ্গে তুলনীয় করা, রাষ্ট্র ও যন্ত্রের মধ্যে সাদৃশ্য দেখাটা ছিল স্বাভাবিক। এর একটা ক্লাসিকাল দৃষ্টান্ত আমরা পাই হবসের 'লেভিয়াথানে', 'নাগরিক প্রসঙ্গে' গ্রন্থে। জার্মান রাষ্ট্রবিদ কাসপার ব্লুণ্ট্লি তৎকালে সঠিক মন্তব্য করেছিলেন: 'হবস রাষ্ট্রকে দেখেন শিল্প সৃষ্টি হিশেবে, রাষ্ট্রে ঐক্যবদ্ধ লোকেদের দেখেন আদিম উপাদান হিশেবে, ঘড়ির চাকাগুলোর মতো গবেষক যাদের খুলে খুলে দেখবেন যাতে জানতে পারেন কী কারণে এবং কী উদ্দেশ্যে, তদুপরি কী উপায়ে ও কী রূপে গড়ে উঠেছে রাষ্ট্র'*। তাই বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের 'প্যারাডিগমার' সঙ্গে রাজনৈতিক তত্ত্বের সহসম্পর্ক ছাড়া সে তত্ত্বের গঠনের কতকগুলি মূল 'গ্রন্থি', চিন্তাধারার প্রধান বৈশিষ্ট্য বোঝা সম্ভব নয়।

নিজের যৌক্তিক-প্রজ্ঞানমূলক অস্তিত্বে রাজনৈতিক-তাত্ত্বিক জ্ঞান বিভিন্ন রূপ নেয়। সেগুলি হল: বর্গ, নিয়ম, নীতি, তত্ত্ব ইত্যাদি। চিন্তার রূপ (বোধ, বিচার, সিদ্ধান্ত) থেকে তাদের পার্থক্য হল তারা শুধু যৌক্তিক নির্মাণ নয়, জ্ঞানতাত্ত্বিক প্রক্রিয়ার উপায় এবং ধাপও বটে। রাজনৈতিক-তাত্ত্বিক জ্ঞানের রূপের প্রশ্নটি নিয়ে এখনো যথেষ্ট চর্চা হয় নি, নিজের গবেষকের অপেক্ষায় তা আছে। সম্ভবত সেইজন্যই যেমন এইসব রূপের প্রত্যেকটির বৈশিষ্ট্য তেমনি তাদের সাধারণ তন্ত্রের বোধে মতভেদ থেকে

গেছে। এটি সর্বাগ্রে 'রাজনৈতিক তত্ত্ব' (রাজনৈতিক মতবাদের) মতো কেন্দ্রীয় বর্গগুলির ব্যাখ্যা ও নামকরণের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য।

ফরাসী গবেষক জাঁ তুষারের পরিচালনায় 'রাজনৈতিক ভাবকল্পের ইতিহাস' নামে দুই খণ্ডে প্রকাশিত গ্রন্থটির লেখকেরা মনে করেন যে রাজনৈতিক মতবাদ ('রাজনৈতিক ঘটনার তাত্ত্বিক বিশ্লেষণের ওপর প্রতিষ্ঠিত ভাবনার একটি জটিল ব্যবস্থা') এবং রাজনৈতিক ভাবকল্পের মধ্যে প্রভেদ আছে। মতবাদের চেয়ে ভাবকল্পে অন্তর্বস্তু থাকে অনেক বেশি (দৃষ্টান্তস্বরূপ, 'ফ্রান্সের রাজনৈতিক ভাবকল্প')*। রাজনৈতিক ভাবকল্পের প্রকৃতি বিষয়ে বিচার লেখকেরা করেছেন খুবই ঝাপসাভাবে। মতবাদ আর ভাবকল্পের মধ্যে একটা মূলগত পার্থক্য টানাটাও মনে হয় ঠিক নয়: দুটোই তো জ্ঞানতাত্ত্বিক নির্মাণ**। এই ধরনের প্রভেদে চাপা পড়ে তাদের একধর্মিতা।

পশ্চিম জার্মানির রাজনীতিবিদ ভালটার এইখনার উল্লেখ করেছেন যে জার্মান ভাষায় 'রাজনৈতিক তত্ত্ব', 'রাজনৈতিক দর্শন', 'ভাবকল্পের ইতিহাস', 'আপ্তবাক্যের ইতিহাস' কথাগুলি ব্যবহৃত হয় প্রায় সমার্থে; কখনো কখনো 'তত্ত্বে' বোঝায় আধুনিক রাজনৈতিক তত্ত্ব ও পদ্ধতিবিদ্যা। তাঁর সিদ্ধান্ত, উক্ত ক্ষেত্রে একই রূপ শব্দ ব্যবহার জার্মান ভাষাতে নেই। ইংরেজি ভাষাতেও অবস্থাটা মোটামুটি একইরকম, শুধু এই তফাৎ যে সেখানে যথাযথ আভিজ্ঞতিক গবেষণার নাম দেয়া হয় 'রাজনৈতিক বিজ্ঞান'।***

রাজনৈতিক তত্ত্বের সংজ্ঞায় সমুচিত বৈজ্ঞানিক কঠোরতার অভাব নেহাৎ তেমন একটা নিরীহ ব্যাপার নয়, রাজনৈতিক-তাত্ত্বিক জ্ঞানের রূপের প্রকৃতি সম্পর্কে অবগতির দুর্বলতার লক্ষণ মাত্র নয়, উক্ত রূপগুলির মূলকথা ও তন্ত্রে গভীরভাবে প্রবেশের পথে গুরুত্বপূর্ণ প্রতিবন্ধক।

আগে যা বলা হয়েছে, তাতে এক-একটা রাজনৈতিক মতবাদের মূল

সমস্যাগ‌ুলির আলোচনা আছে। কিন্তু বাস্তবে বিদ্যমান সামগ্রিক রাজনৈতিক-তাত্ত্বিক জ্ঞানে এক-একটা মতবাদ পরস্পর থেকে বিচ্ছিন্ন নয়। উল্টে, তারা সর্বদাই নির্দিষ্ট এক-একটা গোষ্ঠী, স্কুল ও ধারায় জোট বাঁধে। কোনো না কোনো গোষ্ঠী ও ধারার সঙ্গে অভিন্নতা (বিপক্ষতার) মধ্য দিয়ে রাজনৈতিক মতবাদ নিজের বৈধতার প্রমাণ দেয়, শ্রেণী সমাজের আত্মিক ও সামাজিক-ব্যবহারিক জীবনে উপয‌ুক্ত ভূমিকা গ্রহণের দাবিকে প্রতিষ্ঠিত করে।

৪৩। রাজনৈতিক তত্ত্ব থেকে ব্যবহারিক কার্যকলাপ

বৈজ্ঞানিক-প্রজ্ঞানম‌ূলক এবং ম‌ূল্যবোধাত্মক-দিক্‌নির্ণায়ক কাজের সঙ্গে সঙ্গে রাজনৈতিক তত্ত্ব নিয়ন্ত্রণম‌ূলক কাজও করে: ব্যক্তি, গ্র‌ুপ ও শ্রেণীর ব্যবহারিক-রাজনৈতিক আচরণ নির্ধারণে অংশ নেয়।

রাজনৈতিক তত্ত্ব সামাজিক-রাজনৈতিক কার্যকলাপে যোগ দেয় এবং অন্যান্য ধরনের মননশীল ক্রিয়াকর্মের (যা আসলে আর তাত্ত্বিক নয়) মধ্য দিয়ে হয়ে ওঠে একটা বৈষয়িক শক্তি। শেষোক্ত আঙ্গিকভাবে রাজনৈতিক তত্ত্বের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট। কিন্তু মননক্রিয়া র‌ূপায়িত হয় অন্যভাবে, তাদের নিজস্ব প্রক্রিয়াদিতে এবং স‌ৃষ্টি করে অন্য ধরনের জ্ঞান। সর্বাগ্রে রাজনৈতিক-প্রশাসনিক সিদ্ধান্ত, রাজনৈতিক শিক্ষা, রাজনৈতিক প্রচার তার অন্তর্গত।

রাজনীতির বৈজ্ঞানিক-তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ আর রাজনৈতিক-প্রশাসনিক সিদ্ধান্ত গ্রহণের মধ্যে পার্থক্য আছে। প্রজ্ঞানের অন্তিম লক্ষ্য হল রাজনৈতিক ঘটনাদির নিয়মবদ্ধতা সম্পর্কে নতুন, অবজেকটিভ দিক দিয়ে সত্য জ্ঞানলাভ। রাজনৈতিক-প্রশাসনিক সিদ্ধান্তের লক্ষ্য হল ব্যবহারিক কর্তব্যের স‌ূত্রায়ণ এবং তা পালনের পথ ও উপায়াদি নির্দেশ। রাজনৈতিক-প্রশাসনিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ বৈজ্ঞানিক-তাত্ত্বিক বিশ্লেষণের চেয়ে একটুও সহজ ও সরল না (প্রায়ই তা হয়ে দাঁড়ায় অসাধারণ কঠিন)। এটা কেবল ক্রিয়াকলাপের চরিত্রের দিক থেকেই অন্যবিধ। কোনো লোকের রাজনৈতিক চেতনায় 'অন্যবিধ' কথাটা 'খারাপ' ('ভালো')-র অন‌ুষঙ্গী হয়ে পড়ে। কেবল দ্বান্দ্বিকতার প্রেরণায় লালিত চিন্তাই চেতনাকে এই অন‌ুষঙ্গ থেকে বাঁচায়।

রাজনৈতিক-প্রশাসনিক সিদ্ধান্ত গ্রহণের সময় স্বভাবতই যে বিষয়টার ওপর সিদ্ধান্ত নেয়া হচ্ছে তার অভ্যন্তরীণ অবস্থা ও বাহ্যিক

নির্ভরশীলতাগুলি সম্পর্কে বিশ্বাসযোগ্য সংবাদ জানা হয়, চেষ্টা করা হয় কর্মনির্বাহের নিয়মবদ্ধতা ও সমাজবিকাশের প্রবণতাগুলি সম্পর্কে বৈজ্ঞানিক জ্ঞান কাজে লাগাবার। হাতে নেয়া ব্যবহারিক কাজটা পালনের নিয়মাদির সন্ধান ও নির্দেশদানের প্রশ্ন যতটা ওঠে, সেই পরিমাণে এমন কতকগুলি পদ্ধতি ব্যবহৃত হয় যার সাহায্যে বৈজ্ঞানিক-তাত্ত্বিক গবেষণায় প্রজ্ঞানমূলক কর্তব্যও সাধিত হয়। সেটা যত এগুবে, ততই প্রখরভাবে বৃদ্ধি পাবে গৃহীত রাজনৈতিক-প্রশাসনিক সিদ্ধান্তটির বৈজ্ঞানিক প্রতিপাদনের প্রয়াস। তাহলেও এ প্রণালীর পক্ষে বৈজ্ঞানিক-তাত্ত্বিক ক্রিয়াকলাপের স্থান গ্রহণ বা তার সঙ্গে অভিন্ন হয়ে ওঠা বড়ো একটা সম্ভব নয়।

কোনো না কোনো রাজনৈতিক-প্রশাসনিক সিদ্ধান্ত রচনার উপদেষ্টার ভূমিকা নেবার জন্য আমন্ত্রণ করা হয় রাষ্ট্র তত্ত্বে বিশেষজ্ঞদের, রাজনীতিবিদদের। কিন্তু তাঁরা যে পরামর্শ দেন সেটা তাত্ত্বিক-প্রজ্ঞানমূলক প্রক্রিয়া নয়।

বিজ্ঞানের সূত্রগুলি কেবল সাধারণ রূপরেখায় দিক নির্ণয়ের, ব্যবহারিক কর্তব্যের সুশৃঙ্খল বর্ণনা ও উপস্থাপনের, সিদ্ধান্তের কোনো একটা প্রকারভেদের মূল পরিণামের পূর্বাভাস দানের কাজ করতে পারে এবং সত্যিই করে থাকে। রাজনৈতিক ক্রিয়াকলাপে মূর্ত-নির্দিষ্ট যেসব পরিস্থিতি দেখা দেয়, তার প্রতিটিতেই বিজ্ঞানের সমস্ত বোধ ও সিদ্ধান্ত সরাসরি প্রযোজ্য, এমন আশা বাতুলতা। ব্যবহারিক কার্যকলাপের অসংখ্য চাহিদার আগে থেকে তৈরি জবাব, দাওয়াই তার কাছে দাবি করা নীতিগতভাবে ভুল। তত্ত্বের যে নির্ধারণ অনড় আর ব্যবহারিক যে সিদ্ধান্ত প্রকৃতিগতভাবেই পরিস্থিতিমূলক, তাদের মধ্যে সম্পর্ক অতি জটিল। একথা মনে করা অনুচিত যে সাংগঠনিক-প্রশাসনিক ক্রিয়াকলাপ বুঝি নেহাৎ একটা অবরোহী প্রক্রিয়া, রাজনৈতিক-তাত্ত্বিক জ্ঞানের বিমূর্ত সূত্রগুলিকে রাজনৈতিক বাস্তবতার আংশিক ঘটনায়,ব্যাপারে প্রয়োগ করার একটা প্রাথমিক-যৌক্তিক প্রক্রিয়া।

রাজনৈতিক-তাত্ত্বিক জ্ঞানের পাশাপাশিই থাকে পাঠ্য বিষয় — বিভিন্ন শিক্ষা ব্যবস্থায় যা পড়ানো হয়। পাঠ্য বিষয় হল খোদ বিজ্ঞানেরই সমস্ত তথ্য, নিয়ম, প্রণালী, ব্যাখ্যা ইত্যাদি সহ সেই বিজ্ঞানের এক প্রকার ছাপ। পাঠ্য বিষয়ের চেহারা গড়ে ওঠে যে-কাজ তাকে নিষ্পন্ন করতে হবে তার প্রভাবে। কাজটা হল শিক্ষণ, অর্থাৎ নির্দিষ্ট পরিস্থিতিতে নির্দিষ্ট ক্রিয়া ও আচরণের কথা শিক্ষার্থীদের জানানো এবং তাদের দ্বারা তার আয়ত্তীকরণ।

অধ্যাপনযোগ্য ও পঠনীয় একটা বিষয় হয়ে উঠতে হলে রাজনৈতিক-তাত্ত্বিক জ্ঞানকে এমন একটা আকার দিতে হবে যা শিক্ষণের পক্ষে সুবিধাজনক, অধ্যাপনাকর্মের কাঠামো এবং শিক্ষার্থীদের সাধারণ বিকাশের মানের উপযোগী। বিশেষ করে যে তাত্ত্বিক জ্ঞান পাঠ্য বিষয়ের উপজীব্য হবে তার আকার সংক্ষিপ্ত ও গঠন পরিবর্তিত হয়। তাকে 'লঘুপাচ্য' করা হয়: তা থেকে যথাসম্ভব বাদ দেয়া হয় স্ববিরোধ, অনুমানপ্রকল্প, বিতর্কমূলক অংশ, অস্পষ্ট এবং 'শূন্য' স্থানাদি। পাঠ্য বিষয়ের জন্য নির্বাচিত তাত্ত্বিক জ্ঞান ছাত্রদের দেয়া হয় তার বৈজ্ঞানিক রূপে নয়, উপদেশাত্মক ভাষায়, তৈরি সিদ্ধান্ত দিয়ে।

তাত্ত্বিক জ্ঞানের এই শোধন নিয়মসঙ্গত এবং বোধগম্য, কেননা শিক্ষাদান হল 'গৌণ প্রজ্ঞান': ইতিমধ্যেই সমাধিত বৈজ্ঞানিক প্রশ্নের জ্ঞান লাভ করে শিক্ষার্থীরা, নির্দিষ্ট কর্তব্যগুলি সমাধানের ইতিপূর্বেই আবিষ্কৃত উপায় ও পদ্ধতি আয়ত্ত করে।

রাজনৈতিক-প্রশাসনিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ এবং রাজনৈতিক জ্ঞানের শিক্ষা হল তেমন গুরুত্বপূর্ণ দুটি খাত যা দিয়ে জ্ঞান 'ফিরে আসে' জীবনে, তাকে প্রভাবিত করে। তবে রাজনৈতিক তত্ত্ব সর্বাধিক পরিমাণে একটা বৈষয়িক, সামাজিক শক্তিতে পরিণত হয় তখন, যখন তা জনগণের ওপর আধিপত্য করে। ব্যাপকতম জনগণের মধ্যে রাজনৈতিক-তাত্ত্বিক জ্ঞানের প্রসারের উপায়, এই জনগণের নিকট তার ব্যাখ্যার উপায় হল প্রচার।

প্রচারের প্রধান লক্ষ্য হল রাজনৈতিক-তাত্ত্বিক প্রজ্ঞানে আহরিত মূল্যবোধ ও জ্ঞানের নির্দিষ্ট একটা সমষ্টিকে লোকেদের অভ্যন্তরীণ প্রত্যয়ে পরিণত করা। প্রত্যয় বলতে বোঝায় এমন ব্যক্তিগত চেতনা, যাতে সমন্বয় দেখা যায় অবজেকটিভ জগতের (এক্ষেত্রে রাজনীতির জগতের) ঘটনাদির তথ্যের, তাদের সত্যতার সাবজেকটিভ মূল্যায়ন এবং এই নিশ্চয়তা যে এই মূল্যায়ন সঠিক। তাছাড়া, সত্য, ন্যায্য ও রূপায়ণযোগ্য বলে নির্দিষ্ট ব্যক্তিটি যে জ্ঞান অর্জন করেছে, তার ভিত্তিতে কাজে নামার জন্য প্রস্তুতিও অবশ্য-অবশ্যই এ প্রত্যয়ের অন্তর্গত। ভাবকল্প ও ধারণা দৃঢ় প্রত্যয়ে পরিণত হয় যদি ব্যক্তি ও সামাজিক গ্রুপগুলি এইসব ভাবকল্প ও ধারণার মানেটা নিজের জন্য কেবল বোঝেই শুধু নয়, তাদের প্রতি একটা গঠনমূলক মনো-ভাবও পোষণ করে। এই মনোভাবটাই হল সেই ট্রান্সফর্মেটার যা ভাবকল্পকে পরিণত করে প্রত্যয়ে।

প্রভুত্বকারী প্রত্যেকটি শ্রেণীই চায় যে তার ক্ষমতা, তার সন্তোষজনক

রাজনৈতিক ব্যবস্থা যেন অধিকাংশ অধিবাসীর পক্ষ থেকে প্রয়োজনীয় সক্রিয়, নিদেনপক্ষে নিষ্ক্রিয়-নীরব সমর্থন ভোগ করে। এ ছাড়া শ্রেণীটির খানিকটা দীর্ঘস্থায়ী প্রভুত্ব সম্ভব নয়। সেটা সম্ভব হয় যদি এই অধিকাংশের থাকে তদনুযায়ী রাজনৈতিক প্রত্যয়, নির্দিষ্ট ক্ষমতার বিচক্ষণতা, সাধারণ উপকারিতা, তার ঐতিহাসিক ও আইনী ন্যায্যতায় বিশ্বাস।

শ্রেণীবৈরাকীর্ণ সমাজে প্রভুত্বকারী শোষক শ্রেণী নানাবিধ প্রচারমূলক কলকাঠি নেড়ে নিপীড়িত ও শোষিত শ্রেণীদের চেতনায় এই কল্পকথা ঢোকাতে চায় যে নির্দিষ্ট ব্যবস্থাটা স্বাভাবিক, ন্যায্য এবং অভেদ্য, যেক্ষেত্রে ব্যবস্থাটা একা তার পক্ষেই লাভজনক। ব্যাপক জনগণের সত্যকার রাজনৈতিক আলোকপ্রাপ্তিতে সে কোনোক্রমেই সচেষ্ট নয়। উল্টে বরং, তার প্রচারকদের কাজ হল যে কোনো মূল্যে অত্যধিকাংশ অধিবাসীর চেতনাকে এমনসব দৃষ্টিভঙ্গি ও মনোবৃত্তির চৌহদ্দির মধ্যে ধরে রাখা যা এই অধিকাংশের সত্যকার স্বার্থকে নয়, শোষক শ্রেণীর স্বার্থকে পুষ্ট করে।

তাই এই সিদ্ধান্তে আসতে হয় যে শ্রেণীবৈরাকীর্ণ সমাজব্যবস্থায় প্রভুত্বকারী শ্রেণীর পক্ষ থেকে জনগণের রাজনৈতিক আলোকপ্রাপ্তি, রাজনৈতিক-তাত্ত্বিক জ্ঞানের সর্বোচ্চ আশীর্বাদ দানের কোনো ব্যাপার থাকে না, থাকে কেবল ইচ্ছাকৃতভাবে তাদের চিরন্তন রাজনৈতিক বিভ্রান্তিতে ঠেলে দেবার প্রয়াস।

কমিউনিস্ট প্রচার নীতিগতভাবেই একটা ভিন্ন জিনিস। তার কাজ হল জনগণের ক্রমাগত ব্যাপক স্তরের মননশীলতার মান উন্নয়ন, মেহনতী জনগণকে তাদের চলতি, দৈনন্দিন চাহিদা ও আশু কর্তব্যের বোধ থেকে মৌলিক স্বার্থ ও ঐতিহাসিক পরিপ্রেক্ষিতের চেতনায় উত্তোলন, উক্ত স্বার্থাদি পূরণের লক্ষ্যে তাদের রাজনৈতিক সক্রিয়তার উদ্বোধন ও বহুলীকরণ। কমিউনিস্ট প্রচারের এই যে ব্রত, তার কারণ হল জনগণের উচ্চ রাজনৈতিক সচেতনতাই প্রলেতারিয়েতের বৈপ্লবিক-মুক্তি আন্দোলনের, সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রপাটের সাফল্যের শক্তি ও গ্যারাণ্টি। ভ. ই. লেনিন যা বলেছেন, সেগুলি তখনই শক্তিশালী যখন জনগণ সবকিছুর ব্যাপারে অবহিত, সবকিছু বিচার করে সুচিন্তিতভাবে, সবকিছুতে এগোয় সচেতন থেকে। মেহনতী জনগণের উচ্চ রাজনৈতিক সচেতনতা ও প্রত্যয়ের বিকাশ ঘটে সর্বাগ্রে ক্রমাগত ও পরিকল্পিতভাবে তাদের রাজনৈতিক-তাত্ত্বিক জ্ঞান দানে, যা মূর্ত হয়েছে রাষ্ট্র, আইন, রাজনীতি বিষয়ে মার্কসীয়-লেনিনীয় বিজ্ঞানে। বিভিন্ন বুর্জোয়া, শোধনবাদী ইত্যাদি ভাবাদর্শীয় নির্মিতির তাত্ত্বিক অসারতা ও

ব্যবহারিক অনিষ্টকরতার জ্বলজ্বলে ও প্রত্যয়জনক প্রদর্শনও এরূপ সচেতনতার একটা অপরিহার্য পূর্বশর্ত।

রাজনৈতিক তত্ত্ব হল প্রচারের, ভাবাদর্শীয় ক্রিয়াকলাপের মূল ভিত্তি।

প্রচারমূলক মালমশলা জ্ঞানকে ঘনীভূত ও প্রতিফলিত করে, এ জ্ঞান সূত্রবদ্ধ হয় বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব থেকে খানিকটা ভিন্নভাবে। বলাই বাহুল্য, প্রচার তার বিষয়বস্তুর অনেকটাই আহরণ করে বিজ্ঞান থেকে, তার ওপর নির্ভর করে, এদিক থেকে বলা যায় তা বিজ্ঞানমূলক।* তবে তত্ত্বের যেসব প্রতিপাদ্য পরে নির্দিষ্ট একটা প্রসেসিঙের পর গণচেতনায় অঙ্গীভূত হয়, সেগুলিকে প্রথমে বাছাই করে সুবিন্যস্ত করে নিতে হয়। রাজনৈতিক-তাত্ত্বিক ভাবকল্পকে যে রূপে জনগণের চেতনায় প্রবিষ্ট হতে হবে, খোদ ভাবকল্প তার চেয়ে অনেক জটিল।

জনগণের রাজনৈতিক চেতনায় সরাসরি রাজনৈতিক-তাত্ত্বিক জ্ঞান 'রোপণ', অথবা প্রচারমূলক ভাষ্য সংগ্রহ দ্বারা স্বাধীন তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ, রাজনীতির বৈজ্ঞানিক-তাত্ত্বিক অনুধাবনের স্থান গ্রহণ যে চেষ্টা অবশ্যই ব্যর্থ তা বোঝাই যায়। এরূপ প্রয়াসে তত্ত্ব এবং প্রচার উভয়েরই কেবল অপূরণীয় ক্ষতিই হবে। যেমন রাজনৈতিক-প্রশাসনিক সিদ্ধান্ত গ্রহণে ও রাজনৈতিক জ্ঞান লাভে, তেমনি প্রচারের ক্ষেত্রেও রাজনৈতিক তত্ত্ব নিজের বিশেষ বিষয়বস্তুতে যত নিমগ্ন থাকবে ততই তা ফলপ্রদ হবে। এই নিমগ্নতা আসে ও নিশ্চিত হয় সর্বাগ্রে বহুবিধ বাস্তব ব্যবহারিক-রাজনৈতিক ক্রিয়াকলাপের সঙ্গে রাজনৈতিক তত্ত্বের অচ্ছেদ্য বংশগতীয় সম্পর্ক ও কর্মনির্বাহী 'সহযোগিতা' থেকে। ব্যবহারিক তাগিদে রাজনৈতিক-তাত্ত্বিক জ্ঞান যদিও প্রায়ই বিভিন্ন অতাত্ত্বিক রূপ নিতে বাধ্য হয়, তার আদি প্রকৃতির কোনো কিছু খোয়া যায় (এবং তাতে করে রাজনৈতিক-তাত্ত্বিক জ্ঞানে 'অনাবশ্যক সরলতার কিছু কিছু বিভ্রান্তিকর ধারণা' জন্মানো সম্ভব হয়), তাহলেও ব্যবহারিক ক্রিয়াকলাপের সঙ্গে রাজনৈতিক তত্ত্বের যোগাযোগে মোটামুটি

যতটা লাভবান হওয়া যায় তাতে যেকোনো দ্বান্দ্বিক প্রক্রিয়ার অনিবার্য খরচাটা অনেক পুষিয়ে যায়।

সামাজিক-রাজনৈতিক বাস্তবতা যে রাজনৈতিক-তাত্ত্বিক প্রজ্ঞানের ভিত্তি ও তার যাত্রাবিন্দু, তাতেই যে তার নির্ধারক শর্ত ও দিকগুলি স্থির হয়ে যায়, এই সাধারণ প্রশ্ন নিয়ে আজকাল বিশেষ তর্ক ওঠে না। কথাটা হল কেবল বাস্তব ক্রিয়াকলাপের এই জ্ঞানতাত্ত্বিক তাৎপর্য উদ্ঘাটক কতকগুলি মূর্ত-নির্দিষ্ট দিক নিয়ে।

ব্যক্তি, শ্রেণী, সমাজের পক্ষে জরুরি সামাজিক কর্তব্যের সমাধানে রাজনৈতিক-তাত্ত্বিক জ্ঞানকে প্রয়োগের একটা ইতিবাচক ফল হল সে জ্ঞানের শূন্য স্থানগুলির আবিষ্কার: রাজনীতির জগতের কোনো একটা ঘটনা, প্রক্রিয়া, নিয়মবদ্ধতা সম্পর্কে অবজেকটিভ দিক দিয়ে সত্য সংবাদের অভাব উদ্ঘাটন। স্বতঃস্পষ্ট হয়ে ওঠে যে পৃথক পৃথক পদ্ধতিগত প্রণালী সুসম্পূর্ণ নয়, তাদের উন্নতিসাধন বাঞ্ছনীয়, ইত্যাদি। এ থেকে আসে বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের আরো প্রসার ও গভীরতার আবশ্যিকতা। এইটাই হল সেই গতির উৎস যা ক্রমে ক্রমে দূরীভূত করে রাজনৈতিক-তাত্ত্বিক জ্ঞান এবং তাতে প্রতিফলিত বিষয়ের মধ্যে অসামঞ্জস্য।

রাজনৈতিক তত্ত্বের কাছে ব্যবহারিক-রাজনৈতিক ক্রিয়াকলাপ যে গুরুতর দাবি রাখে সেটা হল যথাযথ পার্থক্য টানা ও যুক্তির দিক থেকে রাজনৈতিক-তাত্ত্বিক জ্ঞানের সর্বোচ্চ শৃঙ্খলা। এই তাগিদ মেনে না চললে সংঘটনী-ব্যবহারিক ক্ষেত্রে সে জ্ঞানের প্রয়োগ সম্ভব নয়। এইরূপ যুক্তিবন্ধনে অবশ্য তত্ত্বকার নিজেই আগ্রহী, মানবজাতি যে বিপুল জ্ঞান সঞ্চয় করেছে ও করে চলেছে, তার ভেতর সাফল্যের সঙ্গে দিশা পাবার জন্য এটা তার পক্ষে প্রয়োজন। এই শৃঙ্খলাসাধনের জ্ঞানতাত্ত্বিক একটা উপকার হল এই যে বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের গোটা গঠনটাই তাতে আমূল উন্নত হয়, চলতি ধ্যানধারণা ও বর্গের অর্থ বোধে সাহায্য হয়, রাজনৈতিক-তাত্ত্বিক জ্ঞানের স্ববিরোধ ও অসামঞ্জস্যের সন্ধান ও দূরীকরণ সম্ভব হয়, জ্ঞান হয় 'ঘনীভত,' তথ্যবহুল, দেখা দেয় তা আঁটোসাঁটো দৃষ্টিগোচর আকারে।

যেসব বোধে রাজনৈতিক-তাত্ত্বিক জ্ঞান গড়ে ওঠে, তার অনেকগুলিকেই ক্রিয়াশীল করার অতি গুরুত্বপূর্ণ একটা প্রক্রিয়া শুরু হয় বাস্তব ক্রিয়াকলাপের তাগিদে। বিজ্ঞানে 'ক্রিয়াশীল' কথাটায় বোঝায় কোনো একটা সাধারণ বোধের সুনির্ধারণ, তার আভিজ্ঞতিক (সাধারণত পরীক্ষামূলক) যাচাই নয়; যেসব বৈশিষ্ট্য-লক্ষণের মূর্ত-নির্দিষ্ট আভিজ্ঞতিক অনুধাবন

সম্ভব তাদের মোট সমষ্টি মারফত পুনর্বার যাচাইও করা চলে না। এই নির্ধারণের সঠিকতা ও ফলপ্রসূতার শর্ত হল — যে সাধারণ বোধটার 'গ্রন্থিমোচন' করা হচ্ছে তার এবং যথার্থ, অভিজ্ঞতায় পরীক্ষিত (বিশেষত পরিমাণের দিক থেকে পরিমাপ্য) বৈশিষ্ট্যগুলির সঙ্গে বাস্তবতার একই দিকের প্রতিতুলনা। 'ক্রিয়াশীলতায়' অনেক প্রসারিত হয় বাস্তবের নিরিখ ব্যবহারের সম্ভাবনা। ব্যবহারিক যাচাই এবং পরিমাণের দিক থেকে পুনর্বার যাচাই যেসব ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়, তার বদলে প্রযোজ্যের পথ করে দেয় তা।

আরো সাধারণ সমস্যা, রাজনৈতিক-তাত্ত্বিক জ্ঞানের সত্যতার মানদণ্ড হিশেবে বাস্তব ক্রিয়াকলাপের কথা কিছুটা বিশদে বলার প্রয়োজন আছে। এই বলে শুরু করা উচিত যে সত্য জ্ঞান সত্য হয়ে থাকে তার যাচাইয়ের, বাস্তবে পরীক্ষার আগেও। বাস্তব ক্রিয়াকলাপ রাজনৈতিক তত্ত্বের সত্যতার জন্ম দেয় না, কেবল তার গুণটার উদ্ঘাটন ও সমর্থন করে। তা সত্যের সূচক ও মাপকাঠি হতে পারে এইজন্য যে অবজেকটিভ সত্য নিজেই কোনো না কোনো ভাবে নিহিত থাকে রাজনৈতিক-তাত্ত্বিক জ্ঞানের ভাষ্যে।

রাজনৈতিক ভাবকল্প সত্য হয়ে ওঠে কেবল নির্দিষ্ট কিছু ব্যবহারিক সাফল্যে সহায়তার জন্য নয়। নীতির দিক থেকে এই ধরনের সাফল্য, 'যুক্তি-সিদ্ধি', স্বতঃপ্রমাণ দেখানো অপেক্ষাকৃত সহজ, বিশেষ করে যখন রাজনৈতিক ভাবকল্পের পেছনে থাকে রীতিসিদ্ধ-সাংগঠনিক বৈষয়িক শক্তি। যেমন, 'ঐশ্বরিক নগরের' নিকট 'পার্থিব নগরের' অধীনতা নিয়ে সেণ্ট অগাস্টিনের (আশিসধন্য) আপ্তবাক্যটির 'সত্যতা' প্রমাণের জন্য তাঁকে বিশেষ কষ্ট করতে হয় নি, পশ্চিম ইউরোপে ক্যাথলিক চার্চ তখন হয়ে উঠেছিল বৃহত্তম অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক শক্তি, সামন্ত-সমাজের প্রথম সম্প্রদায় হয়ে দাঁড়ায় যাজকেরা, মননের সমস্ত শাখায় নিরঙ্কুশ আধিপত্য করছিল ঈশ্বরতত্ত্ব। কিন্তু সত্যতার মাপকাঠি হিশেবে প্রয়োগবাদী দর্শনে বাস্তব ক্রিয়াকর্মকে দেখা হত এবং হয় ঠিক ওই দৃষ্টিতেই। এই প্রয়োগবাদীরাই বাস্তব ক্রিয়াকর্মকে দেখে নির্দিষ্ট মুহূর্তে নির্দিষ্ট বিষয়ীর পক্ষে হিতকর পৃথক পৃথক কর্ম হিশেবে। প্রয়োগবাদীর স্থূল-কারবারী দৃষ্টিতে কোনো একটা ভাবনা সত্য হয়ে ওঠে, যদি তৎক্ষণাৎ তা কোনো উপকারে আসে। প্রয়োগবাদ সত্য আর উপকারকে অভিন্ন করে তোলে। আসলে সামাজিক আদান-প্রদানে কোনো বিষয়ীর পক্ষে কার্যত হিতকর হতে পারে এমন বিচার যা সত্য থেকে বহু দূরে। ইতিহাসে এমন অনেক ঘটনা জানা আছে যেখানে ঠিক তেমন রাজনৈতিক ভাবকল্পই সামাজিকভাবে ফলপ্রদ, কার্যকর হয়েছে যা সত্যের

বিপরীত, একেবারে সমূহ মিথ্যা, বিকৃত, উদ্ভট মতামত (যেমন, ধর্ম, ফ্যাসিস্ট কল্পকথা ইত্যাদি)। দর্শনের দিক থেকে সমগ্রভাবে ধরলে বাস্তব ক্রিয়াকলাপ হল তত্ত্বের প্রধান পরীক্ষক, সে তত্ত্বের বোধ, ধারণা, পদ্ধতির সত্যতা যাচাই-এর কষ্টিপাথর। 'বাস্তব ক্রিয়াকলাপ (তাত্ত্বিক) প্রজ্ঞানের ঊর্ধ্বে, কেননা তার শুধু সর্বজনীনতাই নয়, প্রত্যক্ষ ফলপ্রদতার যোগ্যতাও আছে।'*

রাজনীতি, রাষ্ট্র, আইন বিষয়ক মতবাদ কেবল তখনই তার সত্যকার সামাজিক ভূমিকা পালন করে, যখন তা সামাজিক-রাজনৈতিক বাস্তব ক্রিয়াকলাপের ওপর দৃঢ়ভাবে দাঁড়ায়, অঙ্গাঙ্গিভাবে যুক্ত থাকে তার সঙ্গে, তার সেবা করে এবং তাকেই সে দেখে নিজের সর্বোচ্চ বিচারক বলে।

রাজনৈতিক-তাত্ত্বিক জ্ঞানের পূর্বোক্ত স্কেচে স্বভাবতই একটা বিমূর্ত সর্বজনীনতার ছাপ আছে। তা ছাড়া হতে পারে না। তার প্রধান কাজ হল যে দার্শনিক, সমাজতাত্ত্বিক, জ্ঞানতাত্ত্বিক ইত্যাদি সমস্যার ভূমির ওপর ইতিহাসে চলে রাজনৈতিক তত্ত্বের বিবর্তন, তার রূপরেখা দেয়া। যে যন্ত্রব্যবস্থা এই বিবর্তনকে চালিত করেছে ও করছে, সেটা দেখানোও তার কাজ।

উক্ত যন্ত্রব্যবস্থাগুলির (সর্বদা সবকিছু গোটাগুটি নয়, বিভিন্ন যুগে বিভিন্ন যোগাযোগে) কথা রাজনৈতিক মনীষী কিছু জানতেন কি না, তা নির্বিশেষেই সেগুলি কাজ করে গেছে। কার্যক্ষেত্রে লোকে নির্দিষ্ট একটা ব্যাপারের অস্তিত্ব আছে এমন সন্দেহমাত্র না করেও তা যে কাজে লাগায়, সামাজিক চেতনার এই বৈশিষ্ট্যটার দ্বান্দ্বিক-বস্তুবাদী ব্যাখ্যা দিয়ে গেছেন কার্ল মার্কস। যেমন, বহুকাল লোকে অচেতনভাবে ব্যাকরণ ও যুক্তিবিদ্যার নিয়মগুলি ব্যবহার করে এসেছে। কিন্তু বিজ্ঞান ও সংস্কৃতির রীতিমতো উচ্চ একটা পর্যায়েই কেবল তা নিয়ে রচিত হয়েছে শাস্ত্র, অর্থাৎ তাদের সম্পর্কে তাত্ত্বিক চেতনা এসেছে। তাই দাঁড়াচ্ছে, কিছু একটা বানানো, সৃষ্টি এবং জ্ঞানের প্রয়োগ হল এক জিনিস, আর কী নিয়মে ও নীতিতে তা ঘটছে সে সম্পর্কে ধারণা রাখা অন্য ব্যাপার। বিজ্ঞানকে জানতে হবে কী গড়ে উঠছে (বিকশিত হচ্ছে, প্রযুক্ত হচ্ছে), তেমনি কেমন করে সেটা গড়ে উঠেছে (বিকশিত হচ্ছে, প্রযুক্ত হচ্ছে), সেটাও।

বিমূর্ত-সাধারণ নির্ধারণে অবশ্যই সক্রেটিস বা কনফুশিয়াসের দৃষ্টিভঙ্গি, ম্যাকিয়াভেলি বা কাণ্টের মতবাদের বৈশিষ্ট্য, তার মূল কথাটা উদ্ঘাটিত হয় না। তাঁদের দৃষ্টিভঙ্গি ও মতবাদটি সে সময়কার শ্রেণী সংগ্রামে (বা বর্তমানের ভাবাদর্শীয় সংগ্রামেও), মানবিক সংস্কৃতির সমৃদ্ধি সাধনে কী মূর্ত-নির্দিষ্ট ভূমিকা নিয়েছিল ও নিচ্ছে, সে কথা বলা হয় না তাতে। সেটা তার কাজও নয়। এ কাজের জন্য দরকার 'বিশেষ বিষয়ের বিশেষ যুক্তিবিদ্যার' জ্ঞান। কিন্তু সেটা সম্ভব হয় না রাজনৈতিক-তাত্ত্বিক জ্ঞানের তত্ত্বে যেসব বিমূর্ত-সাধারণ নির্ধারণ ও নির্মিতি সূত্রবদ্ধ হয়েছে তার দ্বারস্থ না হয়ে।

মার্কস বলেছেন, 'অতি বিমূর্ত বর্গগুলি তাদের বিমূর্ততার কল্যাণেই যদিও সর্ব যুগের পক্ষে বলবৎ, তাহলেও সে বিমূর্তনের নির্দিষ্টতায় তা সম পরিমাণেই ঐতিহাসিক পরিস্থিতির ফল এবং পূর্ণ তাৎপর্য ধরে কেবল সেই পরিস্থিতিতে এবং তার পরিসীমার মধ্যে।* এই অধ্যায়ে রাজনৈতিক-তাত্ত্বিক জ্ঞানের প্রকৃতি, গঠন ও কাজ, তার নির্ধারক ও দৈনন্দিন চেতনার সঙ্গে পারস্পরিক সম্পর্ক বিষয়ে, তার ভাবাদর্শিতা (শ্রেণীচরিত্র, দলানুগত্য), সত্যতা, পুঞ্জীভবন ইত্যাদি গুণ সম্পর্কে, ব্যবহারিক-রাজনৈতিক ক্রিয়াকলাপের সঙ্গে রাজনৈতিক তত্ত্বের পারস্পরিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার উপায় বিষয়ে যেসব বক্তব্য সূত্রবদ্ধ হয়েছে, তাও অপরিহার্যভাবে ঐতিহাসিক পরিস্থিতির ফল। তা এসেছে সর্বাগ্রে বর্তমানে বিদ্যমান রাজনৈতিক-তাত্ত্বিক জ্ঞানের কতকগুলি দিকের পর্যবেক্ষণ থেকে।

তবে অতীত যুগের রাজনৈতিক-তাত্ত্বিক জ্ঞানে যা ছিল কেবল ইঙ্গিতের আকারে এবং এখন পূর্ণ তাৎপর্যে বিকশিত, সেগুলির সন্ধান ও বোধের জন্যও এগুলি গুরুত্বপূর্ণ। সেইসঙ্গে স্বীকার করা দরকার যে ঐতিহাসিক গবেষণার আসল ভারকেন্দ্র এখানে নেই। সেটা আছে রাজনৈতিক-তাত্ত্বিক জ্ঞানের প্রাচীন গড়নগুলির সঙ্গে তার বর্তমান অবস্থার পার্থক্যে, কেননা এই পার্থক্যটাই হল সে জ্ঞানের বিকাশ।

রাজনৈতিক ভাবকল্পের ইতিহাস থেকে শিক্ষা আহরণ করার জন্য রাজনৈতিক ভাবনার ঐতিহাসিক গবেষণাকে বচন দানের উপলক্ষ করে তোলা অনুচিত, ওতে প্রথমে অতীতের রাজনৈতিক মতবাদকে রাজনীতি, আইন,

রাষ্ট্র বিষয়ে বর্তমান ধ্যানধারণাদির পোশাক পরিয়ে বর্তমানকে অতীতে সনাক্ত করার নিষ্ফল ও বিরক্তিকর প্রয়াসই চলে। ইতিহাসের সঙ্গে দ্বৈত আলাপের বদলে কী দরকার ঐতিহাসিকের একক স্বগতোক্তির। অতীত যুগ অন্যরকম, আমাদের মতো নয় বলেই তা আমাদের যুগকে বুঝতে সাহায্য করে।

দ্বিতীয় অধ্যায়

ঐতিহাসিক গতিপথে ও বর্তমানের সঙ্গে সম্পর্কে রাজনৈতিক মতবাদ

*

বর্তমান কালের সঙ্গে রাজনৈতিক মতবাদের ইতিহাসের সম্পর্কের প্রশ্নটা আরো বৃহত্তর একটা প্রসঙ্গ — 'ইতিহাস ও বর্তমান কালের' অঙ্গাঙ্গি অংশ, তার চৌহদ্দির মধ্যেই কেবল অতীতের বিভিন্ন ধ্যান-ধারণা, ভাবকল্প, তত্ত্ব ও মতবাদের উদ্ভবের ঐতিহাসিক রূপ পরিষ্কার হতে পারে। বর্তমান কালের সঙ্গে ইতিহাসের, তথা সামাজিক-রাজনৈতিক ও রাষ্ট্রিক-আইনী মতবাদের সম্পর্কটা একটা জটিল ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার ব্যাপার, প্রচুর তার পারস্পরিক প্রভাবের দিক।

কাল সম্পর্কের নীতি অনুসারে ইতিহাস কেবল অতীত নয়, তা বর্তমান, এমনকি ভবিষ্যৎ, কালের একটা বিশেষ সংশ্লেষ, তাতে গোটা মানবিক অস্তিত্ব হল ঐতিহাসিক অস্তিত্ব। ইতিহাস তাই মানুষের সমস্ত ব্যবহারিক ও তাত্ত্বিক ক্রিয়াকলাপের রঙ্গমঞ্চ, পরিপ্রেক্ষিত ও দিগন্ত।

ইতিহাস ও ঐতিহাসিক প্রণালী সম্পর্কে কোনো মনস্বীর দৃষ্টিভঙ্গি, কালের সম্পর্ক বিষয়ে, তার বিষয়বস্তু ও চরিত্র সম্বন্ধে তাঁর যে স্বকীয় ব্যাখ্যা, অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যতের অনুবর্তনের যে ভাবনা সেটার অনেকখানি প্রভাবিত হয় তাঁর দার্শনিক-বিশ্ববীক্ষামূলক, ভাবাদর্শীয়-তাত্ত্বিক ও রাজনৈতিক-আইনী মতামত, তাঁর গোটা মতবাদের দ্বারা।

তাই রাজনৈতিক মতবাদের ক্ষেত্রে বর্তমান কালের সঙ্গে ইতিহাসের যোগাযোগ পরিষ্কার করে তুলতে হলে অন্তত সংক্ষেপেও ঐতিহাসিক পদ্ধতির নীতি, সাধারণভাবেই ঐতিহাসিক মনোভাব এবং বিশেষ করে রাজনৈতিক-আইনী চিন্তার ক্ষেত্রে তার প্রতিসরণ ও প্রতিফলনের প্রধান প্রধান সীমান্তস্তম্ভগুলির ওপর আলোকপাত করা প্রয়োজন। কেননা কেবল ঐতিহাসিক পদ্ধতির নীতিতেই বিভিন্ন মতবাদ ও ধ্যানধারণার পরিবর্তনের সাধারণ কালানুক্রমিক গ্রন্থন অর্জন করে মতবাদের ইতিহাস ও বর্ধমান তাত্ত্বিক জ্ঞানের ঐতিহাসিক সম্পর্কপাতের চরিত্র।

ঐতিহাসিকতা গড়ে ওঠা এবং অতীত থেকে বর্তমান হয়ে ভবিষ্যতের

দিকে একটা গতি, আগে যা ছিল না তেমন নতুন কিছু একটার দিকে গতি বলে ইতিহাসকে বোঝা আধুনিক কালের ব্যাপার।

কালের যাত্রা সম্পর্কে প্রাচীন ও মধ্য যুগের পক্ষে বৈশিষ্ট্যসূচক ধারণাটা ছিল যে ওটা চক্রাকার, তদনুসারে কোনো একটা কালচক্রের অভ্যন্তরে যত পরিবর্তন ঘটে তা কেবল বরাবরের জন্য নির্দিষ্ট (কল্পকথা, অনুশাসন, ধর্ম ইত্যাদি দ্বারা কঠোরভাবে পূর্বনির্ধারিত) কিছু একটার পুনরাবর্তন মাত্র। তাতে নীতিগতভাবে নতুন কিছু অগ্রাহ্য। এই ধারণাটার দেখা পাওয়া যায় প্রাচীন প্রাচ্যের অতিকথায়, পিথাগোরাস ও প্লেটোর মতবাদে, বিভিন্ন ধর্মীয়-কল্পকথামূলক ধ্যানধারণায়। এরূপ ধারণার মৌলিক দিক হল প্রাচীন উৎসের মুখাপেক্ষিতা, অতীতের কোনো একটা বিরাট, বনিয়াদী, অতীতের ঘটনাবলি নির্ধারক কিছু একটার দিকে তাকানো (ধর্মীয়-অতিকথামূলক অর্থে), পরিবর্তনের চেয়ে অপরিবর্তনীয়তার বাঞ্ছনীয়তা, অতীতের বিরাট কিছুটা থেকে সরে যাওয়াকে অধঃপতন বলে গণ্য করা, সমকালীনতাকে হেয় করা, ভবিষ্যতে অতীতের রীতিনির্দিষ্ট, আদর্শ মানগুলির পুনরাবৃত্তিতে ভরসা রাখা, স্বর্গীয়-ঐশ্বরিকের জয়গান, পার্থিব ও মানবিকে অনাস্থা।

এই ধারণার নিদর্শন হল প্লেটোর দৃষ্টিভঙ্গি, যিনি রাজনৈতিক দর্শনের স্রষ্টা। পাঁচটি মূল রাষ্ট্ররূপের চক্রাবর্তনকে প্লেটো ব্যাখ্যা করেছেন মানবিক স্বভাবের বিকৃতি এবং আদি ঐশ্বরিক বর্গগুলি থেকে বিচ্যুতির পরিণাম বলে। প্রাচীন গ্রীক ঐতিহাসিক পোলিবিয়াসের ধারণাতেও রাজনৈতিক রূপের চক্রাবর্তন এই ধরনের আত্মবদ্ধ বৃত্তাকার। প্রাচীন রাজনীতি বিদ্যার স্রষ্টা আরিস্টটল প্লেটোর তুলনায় অভিজ্ঞতিক রাজনৈতিক-আইনী সম্পর্কের বিশ্লেষণকে যুক্তিযুক্ত করার পথে অনেকখানি এগিয়েছিলেন। কিন্তু তাঁর গবেষণার অনেকগুলি ক্ষেত্রে তিনিও থেকে গেছেন প্লেটোর স্বতঃসিদ্ধ বলে ধরে নেয়া আদর্শায়িত-নৈতিক নির্মিতিগুলির প্রভাবে। শুধু প্লেটো আর আরিস্টটল নন, রোমের দার্শনিক ও রাজনৈতিক মনীষীরাও (সিসেরো, সেনেকা প্রভৃতি) এবং আইনবিদ, ঐহিক ব্যবহারশাস্ত্রের স্রষ্টারাও (উলপিয়ান, পাপিনিয়ান, কুইন্টিলিয়ান, মডেস্টিনাস, গাইয়াস, পল, ফ্লোরেন্টিনাস প্রভৃতি) তাঁদের নির্মিতিগুলিতে ঐতিহাসিক বিকাশের ভাবনা থেকে বহু দূরে। মধ্যযুগীয় মনস্বীদের ধ্যানধারণাতেও এ ভাবনাটা অনুপস্থিত।

কেবল আধুনিক কালেই জ. ভিকো (১৮ শতকের গোড়ায়) ইতিহাসের

ভিত্তিতে ও মানবিক স্বাধীনতার মধ্যস্থস্বরূপ ঘটনাবলির ভিত্তিতে যে বনিয়াদী নিয়মাদি আর বিচক্ষণতা রয়েছে, এমন প্রস্তাব করেন। ভিকোর মতে, ইতিহাসে এমন কিছু একটা আছে যা সর্বসাধারণিক, ব্যক্তিগতের ঊর্ধ্বে, আভিজ্ঞতিক ও স্বতন্ত্রের সঙ্গে যা মেলে না। ঐতিহাসিক পদ্ধতি সংরচনে বৃহৎ ভূমিকা নিয়েছেন লেইবনিৎস, মঁতেস্ক্য, হের্ডার, শ্লেগেল, কান্ট, হেগেল।

এই ধারার সঙ্গে সমান্তরালে ১৮ শতকের শেষ থেকে রক্ষণশীল ঐতিহাসিক পদ্ধতি বিকশিত করতে থাকেন এ. বার্কের, জ. দে মেস্ত্র, দে বনাল্ড এবং পরে আইনের ঐতিহাসিক স্কুলের প্রতিনিধিরা।

দার্শনিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক-আইনী মতবাদের লেখকদের পক্ষ থেকে ঐতিহাসিক পদ্ধতিগত নীতির বিভিন্ন ব্যাখ্যা এইসব মতবাদের অন্তর্বস্তুকেও প্রভাবিত করে। এই প্রসঙ্গে ঐতিহাসিকতার নীতির বিভিন্ন প্রবক্তার কতকগুলি মূল ধারণার তুলনা চিত্তাকর্ষক হবে।

আইনের ঐতিহাসিক স্কুলের ঐতিহাসিক পদ্ধতি খুবই বৈশিষ্ট্যসূচক। মঁতেস্ক্যের কতকগুলি বক্তব্য গ্রহণ করে* এই ঐতিহাসিক পদ্ধতি সমগ্রভাবে জ্ঞান প্রচারনী যুগের ধারণা, পূর্ববর্তী স্বাভাবিক-আইনী মতবাদ, ফরাসি বিপ্লব, সাধারণভাবে এবং বিশেষ করে আইনের ক্ষেত্রে বৈপ্লবিক সৃজনশীলতার বিরুদ্ধে রক্ষণশীল প্রতিক্রিয়ার প্রকাশক। এই স্কুলের ঐতিহাসিক দৃষ্টিভঙ্গি এ. বার্কের, জ. দে মেস্ত্র, দে বনাল্ডের রক্ষণশীল, বিপ্লববিরোধী, ঐতিহ্যবাহী, অতীতমুখী ঐতিহাসিক পদ্ধতির সমধর্মী।

যেমন, ব্রিটিশ পার্লামেন্ট সভ্য এডমন্ড বার্ক তাঁর 'ফ্রান্সের বিপ্লব বিষয়ে চিন্তা' গ্রন্থে (১৭৯০) ফরাসি বিপ্লবকে সমালোচনা করেছেন এই ধারণা থেকে যে রাষ্ট্র ও আইন অঙ্গাঙ্গি চরিত্রের। তাঁর মতে, রাষ্ট্রীয় জীবন নির্ধারিত হয় বিমূর্ত ছক ও চুক্তি দিয়ে নয়, ইতিহাস ও ঐতিহ্য দিয়ে। বার্কেরের মতে, বিপ্লব নিয়মসঙ্গত নয়। কার্যকরী কেবল রাষ্ট্র ও আইনের জাতীয় ও ঐতিহাসিকভাবে প্রমাণিত প্রগতি। রাজনৈতিক স্বাধীনতা পরম

কিছু নয়, একটা আপেক্ষিক ব্যাপার। প্রতিটি জাতির আছে স্বাধীনতা সম্পর্কে নিজস্ব ধারণা, সুখ সম্পর্কে নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গি। সাম্য — একটা অলীক কল্পনা। যে রাষ্ট্র আইনকে সরকারের সৃষ্টি বলে মনে করে সে তাতে করে প্রজাদের সশস্ত্র করে নিজের বিরুদ্ধেই। আইন ও সংবিধানের উচিত জাতীয় ঐতিহ্যে নিহিত থাকা, যা করেছে ইংরেজরা, সাম্য ও মুক্তির বিমূর্ত ধারণা থেকে বৈপ্লবিক-ফরাসি কায়দায় তা গড়া উচিত নয়। বিপ্লব নয়, সংস্কারই হল সঠিক পথ। নতুন রাষ্ট্রিক ও আইনী ব্যবস্থা উদ্ভাবন করার পক্ষে বুদ্ধি বড়োই অক্ষম। রাষ্ট্র ও আইনের যে জাতীয় প্রথা-প্রতিষ্ঠান ঐতিহাসিক দিক থেকে উদ্ভূত, এগুনো উচিত তাই থেকে।

গ. হুগো, ফ. সাভিনি, গ. পুখতার বিকশিত আইনের ঐতিহাসিক স্কুলের মূলকথা হল নতুন আইনপ্রণয়নের চাইতে ঐতিহাসিকভাবে বিবেচ্য আইনের অগ্রাধিকার প্রতিষ্ঠা। ঐতিহাসিক পদ্ধতির নীতি এক্ষেত্রে বুদ্ধিবিচারের নীতিকে স্থানচ্যুত করতে আহূত, তার জায়গা নেবে ইতিহাসের দিক থেকে পরিবর্তনশীল, কিন্তু প্রতিটি নির্দিষ্ট কালের নির্দিষ্ট 'জন প্রেরণা', জনগণের আইনী ধারণা ও চেতনা। আইনের ঐতিহাসিক স্কুলের তত্ত্বকারদের কাছে 'জন প্রেরণা' হল ইতিহাসের দিক থেকে পরিবর্তনশীল, আবার ইতিহাসের দিক থেকেই ন্যায়সঙ্গত আইনগঠনী করণিকা।

'আইনের ঐতিহাসিক স্কুলের দার্শনিক ঘোষণাপত্র' প্রবন্ধে মার্কস দেখিয়েছেন যে হুগোর পদ্ধতি ও নীতি হল দৃষ্টবাদী তথ্যকেই প্রামাণিক বলে মানা এবং তার ভিত্তিতে বুদ্ধিবিচারের দৃষ্টিকোণকে নাকচ করা।*

সর্ববিধ আইনের ঐতিহাসিক সাময়িকতার ধারণায় সূচিত হয় সর্ববিধ আইনী অভিনবত্বে এবং তাদের পেছনকার ধ্যানধারণায় অনাস্থা: আইনের এরূপ ঐতিহাসিকতা নবপ্রবর্তনের প্রতিবন্ধক।

আইনের ঐতিহাসিক স্কুলের প্রতিনিধিরা এই কথায় জোর দেন যে প্রতিটি আইনের নিজস্ব কাল আছে, খুশিমতো তাকে বাতিল করা বা নতুন কোনো নিয়মকে তার স্থলাভিষিক্ত করা অনুচিত। আইন তার স্বচালিত, আইনপ্রণেতার ক্রিয়াকলাপ থেকে স্বাধীন এক জীবন যাপন করে। এইভাবেই দানা বাঁধে সাধারণ আইন যাতে প্রতিফলিত হয় কার্যক্ষেত্রে গড়ে ওঠা অবস্থা। আইনের মৌল ও একমাত্র উৎস বিধি নয়। আইন পরিবর্তিত ও বিকশিত হয় জনজীবনের সঙ্গে সঙ্গে, জাতির সংস্কৃতির সে ভাগিদার, তার

পরিবর্তনশীল চাহিদার সঙ্গে নিজেকে খাপ খাইয়ে নেয়। সেই অনুসারে আইনের ঐতিহাসিকতায় সূচিত হয় প্রথমত, জনজীবনের সঙ্গে তার আঙ্গিক সম্পর্ক, দ্বিতীয়ত, খোদ আইনেরই বিকাশের আঙ্গিক চরিত্র, তার বিকাশের বিভিন্ন ধাপের মধ্যে সম্পর্কের আঙ্গিকতা।

আইনের বিকাশ জনগণের স্বভাব, রীতিনীতি, ভাষার বিকাশের অনুরূপ। আইন দেখা দেয়, বাড়ে এবং বিলুপ্ত হয়ে যায় নির্দিষ্ট জনগোষ্ঠীটির সঙ্গে সঙ্গে। ১৮১৪ সালে যখন আইনজ্ঞ টিবো জার্মান নাগরিক আইনকে কোডবদ্ধ করার প্রস্তাব দেন, সাভিনি তখন তাঁর 'আইনপ্রণয়ন ও আইনজ্ঞানের নিকট আমাদের কালের আবেদন প্রসঙ্গে' পুস্তিকায় তার বিরোধিতা করেন এই যুক্তিতে যে তা কালোপযোগী নয়। তিনি বলেন যে জনগণের চরিত্র ও প্রাণ, সত্তা ও তার অবস্থার দাবি মেটায় যে আইন তা আগে গড়ে ওঠে জনগণের স্বভাব ও বিশ্বাস থেকে, কেবল পরেই তাকে গড়ে ব্যবহারশাস্ত্র, আইনপ্রণেতার খুশি নয়, তা জনজীবনে অলক্ষ্যে ক্রিয়াশীল আভ্যন্তরিক শক্তি। অবশ্য আইনকে কোডবদ্ধ করার নীতিটাকে তিনি অস্বীকার করেন নি, ১৮৪২-১৮৪৮ সালে তিনি এমনকি আইনের পুনর্বিচার বিষয়ক মন্ত্রকের প্রধানই ছিলেন।

যৌক্তিক ও ঐতিহাসিকের মধ্যে সম্পর্ককে ভিত্তি করে ঐতিহাসিকতার ভিন্নতর একটা ধারণা বিকশিত করেন হেগেল। 'আইনের দর্শন' গ্রন্থে তিনি বলেন হুগোর ঐতিহাসিকতায় বুদ্ধিশক্তির দিকটা নেই। হেগেল বলেন, শিক্ষিত জাতির ক্ষেত্রে আইন হওয়া উচিত যুক্তির দিক থেকে সিদ্ধ, চিন্তার দ্বারা প্রজ্ঞাত, এবং আভ্যন্তরিক সঙ্গতিবিশিষ্ট, নির্দিষ্ট একটা তন্ত্র রূপে সংরচিত।

হেগেলের মতে, আইন ও রাষ্ট্রের দার্শনিক গবেষণা হল তাদের আভ্যন্তরিক যুক্তি আবিষ্কার, নেহাৎ সে আভিজ্ঞতিক ও ঐতিহাসিক ভাবে তার আপতিক রূপের আত্মপ্রকাশ নয়। রাষ্ট্র ও আইনের ঐতিহাসিক বিকাশের কোনো একটা অবস্থাচক্র সরাসরি তার মর্মবস্তুর সঙ্গে সম্পর্কিত নয়। ইতিহাস ও ঐতিহাসিক মালমশলাকে হেগেল উপেক্ষা করেন নি। কিন্তু ঐতিহাসিক দিকটা নিজেই দার্শনিক-যৌক্তিক দিক না হওয়ায়, হেগেলের মতে তা দার্শনিক তাৎপর্য লাভ করে কেবল তখন যখন তা উদ্ঘাটিত হয় দার্শনিক বোধের বিকাশের দিক হিশেবে। রাষ্ট্র ও আইনের ইতিহাসের আভিজ্ঞতিক মালমশলার দার্শনিক প্রসেসিঙেই কেবল সম্ভব হয় রাষ্ট্র ও আইনের আভ্যন্তরিক যৌক্তিকতা উদ্ঘাটন।

'আইনের দর্শন' গ্রন্থে হেগেল মানবিক ধারণা, সম্পর্ক ও প্রথা-প্রতিষ্ঠানে মুক্তির অবজেকটিভ সত্তালাভের রূপ অনুধাবন করেছেন যৌক্তিক ও ঐতিহাসিক, হৈতুকতা ও ঐতিহাসিক পদ্ধতির দ্বান্দ্বিক ঐক্য থেকে এগিয়ে। এই অবস্থান থেকে, হেগেলের মতে, স্বাভাবিক-বিধির পূর্ববর্তী মতধারীদের দৃষ্টিভঙ্গি ঐতিহাসিক নির্দিষ্টতা বর্জিত, এ দৃষ্টিভঙ্গি বিমূর্ত ও ইউটোপীয়। তাঁর বিচারে, আইনের ঐতিহাসিক স্কুলের হৈতুকতাবিরোধী, যুক্তিবিরোধী ঐতিহাসিক পদ্ধতিও সুসিদ্ধ নয়। হেগেলের মতবাদে যৌক্তিকতাকে করা হয়েছে ঐতিহাসিক, ঐতিহাসিক পদ্ধতিকে যৌক্তিক। অবজেকটিভ আত্মার ক্ষেত্রে, সমাজ, রাষ্ট্র, আইন ও রাজনীতি সংক্রান্ত ঘটনার ক্ষেত্রে যুক্তি ও ইতিহাসের যথোচিত প্রকাশ হতে পারে কেবল আইনের দার্শনিক বোধের দ্বান্দ্বিকতার উদ্ঘাটন।

সমগ্রভাবে দর্শনে এবং বিশেষত রাষ্ট্র ও আইন বিষয়ক দার্শনিক মতবাদে হেগেল যে মূল ধারণাটিকে সিদ্ধ করতে চেয়েছেন, সেটা হল প্রজ্ঞানে ও বিকাশে অবজেকটিভ লক্ষ্যের স্বীকৃতি, ইতিহাসে যুক্তির স্বীকৃতি।* আত্মা হল চেতনা আর বিশ্ব ইতিহাস হল চেতনায় মুক্তির অগ্রগতি, সে অগ্রগতি যেমন অবজেকটিভ সত্যের প্রজ্ঞানের অর্থে (দার্শনিক ও রাজনৈতিক-আইনী মতবাদের ইতিহাসে জ্ঞানের চর্চা ও গভীরতাসাধন), তেমনি রাষ্ট্রিক-আইনী রূপে মুক্তির অর্জিত মাত্রার বাহ্যিক অবজেকটিভ সত্তালাভের অর্থেও। সত্য যেমন দার্শনিক প্রজ্ঞানের মূল লক্ষ্য ও বিষয়বস্তু (রাষ্ট্রিক-আইনী ঘটনাও তার অন্তর্গত), তেমনি, হেগেলের মতে, রাষ্ট্র হল সেই রকম একটা লক্ষ্য ও বিষয়বস্তু, রাজনৈতিক ইতিহাসের বাকি সমস্ত ঘটনা যার অধীনস্থ। এতে করে বিশ্ব ইতিহাস হয়ে দাঁড়ায় রাষ্ট্রের রূপলাভে অগ্রগতি।** যৌক্তিক ও ঐতিহাসিকের মধ্যে সম্পর্কের হেগেলীয় ব্যাখ্যায় দাঁড়ায় যে রাজনৈতিক-আইনী মতবাদের ইতিহাসে যেসব বিভিন্ন ধারণা দেখা দিয়েছে, সেগুলি হল যুক্তির প্রজ্ঞান এবং ইতিহাসে চৈতন্যের অগ্রগতির দ্বান্দ্বিক প্রক্রিয়ার বিভিন্ন দিক ও ধাপ, রাষ্ট্রের রূপলাভে অগ্রগতির দার্শনিক-তাত্ত্বিক ততুল্যমূল্য। হেগেলের মতে, যেহেতু মুক্তির ধারণার পূর্ণ রূপায়ণ ঘটে বর্তমান কালে সংবিধান দ্বারা সুনির্দিষ্ট, বিকশিত রাষ্ট্রে আর দ্বান্দ্বিক, বৈজ্ঞানিক-দার্শনিক অবস্থান থেকে এই অবস্থাচক্রের চেতনা ও

তার প্রতিপাদন যেহেতু তাঁর মতবাদের কৃতিত্ব বলে হেগেল মনে করেন, তাই পূর্ববর্তী দার্শনিক ও রাজনৈতিক-আইনী ধারণাগুলি তাঁর কাছে ঐতিহাসিকভাবে শর্তবদ্ধ এবং সীমাবদ্ধ বিমূর্ত কতকগুলি দিক, যা তিনি তাঁর যৌক্তিকভাবে বিকশিত, আত্মিক প্রগতির শীর্ষে অধিষ্ঠিত, সুসম্পূর্ণ দার্শনিক তন্ত্রে দ্বান্দ্বিকভাবে 'অপসৃত'* করেছেন।

হেগেলীয় দৃষ্টিভঙ্গির অতিকথনে ক্ষান্তি দিয়ে এখানে শুধু বলা যাক যে ভাববাদের ভিত্তিতে হেগেল এইভাবে সূত্রবদ্ধ করেছেন দার্শনিক ও রাজনৈতিক-আইনী চিন্তার ইতিহাসে বিভিন্ন ধারণার মূল্যায়নের অবজেকটিভ দিক থেকে বৈজ্ঞানিক, ঐতিহাসিক ও যৌক্তিকভাবে সুসিদ্ধ নিরিখ, এ ধারণাগুলি তাঁর কাছে তদনুরূপ ঐতিহাসিক বাস্তবতার এমন তাত্ত্বিক প্রতিফলন, মানবিক প্রজ্ঞানের সামগ্রিক অগ্রগতিমূলক বিকাশে যার যৌক্তিক-জ্ঞানতাত্ত্বিক স্থান ও সুসিদ্ধি আছে।**

হেগেলের দ্বান্দ্বিক ঐতিহাসিক পদ্ধতির অবস্থান থেকে রাষ্ট্র ও আইন বিষয়ক মতবাদের পূর্ববর্তী ইতিহাস বিভ্রান্তির একটা প্রদর্শনী নয়, সত্যের একটা মন্দির যার নির্মাণে অংশ নিয়েছে অতীতের ধ্যান-ধারণা।

হেগেলের দ্বান্দ্বিক অভিগমনকে মার্কস ও এঙ্গেলস ঐতিহাসিক-বস্তুবাদী ভিত্তিতে ঢেলে সাজেন এবং আরো বিকশিত করেন। হেগেলীয় চেতনার যৌক্তিক-দ্বান্দ্বিক প্রেরণা বজায় রেখে (যৌক্তিক ও ঐতিহাসিকের সম্পর্ক ঐতিহাসিক বিকাশ ও আত্মিক অগ্রগতির অবজেকটিভ নিয়মবদ্ধতার অস্তিত্ব, ঐতিহাসিক-দ্বান্দ্বিক প্রক্রিয়া হিশেবে প্রজ্ঞান ইত্যাদি) মার্কসবাদের প্রতিষ্ঠাতারা সেইসঙ্গে হেগেলের দৃষ্টিভঙ্গির ভাববাদী বনিয়াদের সমালোচনা করেন এবং সংরচন করেন বৈষয়িক উৎপাদনের উপায় এবং উৎপাদনী সম্পর্কগুলির সমষ্টির নির্ধারক ভূমিকা বিষয়ে বস্তুবাদী মতবাদ, এই শেষ দুটি জিনিসেই রাষ্ট্রিক-আইনী ঘটনাগুলি ও রাজনৈতিক-আইনী মতবাদ সমেত উপরিকাঠামোর সমস্ত ব্যাপারটা নির্ধারিত।

হেগেলীয় মতবাদ সম্পর্কে ফয়েরবাখের দৃষ্টিভঙ্গির অপ্রতুলতা এবং মূলত অদার্শনিক চরিত্রের উল্লেখ করে এঙ্গেলস বলেছেন যে হেগেলীয়

দর্শনকে স্রেফ উপেক্ষা করা চলত না, 'তার নিজস্ব অর্থে দাঁড়িয়েই তাকে 'ধ্বলিসাৎ' করতে হত, অর্থাৎ সমালোচনা দ্বারা তার আধারকে চূর্ণ করে অর্জিত নতুন আধেয়কে রক্ষা করা উচিত ছিল'*।

দ্বান্দ্বিক ঐতিহাসিক পদ্ধতিকে বস্তুবাদী অবস্থান থেকে প্রয়োগ করে মার্কস, এঙ্গেলস ও লেনিন ক্রমাগত দর্শন ও রাজনৈতিক-আইনী চিন্তার ইতিহাসের দিকে দৃষ্টিপাত করেছেন এবং অতীতের মহামনীষীদের কৃতিত্বের উল্লেখ করেছেন, সেইসঙ্গে তাঁদের মতবাদের ঐতিহাসিক ও শ্রেণীগত সীমাবদ্ধতার জোর দিয়েছেন। অতীতের সাংস্কৃতিক উত্তরাধিকারের মূল্যায়নে, তথা রাজনৈতিক-আইনী চিন্তার ক্ষেত্রেও নাস্তিবাদ ও আত্মমুখিতা বর্জন করে মার্কস, এঙ্গেলস ও লেনিন কোনো একটা মতবাদ এবং চিন্তার ইতিহাসে তার রচয়িতাদের অবদানের অবজেকটিভ, মূর্ত-নির্দিষ্ট ঐতিহাসিক মূল্যায়নের ওপর জোর দিয়েছেন একাধিক বার। লেনিন লিখেছেন: 'আধুনিক চাহিদার দিক থেকে ঐতিহাসিক নায়কেরা কী **দেন নি**, তা দিয়ে নয়, পূর্ববর্তীদের তুলনায় **নতুন** কী **দিলেন**, তাই দিয়েই ঐতিহাসিক কীর্তি বিবেচ্য'**। এক-একটা ধ্যানধারণা ও মতবাদের রক্ষণশীল, প্রতিক্রিয়াশীল দিকের সমালোচনায় সীমাবদ্ধ না থেকে, মার্কস, এঙ্গেলস ও লেনিন তাদের প্রগতিশীল দিকটাও, তত্ত্ব ও প্রজ্ঞানের দিক থেকে যা মূল্যবান তাও আলাদা করে তুলে ধরেছেন। এই প্রসঙ্গে লেনিনের এই বক্তব্য প্রযোজ্য যে আঠারো শতকের জ্ঞানদাতাদের পর সমাজবিদ্যাকে 'উনিশ শতকের ঐতিহাসিক ও দার্শনিকেরা তাঁদের প্রতিক্রিয়াশীল দৃষ্টিভঙ্গি সত্ত্বেও এগিয়ে দিয়েছেন, শ্রেণী সংগ্রামের প্রশ্নকে আরো গভীরভাবে ব্যাখ্যা করেছেন, দ্বান্দ্বিক পদ্ধতিকে বিকশিত করেছেন, সামাজিক জীবনের ক্ষেত্রে তাকে প্রয়োগ করেছেন বা করতে শুরু করেছেন'***। অতীতের ধ্যানধারণাগুলির প্রতি সামাজিক-রাজনৈতিক ও তাত্ত্বিক দিক মিলিয়ে এগুলেই কেবল তাদের চরিত্র এবং মানবিক প্রজ্ঞানের ইতিহাসে তাদের স্থান সম্পর্কে সঠিক ধারণালাভ সম্ভব হয়। বলা বাহুল্য, ভাবাদর্শীয় সংগ্রামের প্রেক্ষিতে এক-একটা দার্শনিক ও রাজনৈতিক-আইনী ধ্যানধারণার প্রবণতা থাকে কিছু একটা প্রমাণ করার, কিছু খণ্ডন করার, একটা ধারার পক্ষে অনুগামী সংগ্রহের,

অন্য ধারাটাকে হেয় করার। কিন্তু এতে করে অতীত ও বর্তমানের রাজনৈতিক-আইনী মতবাদের প্রজ্ঞানমূলক ভূমিকা উদ্ঘাটনের প্রশ্ন নাকচ হয় না, তাদের সামাজিক-রাজনৈতিক চরিত্র বিশ্লেষণের প্রয়োজনীয়তা বাতিল হয় না।

*

রাজনৈতিক-আইনী মতবাদের ক্ষেত্রে ঐতিহাসিক পদ্ধতির অস্থিরতা ও ভাগ্যচক্র অনুধাবনকালে ঐতিহাসিক পদ্ধতির বিরুদ্ধে সেইসব আক্রমণ স্মরণীয় যা চমৎকার প্রকাশ পেয়েছে ফ. নিট্‌শের রচনায়, যিনি নতুন আভিজাত্য ও নতুন দাসপ্রথার কথা বলেছেন, জনগণ, গণতন্ত্র, সমাজতন্ত্রের যিনি প্রকাশ্য শত্রু। ইতিহাসকে যুক্তিযুক্ত, নিয়মানুগ, প্রগতিশীল একটা বিকাশ বলে দেখাকে তীব্র আক্রমণ করেছেন নিট্‌শে।* প্রাচীন অভিজাততন্ত্র পতনের পর প্রায় গোটা ইতিহাসকে (ভাবধারা, ঘটনা, প্রথা-প্রতিষ্ঠান) তিনি দাসোচিত নৈতিকতা, অবক্ষয়, সমুচ্চ আভিজাতিক সংস্কৃতির অধঃপতনের কাল বলে চিহ্নিত করেছেন। তাঁর মতে, তাঁর সমকালীন ঐতিহাসিক চেতনাও এইসব ব্যাধিতে ভুগছে, যাতে বর্তমান ও আগামীর ওপর ইতিহাসের প্রভুত্ব প্রতিফলিত হচ্ছে (তার 'দাসোচিত', অনভিজাত ব্যাখ্যা ও প্রেক্ষিতে)। আইনসঙ্গত ও প্রগতিশীল পথে বিকাশমান ইতিহাসের ধারণার বিরুদ্ধে তিনি দাঁড় করান তার খুশিমতো ব্যাখ্যা এবং এককালে যা ছিল তার 'চিরকালীন প্রত্যাবর্তনের' অতিকথা**। এতে করে তাঁর সময়ে যৌক্তিক ও প্রগতিশীল ঐতিহাসিক পদ্ধতির যে নীতি দেখা দিয়েছিল তার বিপরীতে তিনি গতির আবর্তনমূলক-বৃত্তাকার চরিত্র নিয়ে মান্ধাতা আমলের অতিকথামূলক ধারণার পুনর্জন্ম দেবার চেষ্টা করেছেন। 'চিরকালীন প্রত্যাবর্তন' ও নতুন অভিজাততন্ত্রের আদর্শ প্রতিষ্ঠার পরিপ্রেক্ষিতে ('প্রেক্ষিততন্ত্রের' নিট্‌শে নীতি) তিনি দার্শনিক, নৈতিক ও রাজনৈতিক-আইনী চিন্তার গোটা ইতিহাসটাকে ব্যাখ্যা করেছেন।

ক্রোচের মতবাদে ঐতিহাসিক পদ্ধতির নীতির একটা স্বকীয় ধরনের অযৌক্তিক রূপান্তর ঘটে। দর্শনকে ইতিহাসের যুক্তি ধারা হিশেবে গণ্য করে তিনি নিজের 'আত্মিক দর্শনকে' বলেছেন 'পরম ঐতিহাসিকতা'।

'পরম ঐতিহাসিকতার' যাত্রাবিন্দু হল ইতিহাসের আইন এবং সামাজিক বিকাশের নিয়মবদ্ধতার অস্বীকৃতি, কেননা আত্মা একান্ত স্বাধীন, পথ তার দুজ্ঞেয়। এই আলোকে ক্রোচের মতে, ইতালির ইতিহাসে ফ্যাসিজম একটা সাময়িক ব্যাপার, একদল বর্বর, দুষ্প্রয়াসী তা দেশের ওপর চাপিয়ে দিয়েছে।

ইতিহাস ও মুক্তির মধ্যে সম্পর্ক বিষয়ে হেগেলীয় ধারণার প্রভাবে ক্রোচে মনে করেছেন যে মুক্তিই হল ইতিহাস ও জীবনযাত্রার সর্বোচ্চ নিয়ম। কিন্তু হেগেলের ক্ষেত্রে ব্যাপারটা ছিল প্রজ্ঞানের ঐতিহাসিক গতিপথে মুক্তির অবজেকটিভ আকার লাভের যুক্তিযুক্ত রূপ নিয়ে, তবে ক্রোচে জোর দিয়েছেন মুক্তির নীতিগতভাবে অনির্ধারণীয় ও অশর্তবদ্ধ (পরিস্থিতিঘটিত) চরিত্রে। এই অবস্থান থেকে ক্রোচে বলেন যে কেবল আনুষ্ঠানিক, ব্যবহারশাস্ত্রীয় মুক্তিই সম্ভব, কার্যক্ষেত্রে মুক্তির ধারণাকে, তিনি নাকচ করে দেন এবং উদারনৈতিক-আভিজাতিক 'শাসক সংখ্যালঘুর' (তথাকথিত 'রাজনৈতিক শ্রেণীর') আবশ্যিকতা প্রতিপন্ন করেন।

ক্রোচের 'পরম ঐতিহাসিকতার' পক্ষে খুবই বৈশিষ্ট্যসূচক যে তাঁর ভাষ্যে 'প্রগতি' হল পরবর্তীতে পূর্ববর্তীর একটা খুশিমতো বর্ণনার অন্তর্ভুক্তি। 'ইতিহাসের যুক্তির' এই ব্যাখ্যার সঙ্গে জড়িত ভাবকল্পের ইতিহাস প্রসঙ্গে ক্রোচের খানিকটা পাঁচমিশেলিপনা। এই প্রসঙ্গে 'হেগেলের দর্শনে জীবন্ত ও মৃত' (১৯০৭) গ্রন্থে তাঁর নিম্নোক্ত উক্তি লক্ষণীয়: 'আমি হেগেলপন্থী এবং মনে করি তাই হওয়া উচিত; কিন্তু সেই অর্থে হেগেলপন্থী যে অর্থে আমাদের কালে দার্শনিক চিত্ত ও দার্শনিক শিক্ষা সম্পন্ন প্রতিটি ব্যক্তিই একই সময়ে নিজেকে অনুভব ও ব্যক্ত করে এলিয়াট*, হেরাক্লিটাস, সক্রেটিস, প্লেটো, সংশয়বাদ, নয়াপ্লেটোবাদ, খ্রিস্ট, বুদ্ধ, কার্তেয়িজ**, স্পিনোজা, লেইবনিৎস, ভিকো, কাণ্ট ইত্যাদির পন্থী বলে।'***

সাধারণভাবে ইতিহাস এবং বিশেষ করে রাজনৈতিক-আইনী ভাবধারার

ইতিহাস সম্পর্কে বিশ শতকের (বিশেষ করে দ্বিতীয় বিশ্ব যুদ্ধের পরেকার) পশ্চিমী বুর্জোয়া লেখকদের মনোভাবের সাধারণ চরিত্রলক্ষণ হল ঐতিহাসিক নিয়মানুগতা, যৌক্তিকতা ও প্রগতি সম্পর্কে নাস্তিক্য। যেমন, বলা হচ্ছে যে অতীতের 'পরম চরিত্রের ভাবাদর্শগুলি' নাকি বহুধর্মী বিশশতকী চেতনার উপযোগী নয়, নিধার্রণবাদে এ চেতনা আশা হারিয়েছে, নাস্তিক্য ও নগদ-বিদায়ে তা চিহ্নিত।*

বেশ কিছু বুর্জোয়া লেখক 'পশ্চিমী সভ্যতার' সংকটের (সংস্কৃতি, রাজনীতি, প্রত্যয়ের সংকটের) মূলগত কারণ দেখেন 'পরিবেশ পরিবর্তন ও ইতিহাসকে চালনার প্রয়াসের মধ্যে।**

'ভাবাদর্শের' এবং ঐতিহাসিক প্রগতি বিষয়ে পূর্বতন ধারণার (বিশেষত, রাজনৈতিক-আইনী ভাবধারা ও প্রথা-প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে) সংকটের থিসিস গ্রহণ করেছে এমন কিছু সাম্প্রতিক বুর্জোয়া ধারণায় ভরসা রাখা হচ্ছে 'টেকনোক্রাটিক' প্রগতিতে, রাজনীতির পরিবর্তে টেকনিকে।***

সরাসরি রাজনৈতিক ভাবধারার ইতিহাস অবলম্বন করেছেন এমন কিছু আধুনিক বুর্জোয়া লেখকের সমগ্রভাবে বৈশিষ্ট্য হল পূর্বতন ঐতিহাসিক পদ্ধতির মূল্যবোধগুলির বিপরীতে নতুন নৈতিক ও ভাবাদর্শীয় মূল্যবোধকে দাঁড় করাবার প্রয়াস, অতীত মতবাদগুলির 'নতুন পাঠ' ও পুনর্ভাষ্যের সাহায্যে তাঁদের অবস্থান এবং মূল্যবোধ ও দৃষ্টিভঙ্গিতে আধুনিক কর্মসূচিকে সপ্রমাণ করার প্রবণতা। খুবই লক্ষণীয় যে এরূপ মনোভাব কেবল সেইসব লেখকেরই বৈশিষ্ট্য নয়, যাঁরা রাজনৈতিক-আইনী ভাবধারার ক্ষেত্রে দিশারী হিশেবে মূল্যবোধের নীতি মানেন, কিন্তু যেসব গবেষক (প্রধানত দৃষ্টবাদী ধারার) তাঁরাও সে নীতি খোলাখুলি অস্বীকার করেন তাদেরও।

রাজনৈতিক চিন্তার ইতিহাস অধ্যয়নে মূল্যবোধ নীতির পক্ষপাতী ইংরেজ রাজনীতিবিদ ড. হিটার মানুষের আচরণের ভাবধারা ও প্রেরণার ইতিহাসকে বস্তুবাদীভাবে ব্যাখ্যার সম্ভাবনাকে অস্বীকার করে রাজনৈতিক

দর্শনের কর্তব্য দেখেন রাজনীতির জন্য 'নৈতিক মূল্যবোধ' সৃজনে।*

'অর্থনৈতিক পরাক্রম', 'বৈষয়িক শক্তি' ইত্যাদির বিরুদ্ধে আমেরিকান রাজনীতিবিদ ড. স্পিটস নির্ধারক ভূমিকা দেন 'ভাবমূলক করণিকায়'।** মতামতের স্বাধীন সংঘর্ষের পক্ষ নিয়ে যেসব মতবাদ 'সঠিক' নীতির (হেগেলের পরম ভাব ধরনের), 'সঠিক' ব্যক্তির (ফুয়েরারবাদ, নেতাভক্তি) অথবা 'সঠিক' শ্রেণীর (প্রলেতারিয়েতের ঐতিহাসিক ব্রত বিষয়ে মার্কসীয় ধ্যানধারণার প্রতি স্পিটসের ইঙ্গিত) আধিপত্য ঘোষণা করে সেগুলিকে তিনি 'কর্তৃত্ববাদী' বলে নস্যাৎ করেছেন।

রাজনৈতিক ধারণার ইতিহাস বিষয়ে তাঁর গ্রন্থে বুর্জোয়া ঐতিহাসিক ভ. টাইমার ভাবকল্প ও মূল্যবোধের স্বায়ত্তাধিকারকে তাঁর রচনার মৌলিক নীতি বলে বর্ণনা করেছেন। সোজাসুজি তিনি স্বীকার করেছেন যে মূল্যবোধ থেকে মুক্ত রাজনীতিবিদ্যা সম্ভব নয়।'*** ইয়া. বুর্কহার্ড (পশ্চিমী ঐতিহাসিক) অনুসরণে অন্য কালের দিকে দৃষ্টিপাত করার সময় একটা শতককে যা আকর্ষণ করে তাই 'ইতিহাস' এই ব্যাখ্যা দিয়ে টাইমার লিখেছেন: 'রাজনৈতিক ভাবধারার ইতিহাস হল তাই যা অতীতের চিন্তায় আমাদের কালকে আকৃষ্ট করছে। সুতরাং, এই বইখানি হল সাম্প্রতিক দৃষ্টিকোণ থেকে রাজনৈতিক ভাবধারার ইতিহাস।**** তাঁর মতে, যেকোনো রাজনৈতিক দর্শনের মধ্যে থাকে (প্রকট বা প্রচ্ছন্ন) নৃবিদ্যা, মানুষের প্রকৃতি বিষয়ে ধারণা, যাতে প্রকাশ পায় নির্দিষ্ট মতবাদের রচয়িতার মূল্যবোধমূলক দিশা।

উদারনৈতিক বুর্জোয়া 'সাম্প্রতিকতার' অবস্থান থেকে রাজনৈতিক মতবাদের ওপর আলোকপাত করতে গিয়ে টাইমার স্পষ্টতই বিবেচ্য মতবাদটির মূর্ত-নির্দিষ্ট ঐতিহাসিক দিক, তার সামাজিক-ঐতিহাসিক শর্তবদ্ধতা ও তাত্ত্বিক-প্রজ্ঞানমূলক তাৎপর্য উপেক্ষা করেছেন।

অতীতের ধ্যানধারণার উদ্দেশ্যপূর্ণ আধুনিকীকরণ দেখা যাবে প্রখ্যাত

ইংরেজ দার্শনিক বার্ট্রাণ্ড রাসেলের মূল্যায়নেও। দৃষ্টান্তস্বরূপ, প্রাচীন মনস্বীর 'অনুদারনৈতিক উপদেশ' প্রসঙ্গে ইনি মন্তব্য করেছেন: 'প্লেটোকে বুঝতে আমি ইচ্ছুক, কিন্তু তিনি সর্বগ্রাসিতার আধুনিক ব্রিটিশ বা আমেরিকান উকিল হলে যেমন অশ্রদ্ধার সঙ্গে কথা কইতাম, তেমনি ভাবেই কথা কইব।'*

মার্কিন রাজনীতিবিদ ক. ফ্রিডরিখের ধারণায়, দ্বান্দ্বিক ঐতিহাসিক পদ্ধতির নীতিকে (তার হেগেলীয় অথবা মার্কসীয়, যে ভাষ্যেই হোক) ভাবাদর্শের ক্ষেত্রে টেনে আনলে তা হয়ে দাঁড়ায় ইতিহাসের নামে বলপ্রয়োগ প্রশস্তির ভিত্তি।**

উদারনৈতিক ও দৃষ্টবাদী ভাবাদর্শীয়-তাত্ত্বিক অবস্থান থেকে রাজনৈতিক-আইনী মতবাদের ক্ষেত্রে 'ঐতিহাসিকতাকে' তীব্র আক্রমণ করেছেন ইংরেজ দার্শনিক ও রাজনীতিবিদ ক. পপার। তাঁর মতে, হেগেল ও তাঁর অনুগামীদের ঐতিহাসিক পদ্ধতি 'সর্বগ্রাসিতার' সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত। পপার মনে করেন, সর্বগ্রাসিতা অভিমুখী 'বর্তমান ঐতিহাসিকতার' উৎস হেগেল, আর তাঁর পূর্বসূরী হলেন হেরাক্লিটাস, প্লেটো, আরিস্টটল।*** 'ঐতিহাসিকতার' এই সমস্ত পূর্ববর্তী ও পরবর্তীদের তিনি ঘোষণা করেছেন 'মুক্ত' (অর্থাৎ বুর্জোয়া-উদারনৈতিক, 'স্বাধীন') সমাজের শত্রু, রাজনৈতিক ভাবধারার ইতিহাসে কর্তৃত্ববাদী ও সর্বগ্রাসী লাইনের স্রষ্টা ও পক্ষপাতী বলে।

অতীতের রাজনৈতিক-আইনী মতবাদ প্রসঙ্গে দৃষ্টবাদী মনোভঙ্গি বিস্তারিতভাবে প্রকাশ পেয়েছে পশ্চিম জার্মানির রাজনীতিবিদ ও দৃষ্টবাদী দার্শনিক এ. টোপিচের রচনায়। 'বিশ্ববীক্ষা' ও 'ভাবাদর্শকে' অবৈজ্ঞানিক বলে সমালোচনা করতে গিয়ে তিনি ম. ভেবের, হ. কেলজেন, এ. দ্যুর্কগেইম, ভ. পারেতো প্রভৃতির অনেক যুক্তি ব্যবহার করেছেন।****

পিথাগোরাস, প্লেটো, আরিস্টটল, স্টোইক, নয়াপ্লেটোপন্থী, প্রাচীন কাল এবং আধুনিক কালের স্বাভাবিক-আইনী ধারণার অনুগামীদের, স্মিথ, ভল্টেয়ার, কনডোর্সে, সাঁ-সিমোঁ, কোঁতে, হেগেল, তাঁর অনুগামীদের এবং রাজনৈতিক-আইনী ব্যাপারের আরো বহু লেখকের দৃষ্টিভঙ্গিকে টোপিচ বলেছেন ঊর্ধ্বলৌকিক ও ইহলৌকিক ব্যবস্থা সম্পর্কে প্রাচীন প্রাচ্যের (মিশর, চীন, মেসোপটেমিয়া, ভারত) অতিকথামূলক ধারণার (কোনো না কোনো মাত্রায় তার যুক্তিসিদ্ধি সহ) অনুবর্তন। অতিকথামূলক 'রাজনৈতিক মহাকাশবিদ্যার' ধ্যানধারণা ও সিদ্ধান্ত যা সুপ্রাচীন দৃষ্টিভঙ্গি অনুসারে পার্থিব ব্যবস্থাকেও নির্ধারিত করছে, টোপিচ মনে করেন তাই রয়েছে প্রাচীন, মধ্যযুগীয় ও সাম্প্রতিক কালের প্রধান প্রধান ধারণার মূলে। টোপিচের মতে, এইসব ঐতিহ্যাগত, ভাবাদর্শীয়-বিশ্ববীক্ষামূলক মতবাদ বাস্তব ঘটনার গবেষণার স্থানে আনে বাস্তবতার কোনো একটা উৎকল্পিত ধারণা, ছকবাঁধা মূল্যবোধ আর চিন্তার মডেল। কেবল হিউম ও কাণ্টের পর থেকে, তাঁদের বিভিন্ন 'প্রজ্ঞান' ও 'মূল্যায়ন' থেকে সম্ভব হচ্ছে প্রজ্ঞানের মূল্যবোধাত্মক বিচার থেকে মুক্ত পথে রাজনৈতিক-আইনী সমস্যাদির প্রতি একটা বৈজ্ঞানিক মনোভাব।* ইতিহাসকে কী-একটা 'পবিত্র পরিকল্পনার' পরিবিকাশ হিশেবে দেখে ও ব্যাখ্যা করে স্বাভাবিক-আইনী, এই চিরাচরিত ধারণার খাতে টোপিচ মার্কসের মতবাদকেও ফেলেছেন।**

তাঁর সমালোচ্য মতবাদের মূর্ত-নির্দিষ্ট ঐতিহাসিক দিকটা, স্বকালের পরিস্থিতিতে তাদের বাস্তব ভাবাদর্শীয়-রাজনৈতিক ভূমিকা উপেক্ষা করা ছাড়াও টোপিচ মূলত রাষ্ট্র, আইন ও রাজনীতির প্রশ্নে দার্শনিক, বিশ্ববীক্ষামূলক মনোভাবকে নাকচ করে দিয়েছেন, অস্বীকার করেছেন মানবিক প্রজ্ঞানে এক-একটা ধারণার তাত্ত্বিক-প্রজ্ঞানমূলক অবদান। অতিকথার যাদু থেকে 'বিশ্বকে সম্মোহনমুক্ত' করার দৃষ্টবাদী প্রয়াস পর্যবসিত হয় বিশ্ববীক্ষামূলক সমস্যা বলে 'কোনো বিষয় নেই' এই কথা প্রমাণের প্রচেষ্টায়।*** রাজনৈতিক-আইনী ভাবধারার ক্ষেত্রে 'মূল্যবোধমূলক' দৃষ্টিভঙ্গির বিরুদ্ধে সংগ্রামে টোপিচ, তাঁর সমালোচ্য মতবাদের অন্তর্বস্তুকেই উপেক্ষা করেন। এটাও উল্লেখ্য যে দৃষ্টবাদী ও উদারনৈতিক-গণতান্ত্রিক অবস্থান

থেকে মহাজাগতিক ও নৈতিক বিশ্বজনীনতার, চিন্তার 'ম্ল্যবোধাত্মক' মডেলের সমালোচনাও ম্ল্যায়নাত্মক ও ম্ল্যবোধাত্মক দিক থেকে মুক্ত নয়। টোপিচ এবং সমদর্শী অন্যান্য লেখকেরা দেখান নি কিভাবে সামাজিক-রাজনৈতিক ও আইনী ঘটনার ম্ল্যায়নাত্মক-ম্ল্যবোধাত্মক দিককে অতিক্রম করা যায়।

কোনো একটা মতবাদে ম্ল্যায়নাত্মক বিচার আছে কি নেই তদন্সারে কিছ্ব ব্র্জোয়া রাজনীতিবিদের পক্ষ থেকে রাজনৈতিক তত্ত্ব ও রাজনৈতিক মতবাদের মধ্যে পার্থক্য টানায় সন্দেহ জাগে এই কারণে যে রাজনৈতিক ধ্যানধারণায় কোনো না কোনো ম্ল্যায়নাত্মক দিকের অস্তিত্ব অনিবার্য।* মার্কিন রাজনীতিবিদ ক. ডেইচ-ও রাজনৈতিক মতবাদের ইতিহাসে 'চিন্তার' বিভিন্ন 'মডেলগ্নলিকে' আলাদা করে তুলে ধরে সমালোচনা করেছেন। 'মডেলকে তাত্ত্বিক চিন্তার হাতিয়ার' হিশেবে দেখে তিনি লিখেছেন যে 'মান্ষ মডেলের মধ্যে চিন্তা করে'**।

টোপিচের মতো ডেইচও 'আধ্বনিক রাজনৈতিক ভাবাদর্শ ও বিশ্ববীক্ষার' সমালোচক এবং রাজনীতির যৌক্তিক ও বাস্তবে কার্যকরী তত্ত্ব সম্পর্কে নিজের ধারণাকে খাড়া করেন 'ভাবধারার রাজনৈতিক ইতিহাস' থেকে উদ্ধৃত বিভিন্ন মতবাদের বিপরীতে।*** তবে টোপিচ থেকে তাঁর পার্থক্য এই যে প্রাচীন, মধ্যয্গীয়, সাম্প্রতিক ও সাম্প্রতিকতম কালের রাজনৈতিক চিন্তার মডেল বিশ্লেষণে (বিশেষত, আঙ্গিক, যান্ত্রিক, ঐতিহাসিক 'মডেল') তিনি তাদের তাত্ত্বিক-জ্ঞানতাত্ত্বিক দিক সম্পর্কে বেশি সঠিক এবং নীতিগতভাবে স্বীকার করেন (কোনো না কোনো রকম কুণ্ঠা রেখে) রাজনৈতিক ঘটনার গবেষণায় তাদের তাৎপর্য ও প্রজ্ঞানম্লক ভূমিকা।**** সেইসঙ্গে বলা উচিত যে চিন্তার এইসব 'মডেল' ঘিরে ভাবাদর্শীয় সংগ্রামের প্রশ্নটি তিনি এড়িয়ে যান।

সামাজিক, রাজনৈতিক ও আত্মিক জীবনের মার্কসবাদী ঐতিহাসিক-বস্তুবাদী গবেষণার অঙ্গ হিশেবে ঐতিহাসিক পদ্ধতি, ঐতিহাসিক মনোভঙ্গি হল কোনো একটা যুগে জ্ঞানের সামগ্রিক ব্যবস্থায় ধারণাগতভাবে রূপায়িত রাজনৈতিক ও রাষ্ট্রিক-আইনী তত্ত্বের ভূমিকা ও কাজ ব্যাখ্যা, সংশ্লিষ্ট যুগের রাজনৈতিক জ্ঞানের সাধারণ গঠনের মধ্যে অন্যান্য উপাদানের সঙ্গে উক্ত রাজনৈতিক মতবাদের সম্পর্ক বিশ্লেষণ, অতীত ও বর্তমানের বিভিন্ন ধ্যানধারণার মধ্যে যোগাযোগের অনুধাবন, ঐতিহাসিক পশ্চাৎপ্রেক্ষিত ও পরিপ্রেক্ষিতে কোনো একটা তত্ত্বের উদ্ভব ও তার পরবর্তী জীবনে আলোকপাত, রাজনৈতিক মতবাদের ইতিহাসে যুক্তিধারার বৈশিষ্ট্য, অতীত ও বর্তমানের ব্যবহারিক রাজনীতির সঙ্গে রাজনৈতিক ভাবকল্পের সম্পর্ক ইত্যাদির বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ এক সূচক নীতি।

ঐতিহাসিক মনোভঙ্গি এক্ষেত্রে যেমন আলোচ্য মতবাদটির রাজনৈতিক আধেয়ের অতীত তাৎপর্য, তেমনি তার সত্যকার সাম্প্রতিক ভূমিকার উপলব্ধি ও মূল্যায়নের উপায়। বলাই বাহুল্য যে অতীতের কোনো একজন রাজনৈতিক মনস্বীর ধ্যানধারণা ও নির্মিতিকে পরবর্তী কালের নতুন ঐতিহাসিক পরিস্থিতিতে, অন্য বাস্তবতার প্রেক্ষিতে রাজনৈতিক মতবাদের পুনঃসংরচিত উপাদান হিশেবে দেখলে তা ভিন্ন একটা নতুন তাৎপর্য লাভ করে।

লেনিন লিখেছেন, সমাজ বিদ্যায় গুরুত্বপূর্ণ হল 'বনিয়াদী ঐতিহাসিক সম্পর্কটা না ভোলা, ইতিহাসে নির্দিষ্ট ব্যাপারটির উদ্ভব হল কিভাবে, বিকাশের কোন কোন পর্যায় দিয়ে তা গেছে সেই দৃষ্টিকোণ থেকে প্রত্যেকটি প্রশ্নকে দেখা এবং তার বিকাশের এই দৃষ্টিকোণ থেকে জিনিসটা বর্তমানে কী হয়ে দাঁড়িয়েছে সেটা লক্ষ করা'*।

রাজনৈতিক ভাবকল্প ও মতবাদ যেমন পরবর্তী কালের ক্রিয়াকলাপের সঙ্গে সম্পর্কিত সরাসরি নয়, প্রত্যক্ষভাবে নয়, বাস্তব ঐতিহাসিক ঘটনাবলির এক জটিল চিত্রের মধ্যস্থতায়, তার অনুবর্তনের দিকটাতেও মধ্যস্থ হয় রাজনৈতিক ও আইনী চিন্তার ইতিহাসে অর্জিত ও সূত্রবদ্ধ তাত্ত্বিক জ্ঞানের সমষ্টি।

রাজনৈতিক-আইনী মতবাদগুলির অতীত ও সাম্প্রতিক ভূমিকা ও তাৎপর্যের সুষ্ঠু ব্যাখ্যা করতে হলে প্রয়োজন কোনো একটা মতবাদের মধ্যস্থিত রাজনৈতিক জ্ঞানের নির্মিতিতে, মূর্ত-নির্দিষ্ট ঐতিহাসিক ও

তাত্ত্বিক দিকটা পৃথক করা। এ ব্যাপারে নির্দিষ্ট মতবাদটির রাজনৈতিক-আইনী আধেয়ের মূর্ত-নির্দিষ্ট ঐতিহাসিক দিকটা থেকে দেখা যায় নির্দিষ্ট মতবাদটিতে সমাজ, রাষ্ট্র, আইন, রাজনীতি ইত্যাদি সম্পর্কে ঐতিহাসিকভাবে নির্ধারিত, সামাজিক-রাজনৈতিক ভাবে মূর্ত-নির্দিষ্ট ঠিক কী দৃষ্টিভঙ্গি সে মতবাদে বিকশিত ও প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, কিভাবে এই দৃষ্টিভঙ্গিগুলি নির্দিষ্ট শ্রেণী ও সামাজিক গ্রুপের ভাবাদর্শের সঙ্গে জড়িত, কী কী স্বার্থ ও বিকাশের প্রবণতা তাতে প্রকাশ পেয়েছে, স্বীয় যুগের কাঠামোর মধ্যে মতবাদস্রষ্টা কী অবস্থান নিয়েছেন, ইত্যাদি। ওদিকে তাত্ত্বিক দিকটায় প্রতিফলিত হয় মতবাদটির দার্শনিক, সাধারণ পদ্ধতিমূলক, প্রজ্ঞানমূলক-জ্ঞানতাত্ত্বিক ব্যাপারগুলো, যা থেকে দেখা যায় কিভাবে ও কী আকারে মূর্ত-নির্দিষ্ট রাজনৈতিক-আইনী দৃষ্টিভঙ্গি প্রতিপাদিত করা হয়েছে, কী তাত্ত্বিক ধারণায় তা সূত্রবদ্ধ, তার ভিত্তিতে আছে কোন প্রারম্ভিক নীতি, আলোচ্য মতবাদটিতে প্রতিফলিত হয়েছে চিন্তার কী রূপ ও নির্মিতি, যা নির্দিষ্ট মনস্বীর পক্ষে নির্ধারক অথবা তিনি তার প্রথম প্রবর্তক, ইত্যাদি।

নির্দিষ্ট রাজনৈতিক-আইনী মতবাদটির গঠনের উভয় দিকেই (মূর্ত-নির্দিষ্ট ঐতিহাসিক ও সাধারণ তাত্ত্বিক) মনোযোগ অর্পণ প্রয়োজন কেবল সঙ্গত ও সঠিক মূল্যায়নের ভিত্তি হিশেবে নয়, মতবাদটির পরবর্তী ঐতিহাসিক জীবনের হেতুধারা, অন্যান্য মতবাদের সঙ্গে তার পারস্পরিক সম্পর্ক, তাদের অঙ্গীভবন ও বিভেদন প্রক্রিয়া, সংগ্রামের দিকগুলি, ঐতিহাসিক বিকাশে তাদের উত্তরানুবর্তন ও অভিনবত্বের ওপর আলোকপাতের প্রারম্ভিক শর্ত হিশেবেও তা গুরুত্বপূর্ণ। রাজনৈতিক মতবাদের মূর্ত-নির্দিষ্ট ঐতিহাসিক ও তাত্ত্বিক দিকের দ্বান্দ্বিক ঐক্য ও পারস্পরিক সম্পর্কে তাদের আপেক্ষিক স্বাধীনতা নাকচ হয় না, বরং সেটাই ধরে নিতে হয়, যার কল্যাণে অতীতের কোনো একজন রচয়িতার তাত্ত্বিক বর্গ, ভাবকল্প, সূত্র ও নির্মিতি 'মুক্তি' পায় নিজের মূর্ত-নির্দিষ্ট ঐতিহাসিক আচ্ছাদন থেকে এবং বিকাশমান মানবিক প্রজ্ঞানের তাত্ত্বিক-পদ্ধতিমূলক অস্ত্রাগারে স্থান পায়। উপলব্ধি ও বর্গঘটিত যন্ত্রের এই বর্ধনে, রাজনৈতিক-আইনী ঘটনার প্রজ্ঞান বিজয়ে তাত্ত্বিক শব্দাবলি ও পদ্ধতিমূলক ভাণ্ডারের সমৃদ্ধিতে পরিষ্কার ফুটে ওঠে রাজনৈতিক মতবাদের ইতিহাসে ভাবকল্প ও জ্ঞানের সমৃদ্ধির মধ্যে সম্পর্কপাতের, ইতিহাস ও আধুনিক কালের মধ্যে সম্পর্কপাতের জটিল প্রক্রিয়া।

জ্ঞানের এইরূপ ক্রমাগত সঞ্চয়ের প্রক্রিয়াতেই রাজনৈতিক মতবাদের

ইতিহাসে রূপ নেয় সেইসব 'চিরন্তন সমস্যা' যার সংরচনে বিভিন্ন মনস্বী নিজেদের অবদান যোগ করেছেন এবং তাদের ঐতিহাসিক উত্তরানুবর্তনে এবং এক-একটা ধারণার তাত্ত্বিক অর্থের সমৃদ্ধিতে সহায়তা করেছেন।

এইরকম সমস্যার মধ্যে পড়ে (নৈতিকতা ও রাজনীতি, নাগরিক ও রাষ্ট্র, সমাজ ও রাষ্ট্র, স্বাধীনতা ও আবশ্যিকতা, রাষ্ট্রক্ষমতা ও বলপ্রয়োগ ইত্যাদির মধ্যে সহসম্পর্কের সমস্যার সঙ্গে সঙ্গে) অধিকার ও আইনের মধ্যে প্রভেদ ও সহসম্পর্কের সমস্যা, যার দৃষ্টান্তে চমৎকার দেখা যায় যে এই বিষয়টায় বহু শতক ধরে বহুসংখ্যক গবেষকের আগ্রহ নেহাৎ তাত্ত্বিক ঐতিহ্যে অর্ঘ্যদান বা কোনো একটা অসার, অলীক, গুরুত্বহীন সমস্যার প্রতি সর্বনাশা আকর্ষণ নয়। উল্টে বরং, রাজনৈতিক-আইনী মতবাদের ইতিহাস দেখায় যে 'অধিকার ও আইন' বিষয়ক সমস্যাগুলির সারগর্ভতাই (সামাজিক-রাজনৈতিক ও তাত্ত্বিক-পদ্ধতিমূলক দিক থেকে) গবেষকদের অবিরাম মনোযোগ আকর্ষণ করে এসেছে।

মানবিক নির্দেশ, সবার পক্ষে পালনীয় নিয়ম ও আইন সম্পর্কে ঠিক তাত্ত্বিক চরিত্রের ধারণা অতীতে দেখা দিয়েছিল (প্রথমে গ্রীসে, পরে আরো নির্ধারিত, পরিভাষায় সুনির্দিষ্ট রূপে রোমে) স্বাভাবিক-বিধি সম্পর্কে এই ধারণায় যে মানবিক আইন শর্তবদ্ধ (বা শর্তবদ্ধ হওয়া উচিত) স্বাভাবিক বিধি (স্বাভাবিক ন্যায়, শৃঙ্খলা ইত্যাদি) দ্বারা।

এই দিক থেকে উল্লেখযোগ্য যে সফিস্টরা আগেই সূত্রবদ্ধ করেছিল বেশকিছু স্বাভাবিক-অধিকার বিষয়ক ভাবকল্প। যদি শুধু অল্প কয়েকটি নামে সীমাবদ্ধ থাকতে হয়, তাহলে এই ভাবকল্প ও প্রস্তাবগুলিকে বিকশিত করেছেন অতীতকালে — সক্রেটিস, প্লেটো, আরিস্টটল, সিসেরো, রোমক ব্যবহারশাস্ত্রজ্ঞরা; মধ্যযুগে ও সাম্প্রতিক কালে — অগাস্টিন, গ্রটিয়াস, হবস, লক, স্পিনোজা, মঁতেস্ক্যু, রুসো, কান্ট, ফিখ্‌টে, হেগেল, আইনের ঐতিহাসিক স্কুলের প্রতিনিধিরা; নানারকমের অদল-বদলের মধ্য দিয়ে স্বাভাবিক-বিধি বিষয়ক ধারণাগুলি আমাদের কাল অবধি এসে পৌঁছেছে।

স্বাভাবিক-বিধি গোছের বিভিন্ন ধারণা ও মতবাদের অন্তর্নিহিত যে নীতিটা সাধারণ, সেটা আমরা মনে করি অধিকার ও আইনের মধ্যে প্রভেদীকরণ এবং সেই প্রভেদীকরণের পরিধির মধ্যে অধিকারের প্রাধান্যের নীতি। স্বাভাবিক-বিধি বিষয়ক মতবাদগুলির বিভিন্ন প্রকারভেদের সমস্ত স্বকীয়তার মধ্যেও অধিকারকে ধরা হয়েছে স্বাভাবিক (ব্যাপারাদি ও সম্পর্কের তর্কাতীত প্রকৃতি, তাদের প্রজ্ঞা ইত্যাদি বলে), আর আইনকে ধরা হয়েছে

কৃত্রিম কিছু একটা বলে (মানবিক সৃজনশীলতা, খেয়ালখুশি বা বিচারবুদ্ধির আপেক্ষিক ফল)। আইনের উপযুক্ত, তর্কাতীত ভিত্তিই হল স্বাভাবিক বিধি, আইন থেকে পৃথকভাবে অধিকার।

বিভিন্ন ধরনের স্বাভাবিক-বিধি বিষয়ক মতবাদের (প্রকৃতিবাদী অথবা যুক্তিবাদী, ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যমূলক অথবা সর্বজনীন) বৈশিষ্ট্য হল অধিকার ও আইনের বৈপরীত্য। এতে করে এসব মতবাদে অধিকার (স্বাভাবিক বিধি) হয়ে দাঁড়ায় কেমন একটা আদর্শ, কার্যকরী আইনকে হতে হবে যার উপযোগী।

রাজনৈতিক-আইনী চিন্তা, আইনের দর্শন এবং রাজনৈতিক দর্শনের ইতিহাসে 'অধিকার ও আইন' সংক্রান্ত সমস্যার সমাধানে বিভিন্ন ধ্যানধারণায় সূচিত হয় সামাজিক-রাজনৈতিক ও রাষ্ট্রিক-আইনী জীবনের ক্রিয়াযন্ত্রের বোধে, সামাজিক বিকাশের নিয়মানুগতা ও পারস্পরিক সম্পর্কের উপলব্ধিতে অগ্রগতি।

তাত্ত্বিক গবেষণায় স্বাভাবিক বিধির প্রবক্তারা যেসব মূলনীতি, ভাবকল্প, সমস্যা ও সিদ্ধান্তের প্রথম প্রচলন করেছিলেন, কালক্রমে তা আইনী ধারণার অন্য পক্ষপাতীরাও গ্রহণ ও পরিমার্জন করেন। এই শেষোক্তদের কাছে স্বাভাবিক বিধির মতবাদ হল ঐসব ধারণার উদ্ভবের তাত্ত্বিক ভিত্তি এবং নীতি, সমস্যা, গবেষণার মডেল, যুক্তি-প্রণালী ইত্যাদির ভাণ্ডার।

কেবল তরুণ হেগেলপন্থী পর্বেই নয়, পরবর্তী রচনাদিতেও মার্কস ও এঙ্গেলস অধিকার ও আইনের মধ্যে প্রভেদ মনে রেখে এগিয়েছেন। প্রথম দিকের রচনায় তাঁরা এই প্রভেদকে ব্যবহার করেছেন বৈপ্লবিক-গণতান্ত্রিক অবস্থান থেকে বিদ্যমান জনবিরোধী আইনপ্রণয়নী রূপের সমালোচনার জন্য। বস্তুবাদী অবস্থানে এসে মার্কস ও এঙ্গেলস অধিকার (অধিকারভিত্তিক সম্পর্ক) এবং আইনের (আইনপ্রণয়ন, রাষ্ট্রের ধারাবদ্ধ নির্দেশ ও আজ্ঞা) মধ্যে প্রভেদকে অবলম্বন করে তাঁরা 'ব্যবহারশাস্ত্রীয় বিশ্ববীক্ষা', আইনপ্রণয়নের চরিত্র, ভূমিকা ও কাজ, তার উৎস ও লক্ষ্য সম্পর্কে ভাববাদী দৃষ্টিভঙ্গির আমূল সমালোচনা করেন।

'অধিকার ও আইন' বিষয়ক সমস্যা ব্যাখ্যানের ইতিহাসে যে তাত্ত্বিক-পদ্ধতিমূলক ভাবনা সঞ্চিত হয়ে উঠেছে এবং মার্কস ও এঙ্গেলস তার যে বস্তুবাদী বিকাশ ঘটিয়েছেন, সেটা যেমন অধিকার সমস্যার দার্শনিক বিশ্লেষণে, তেমনি আইনপ্রণয়নী প্রক্রিয়ার বৈজ্ঞানিক ভিত্তির সংরচন ও উন্নয়নে সাম্প্রতিক তাত্ত্বিক গবেষণার পক্ষেও গুরুত্বপূর্ণ একটা প্রারম্ভিক প্রস্তাবনা।

সামাজিক স্বার্থের বৈপরীত্য, রাজনৈতিক ইতিহাসের সমস্ত সময়াবধি শ্রেণী সংগ্রাম হল রাজনৈতিক চেতনার বিকাশ, রাজনৈতিক-আইনী চিন্তার উদ্ভব ও বিকাশের বনিয়াদী সামাজিক-শ্রেণীগত উৎস। রাষ্ট্র, আইন, ক্ষমতা, রাজনীতি, মুক্তি, ন্যায় ইত্যাদি নিয়ে প্রতি কালের পক্ষে জরুরি যেসব সমস্যা ঘিরে ভাবাদর্শীয় ও তাত্ত্বিক সংগ্রাম চলেছে, অবিরাম তার কেন্দ্রে ছিল রাজনৈতিক-আইনী মতবাদের ইতিহাস, অতীতের কোনো না কোনো ধ্যানধারণা। সঞ্চিত জ্ঞান ও অনুমোদিত ধারণাগুলির নিকট, 'ঐতিহ্যের' নিকট, 'অতীতের' নিকট এবং রাজনৈতিক-আইনী চিন্তার ক্ষেত্রে 'প্রামাণিক' ও 'ক্লাসিকের' নিকট এই আবেদন বর্তমানেও বজায় আছে (এবং বেশ কয়েকটি দিকে স্পষ্টতই বেড়ে উঠছে) এবং সেটা যেমন তাত্ত্বিক, তেমনি ব্যবহারিক-রাজনৈতিক, ভাবাদর্শীয় ও প্রচারমূলক ধারায়।

রাজনৈতিক মতবাদের ইতিহাস সর্বাগ্রে হল বিভিন্ন স্কুল, ধারা ও ভাবাদর্শের মধ্যে ভাবাদর্শীয়-তাত্ত্বিক সংগ্রামের রণক্ষেত্র। তাছাড়া, 'ইতিহাসের প্রামাণিকতার' আলোকে কোনো একটা সাম্প্রতিক মতকে আলোকিত ও সমর্থিত অথবা খণ্ডিত ও হেয় করার জন্য পূর্ববর্তী যুগগুলির রাজনৈতিক মতবাদ, তার ভাবাদর্শ ও ধ্যানধারণা যোগ দিচ্ছে বর্তমানের জরুরি ভাবাদর্শীয় সংগ্রামে।

অতীতের তাত্ত্বিক উত্তরাধিকারের প্রশ্ন নিয়ে তীব্র শ্রেণীগত ভাবাদর্শীয় সংগ্রামের বর্তমান পরিস্থিতিতে কোনো একটা মতবাদ প্রসঙ্গে পদ্ধতির দিক দিয়ে সঠিক অভিমুখ ও তার মূল্যায়ন হয়ে দাঁড়াচ্ছে খুবই গুরুত্বপূর্ণ। রাজনৈতিক ও আইনী মতবাদের ইতিহাসের ওপর পশ্চাদ্দৃষ্টি হল বর্তমানের ভাব ও দৃষ্টিভঙ্গির সংগ্রামের অর্থ ও পরিপ্রেক্ষিত নির্ধারণের একটা গুরুত্বপূর্ণ দিক। ইতিহাস ও বর্তমানের মধ্যে এই সম্পর্ক চমৎকার ফুটে ওঠে ভাবাদর্শের ইতিহাসে বড়ো একটা স্থান নিয়েছে এমন প্রায় সমস্ত রাজনৈতিক তত্ত্বের দৃষ্টান্তে, সর্বাগ্রে ক্লাসিকাল রাজনৈতিক মতবাদগুলিতে যাদের ঘিরে তীব্র আলোচনা চলেছে ও চলছে। বিভিন্ন তাত্ত্বিক ও ভাবাদর্শীয়-রাজনৈতিক ধারার প্রতিনিধিরা নিজেদের অবস্থান সুসিদ্ধ ও প্রতিপক্ষকে সমালোচনা করার যুক্তি সংগ্রহ করেছেন ও করে যাচ্ছেন রাজনৈতিক চিন্তার ইতিহাস থেকে। প্রায়ই রাজনৈতিক মতবাদের ইতিহাস থেকে কোনো একটা বক্তব্যকে ব্যবহার করা হয় স্পষ্টতই তার অপভাষ্যে, উদ্দেশ্য হল 'ক্লাসিকের' প্রামাণিকতার আড়ালে দৃষ্টিকটু ব্যাপারকে চাপা দেয়া। এইভাবে, জাতীয়-

সমাজতন্ত্রের (নাৎসিবাদের) ভাবপ্রবক্তারা পূর্বগামীদের সন্ধানে জার্মান রাজনৈতিক চিন্তার ইতিহাসের আশ্রয় নেয় এবং নিজেদের স্বার্থে ব্যবহার করে ফিখ্‌টে, কান্ট, শেলিঙ্গ, হেগেল এবং ঐতিহাসিকভাবে স্বীকৃত অন্যান্য মনীষীদের প্রামাণিকতা।

রাজনৈতিক চিন্তার প্রাচীন ও নবীন ক্লাসিকদের (প্লেটো থেকে শুরু করে নিট্‌শে ও ভেবের পর্যন্ত) প্রামাণিকতা বিভিন্ন ভাষ্যে ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হচ্ছে পশ্চিমের বুর্জোয়া ব্যবস্থার রাজনৈতিক-আইনী ভাবনা ও মানের ওকালতির জন্য, ভিন্ন ধরনের ও অঞ্চলের সামাজিক-রাজনৈতিক ব্যবস্থার বিরোধিতা করার জন্য, মার্কসবাদী-লেনিনবাদী ভাবাদর্শ ও সমাজতান্ত্রিক কর্মকাণ্ডের সমালোচনা করার জন্য। রাজনৈতিক চিন্তার কোনো না কোনো ক্লাসিক উত্তরাধিকারের দ্বারস্থ হওয়াটা, পশ্চিম রাজনীতিবিদ হ. ল্যুবে সরাসরি যা স্বীকার করেছেন, এ হল রাজনৈতিক-ভাবাদর্শীয় ক্ষেত্রে 'কোনজন কে' স্থির করার প্রণালী ও উপায়। অতীত মতবাদগুলির ভাষ্য সম্পর্কে তিনি নিজের মত ব্যক্ত করেছেন এই বলে: 'রাজনৈতিক ও ধর্মীয় গ্রুপগুলির আত্মপ্রতিষ্ঠার বাচনিক উপায়ের মধ্যে পড়ে ক্লাসিকের ভাষ্যদান মারফত নিজেকে বৈধ করা'*। কোনো একটা একমাত্র ভাষ্যের অদ্বৈততা, পরম সত্যতা তিনি যে অস্বীকার করেছেন, তাতে মোটেই এটা নাকচ হয় না যে অতীতের ক্লাসিকাল ভাবধারার আলোকে তাঁর ও তাঁর সহযোগীদের দ্বারা সাম্প্রতিক বুর্জোয়া ভাবাদর্শের সমর্থনে পক্ষপাতিত্ব নেই।

এটা তাৎপর্যপূর্ণ যে অতীতের কোনো একটা মতবাদের ভাবাদর্শীয়-তাত্ত্বিক অর্থের মূল্যায়নে** সাম্প্রতিক বুর্জোয়া লেখকদের অবস্থানের সমস্ত বৈচিত্র্য, পার্থক্য, এমনকি বৈপরীত্য সত্ত্বেও বুর্জোয়া ব্যবস্থার 'বৈধকরণে' ও সমাজতান্ত্রিক ভাবাদর্শ ও ক্রিয়াকর্মের প্রতি বিরোধিতায় তারা সকলে এক। মার্কস, এঙ্গেলস ও লেনিনের দৃষ্টিভঙ্গির ব্যাখ্যা করা হয় তাঁদের 'পূর্বসূরী' — প্লেটো, আরিস্টটল, রুসো, হেগেল এবং কর্তৃত্ববাদ ও সর্বগ্রাসিতাবাদে অভিযুক্ত অন্যান্য রাজনৈতিক মনীষীদের মতবাদের নেতিবাচক, 'প্রতিক্রিয়াশীল' দিকের আলোকে।***

অতীত ও বর্তমানের রাজনৈতিক মতবাদের বিচারে অনৈতিহাসিকতা ও পদ্ধতিগত অসিদ্ধি প্রকাশ পায় প্রসঙ্গ থেকে ছিঁড়ে নেয়া রাজনৈতিক তত্ত্বের কোনো একটা প্রস্তাবের দিকে একপেশে ঝোঁকে, ভাবকল্পের উত্তরান্বর্তনের কোনো একটা দিকের মাত্রাতিরিক্ত অতিরঞ্জনে, আর সেইসঙ্গে মতবাদের মূর্ত-নির্দিষ্ট ঐতিহাসিক দিক, তার সামাজিক-ঐতিহাসিক শর্তবদ্ধতা ইত্যাদির উপেক্ষায়।

অতীতের মতবাদের রাজনৈতিক অন্তর্বস্তুর গঠনে তার ঐতিহাসিক উপাদান উপেক্ষা করলে তাকে বোঝা এবং প্রগতিশীল বা পশ্চাৎমুখী হিশেবে তার সঠিক মূল্যায়ন সম্ভব হয় না। এরূপ উপেক্ষায় নির্দিষ্ট মতবাদটির সঙ্গে তার স্রষ্টা আত্মিক অবস্থার, তার পূর্ববর্তী ও সমকালীন ভাবাদর্শীয়-তাত্ত্বিক চিন্তাধারার সম্পর্ক, পারিপার্শ্বিক বাস্তবতার প্রতি তার মনোভঙ্গির চরিত্র (বৈপ্লবিক, সমালোচনামূলক সংস্কারবাদী, বশ্যতাধর্মী, রক্ষণশীল বা প্রতিক্রিয়াশীল) বুঝতে অসুবিধা হয়। এতে মূর্ত-নির্দিষ্ট সামাজিক-অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক অবস্থার বাইরে রাজনৈতিক-আইনী ভাবকল্পের কেমন একটা স্বয়ংগতির ধারণা জন্মায়, স্বকালে ঐ রাজনৈতিক মতবাদের যে বাস্তব তাৎপর্য ছিল, তা বিকৃত হয়, পরবর্তী ইতিহাসে তার ভূমিকা বোঝা কঠিন হয়ে পড়ে। যেমন, হেরাক্লিটাস, প্লেটো, রুসো, ফিখ্‌টে আর হেগেলের মতবাদে যেসব রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি বিকশিত হয়েছে তাদের মূর্ত-নির্দিষ্ট ঐতিহাসিক অর্থ স্পষ্টতই, দৃষ্টান্তস্বরূপ, ফ্যাসিস্ট সর্বগ্রাসিতার ভাবাদর্শ ও ক্রিয়াকর্ম থেকে ভিন্ন।

বর্তমান ব্যাখ্যায় অতীত মতবাদের তাত্ত্বিক প্রস্তাবাদি যে তাৎপর্য লাভ করে, তাও রচয়িতার তাৎপর্য (প্লেটো, হেগেল ইত্যাদির যা নিজস্ব) থেকে ভিন্ন, যেমন ভিন্ন বর্তমান থেকে অতীতের ঐতিহাসিক পরিস্থিতি। পূর্ববর্তী রাজনৈতিক-আইনী তত্ত্বের শব্দাবলি ও প্রস্তাবাদিকে নতুন ঐতিহাসিক অবস্থা ও সমস্যাদির ব্যাখ্যায় প্রয়োগ করতে গেলে অনিবার্যতই তা নতুন অর্থে ব্যবহৃত হয়, আদিদ তত্ত্বের সঙ্গে যার সম্পর্ক পরোক্ষ ও মধ্যস্থ-নির্ভর (বাস্তব সামাজিক-ঐতিহাসিক ঘটনাদি ও ভাবকল্পের ইতিহাসের যুক্তিধারা মারফৎ)। এতে অবশ্যই ইতিহাসে সঞ্চিত জ্ঞানের মূল্য অথবা সাংস্কৃতিক উত্তরাধিকারের প্রতি আধুনিক অভিগমনের উপায় হিশেবে অতীত মতবাদের ব্যাখ্যার রূপ, কিছুই সংশয়যোগ্য হয়ে ওঠে না। কথাটা হচ্ছে আসলে অতীতের মতবাদের অন্তঃসারের গঠনের বিভিন্ন দিকের হিশেব নিয়ে তার যথোপযুক্ত, ঐতিহাসিক ও তাত্ত্বিক দিক থেকে সঠিক ব্যাখ্যা নিয়ে।

রাজনৈতিক-আইনী মতবাদের ইতিহাসের প্রতি আধুনিক আগ্রহকে সুপ্রাচীনতার নেশা করে তুললেও ব্যাপারটা বিকৃত হবে, তার মূলে থাকে ইতিহাসকে সেকেলে, বর্তমানের পক্ষে গুরুত্বহীন বলে ভাবার এটা একটা মিথ্যা ধারণা।

অতীতের ক্লাসিক মতবাদগুলির ক্রমাগত নতুন নতুন ভাষ্য, মূল্যায়ন, বিচার চলে, তার গতিপথে নতুন ঐতিহাসিক, আত্মিক, সামাজিক-রাজনৈতিক পরিস্থিতি ও সমস্যাদি তুলিত হয় স্বীকৃত মনস্বীর আদর্শের সঙ্গে। চিন্তার (ধরা যাক দার্শনিক, রাজনৈতিক-আইনী) ইতিহাসে প্রবেশ করে স্বস্থান খুঁজে পাওয়া যদি-বা কঠিন হয়, (কেননা এক্ষেত্রে ন্যূনপক্ষে এই 'স্বস্থান' গড়ে নিতে হবে নিজেকেই) তাহলেও ইতিহাস থেকে বেরিয়ে আসা আর সম্ভব নয়। স্বকীয় ধরনের এই 'কালোত্তীর্ণতা' এবং প্লেটো যার স্বপ্ন দেখেছিলেন ভাবকল্পের সেই 'চিরন্তন' জগতে অংশিদারি — এটা শুধু মনীষীকে তাঁর যোগ্য স্বীকৃতিদানই শুধু নয়, এ থেকে এটাও প্রমাণ হয় যে তাঁর মতবাদের ভাবাদর্শীয়-তাত্ত্বিক ও প্রজ্ঞানমূলক শক্তি সত্যই মানবিক সংস্কৃতির দিগন্ত প্রসারিত করেছে এবং তাঁর দ্বারা সূত্রবদ্ধ নতুন নতুন বিচারগুলি হয়ে দাঁড়িয়েছে মানবিক জ্ঞানসমষ্টির অঙ্গাঙ্গি দিক।

এই দিক থেকে চিন্তার ইতিহাসের প্রতি কালাপাহাড়ি মনোভাবটা আসে সঞ্চিত জ্ঞান 'এড়িয়ে যাবার' বিভ্রান্তি থেকে, মানবজাতির আত্মিক সংস্কৃতিকে তা উপেক্ষা করে। অথচ অতীতের ধ্যানধারণাগুলির যথোপযোগী ব্যাখ্যাই হল বর্তমানের পক্ষে তাৎপর্যপূর্ণতার দিক ও পরিসীমার ক্ষেত্রে আত্মিক উত্তরাধিকারকে বাস্তব করা মারফত আত্মিক সংস্কৃতিতে দিশা পাওয়ার উপায়, ইতিমধ্যেই পরিজ্ঞাতের পটে নতুন পরিস্থিতি ও সমস্যার প্রজ্ঞান ও ব্যাখ্যানের রূপ। অতীতের একটা ধ্যানধারণার রচয়িতা আমাদের সমকালীন হয়ে ওঠেন ততটা আপেক্ষিকভাবেই, যতটা আপেক্ষিকভাবে আমরা নিজেদের স্থানান্তরিত করি তাঁর কালে।

অতীতের সংস্কৃতির বড়ো একটা স্তর যত বেশি পেছিয়ে যাচ্ছে এবং বাড়ছে মানুষের আহরিত জ্ঞানের মোট পরিমাণ, ততই বাড়ছে বর্তমান কালের ক্ষেত্রে ইতিহাসের ভূমিকা ও তাৎপর্য। বর্তমানে ইতিহাস, তথা রাজনৈতিক ও আইনী মতবাদের ইতিহাস যতটা গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে, তেমন আর কখনো হয় নি। মানবিক সংস্কৃতির বিকাশের পরিপ্রেক্ষিতে ও তার প্রসঙ্গে ইতিহাস সেই পরিমাণেই বর্তমান, যে পরিমাণে বর্তমানটাও ঐতিহাসিক।

তৃতীয় অধ্যায়

প্রাচীন জগতের রাজনৈতিক মতবাদ

*

§ ১। সাধারণ বৈশিষ্ট্য

কথাটার সুনির্দিষ্ট অর্থে রাজনৈতিক মতবাদ দেখা দেয় আদি শ্রেণী সমাজ ও রাষ্ট্রের আস্তিত্বের পর্বে। রাজনৈতিক মতবাদ (রাজনৈতিক তত্ত্ব) অবয়ব লাভ করে তার প্রাথমিক ধর্মীয়-অতিকথামূলক রূপ থেকে যৌক্তিক-হেতুবাদী রূপে মানবিক প্রজ্ঞানের উত্তরণ প্রক্রিয়ায়। অতিকথা থেকে logos (বাণী ও চিন্তা)-র দিকে উৎক্রমণের এই পথটাতেই দর্শনের জন্ম ও বিকাশ।

এই প্রক্রিয়ার চৌহদ্দির মধ্যে বিকাশমান আইনী ও রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি ছিল কোনো না কোনো মাত্রায় প্রথমে অতিকথা ও পরে দর্শনের বিশ্ব-বীক্ষামূলক ধারণার এক-একটা স্বাধীন অংশ, অবশেষে নিজের বিশেষ বিষয়বস্তু ও গবেষণার পদ্ধতি নিয়ে বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের আপেক্ষিকভাবে স্বয়ংশাসিত ক্ষেত্রে তা চূড়ান্তরূপে পৃথক হয়ে যায়। এইভাবে অতিকথা, দর্শন, বিজ্ঞান হয়ে ওঠে রাজনৈতিক-আইনী ঘটনার প্রজ্ঞান অর্জনের তিনটি মৌল পর্যায় এবং তদনুযায়ী প্রজ্ঞানের তিনটি ঐতিহাসিক রূপ।

খিঃ পূঃ ২-১ সহস্রকের যেসব উৎস টিকে আছে, তা বিচার করলে দেখা যায় যে প্রাচীন মিশরী, চীনা, হিন্দু, ব্যাবিলনিয়ান, ইহুদী, পারসিক, রোমক, গ্রীকদের আদি সামাজিক-রাজনৈতিক ধারণার ধর্মীয়-অতিকথামূলক চরিত্র একই প্রকার, যদিও বিশ্ববীক্ষার এই সাধারণ ধারার মধ্যে লক্ষিত হয় স্বকীয়তা ও পার্থক্য।

সর্বাগ্রে চোখে পড়ে ক্ষমতা ও শৃঙ্খলার বিদ্যমান সম্পর্কের উদ্ভব বিষয়ে সর্বত্রই ঐশী শক্তি (স্বর্গীয়, লোকোত্তর) বিষয়ক ধারণার প্রাধান্য। লন্ডভন্ড অবস্থার বিপরীতে কসমস (মহাবিশ্ব), গ্রীক পরিভাষায়, দেবতাদের উপস্থিতি ও প্রয়াসে সুসংবদ্ধ, পৃথিবীর শৃঙ্খলা — বিশ্ব, মহাবিশ্বের শৃঙ্খলার একাংশ।

যেমন, আর্যদের পবিত্র স্তোত্র গ্রন্থ ঋগ্বেদে বিশ্বের সমস্ত ঘটনাকে দেখা হয়েছে ঋত, বিশ্ব শৃঙ্খলার প্রকাশ হিশেবে।

প্রাচীন অতিকথার যে সামাজিক-রাজনৈতিক ও নৈতিক-আইনী দিকগুলোয় আমরা আগ্রহী, তার মূল প্রসঙ্গ হল বিদ্যমান শৃঙ্খলার ঐশ্বরিক আদি উৎস। কিন্তু পার্থিব সম্পর্কের সঙ্গে ঐশ্বরিক প্রেরণার যোগাযোগের পদ্ধতি ও চরিত্রের প্রশ্নে অতিকথাগুলি বিভিন্ন রকম উত্তর দিয়েছে ও আলোকপাত করেছে। এ যোগাযোগের নানান ভাষ্য মূলত নির্ধারিত সেই ব্যবস্থা ও সেই সব সামাজিক-রাজনৈতিক শৃঙ্খলা থেকে যাদের বিশ্ববীক্ষাগত ন্যায্যতা নিবদ্ধ হয় অতিকথায়। অতিকথার নির্দিষ্ট এক-একটা ভাষ্যে অনুমোদন করা হয় তদনুবর্তী (বিদ্যমান) ব্যবস্থা, সেই সঙ্গে তা হল তার অস্তিত্ব এবং চিরকাল অপরিবর্তিত সংরক্ষণীয়তার ন্যায্যতা প্রতিপাদন, তথা সে ব্যবস্থার ভাবাদর্শ ও তা চালু রাখার আদর্শ।

পার্থিব ক্ষমতা ও ব্যবস্থার ঐশ্বরিক উদ্ভব নিয়ে এক-একটা ভাষ্য তাই বিদ্যমান ব্যবস্থার প্রধান নীতি ও মূল মডেলের কাজ করে, সেই সঙ্গে তা হয়ে দাঁড়ায় একচ্ছত্র মতাদর্শ, ভিন্ন ধারণা, দৃষ্টিকোণ, মত ইত্যাদির পক্ষ থেকে কোনো প্রতিযোগিতা থাকে না। অতিকথায় সন্দেহ হল যুক্তিসিদ্ধির সূত্রপাত, কিন্তু সেটা ঘটে পরে।

যেমন, প্রাচীন চীনে পার্থিব ক্ষমতার ঐশ্বরিক উদ্ভব ও চরিত্র নিয়ে অতিকথাটা হাজির করা হয় একব্যক্তিমূলকতার ভাষ্যে: একমাত্র স্বর্গীয় সর্বোচ্চ শাসক (সম্রাট) হলেন উচ্চতম স্বর্গীয় শক্তিদের সঙ্গে সংযোগ বিন্দু। এই দৃষ্টিভঙ্গি থেকে সমস্ত ক্ষমতা সর্বোচ্চ শাসকে কেন্দ্রীভূত তাঁর ব্যক্তিগত তেজ ও আভ্যন্তরীণ শক্তি হিশেবে, অন্য সমস্ত পদাধিকারী এবং গোটা রাষ্ট্রীয় যন্ত্রটাই কেবল শাসকের ব্যক্তিগত ক্ষমতার সহায়ক। সোপানতান্ত্রিক ভাবে গঠিত ব্যবস্থায় এই সহায়কেরা রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার ধারক নয়, পথপ্রদর্শক, সর্বোচ্চ শাসকরূপ ব্যক্তির সেবক।

মিশর, ব্যাবিলন, ভারতে অতিকথার কিছুটা অন্য ভাষ্য দেখা যায়, সে অনুসারে দেবতারা হলেন শাসকের ক্ষমতার উৎস, তাতে করে তাঁরা থেকে যাচ্ছেন পার্থিব ব্যাপার-স্যাপার ও লোকেদের ভাগ্যের বিধাতা। রাজ ক্ষমতা ও আইনগুলির ঐশ্বরিক উদ্ভবের অনুরূপ ধারণা গ্রীক অতিকথাতে প্রতিফলিত, এতে এবং অন্যকিছু অতিকথার ভাষ্যান্তরে আদিতে দেবতাদের সরাসরি শাসনের কথা বলা হচ্ছে (ক্রনোস, জিউস প্রভৃতি)।*

পুরাকালের ইহুদীদের ধর্মীয়-অতিকথামূলক ধারণায় একমাত্র, সত্যকার ঈশ্বর যিনি, তিনি সমস্ত ইহুদীদের সঙ্গে চুক্তিবদ্ধ, তাদের প্রধান ও সম্রাট (তাদের সর্বোচ্চ আইনদাতা, শাসক এবং বিচারক)।

ইহুদীদের শাস্ত্র অনুসারে তাদের আইনকানুন মোজেস সরাসরি পেয়েছিলেন ঈশ্বরের কাছ থেকে (মোজেসের আইনদান)। সাধারণ পরিস্থিতিতে লোকে শাসন চালায় ঈশ্বরের পক্ষ থেকে, কিন্তু অসাধারণ পরিস্থিতিতে ঈশ্বর হস্তক্ষেপ করেন সরাসরি (উল্ঘাটন, অলৌকিক ঘটনা ইত্যাদি)। সামাজিক ও ব্যক্তিগত সমস্ত জীবনই ঐশী বিধানে নিয়মিত।

ক্ষমতা, শাসন, বিধি ও শৃঙ্খলার বিষয়বস্তু সম্পর্কে বেশি মূর্ত-নির্দিষ্ট দৃষ্টিভঙ্গির ভিত্তিতে আছে রাষ্ট্রক্ষমতার ঐশী চরিত্র নিয়ে আহরিত অতিকথাসুলভ ভাষ্য।

ধর্মীয়-অতিকথামূলক ধারণা অনুসারে পার্থিব শৃঙ্খলা হল স্বর্গীয়, ঐশ্বরিক। যেমন, আকাশের পুত্র হিশেবে চীন সম্রাট নিজ জনগণের পিতা। সর্বোচ্চ ক্ষমতার এই পিতৃকল্পনা মিলে যায় রাষ্ট্রকে বড়ো একটা পরিবার বলে ধারণার সঙ্গে। ক্ষমতাধর আর অধীনস্থদের মধ্যে সম্পর্ক সন্তানদের ওপর মাতাপিতার ক্ষমতার অনুরূপ আর পারিবারিক সম্পর্কই অন্য সমস্ত সম্পর্কের ক্ষেত্রে মূল নিয়ামক মডেল।

ভারত, মিশর এবং অন্যান্য যেসব প্রাচীন রাষ্ট্রে জনগণ বিভক্ত থাকত নির্দিষ্ট এবং সাধারণভাবে বংশগত জাত ও সম্প্রদায়ে, সেখানে এই সামাজিক-রাজনৈতিক ভেদাভেদটাকেই চাপানো হত ঐশী প্রেরণার ওপর। ভারতীয় বেদে (খ্রিঃ পূঃ ২ হাজার বছর) এমনকি জাতকে (ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র) ঈশ্বর ব্রহ্মার এক-একটা অঙ্গ বলে কল্পনা করা হয়েছে। এক্ষেত্রে আমরা পাচ্ছি জৈবিক ধ্যানধারণা — অতি আগেকার একটা প্রকারভেদ যাতে সমাজের গঠনকে ব্যাখ্যা করা হয় জীবন্ত দেহ দিয়ে (এক্ষেত্রে ঐশ্বরিক দেহ)।

ভারত, মিশর, পুরাকালীন ইহুদী, রোম, অংশত গ্রীসে পুরোহিতেরা প্রথমে ছিল জ্ঞানচর্চার আত্মবদ্ধ সম্প্রদায় (চীনে সে ভূমিকা পালন করত

স্পষ্টতই রাজপুরুষেরা)। এই সম্প্রদায়ের হাতে কেন্দ্রীভূত ছিল ধর্মীয়, সাধারণ রাষ্ট্রীয়, বিচার, মানদণ্ড নির্ধারণ ইত্যাদির ভার। তাদের ভেতর থেকে নির্বাচন করা হত মূল কর্মকর্তাদের। মিশরে নিজেদের মধ্যে থেকে ফেরাওকে নির্বাচন করত পুরোহিতরা এবং তাদের ওপর রীতিমতো নির্ভর করে থাকতে হত তাকে। ভারতে পুরোহিতরা ছিল রাজারও ওপরে, রাজারা ছিল ক্ষত্রিয় (যোদ্ধা) জাতভুক্ত। ব্রাহ্মণরা যেসব বিধান চালু করত, তাতে কড়া করে বাঁধা ছাঁদা হত রাজার সমস্ত জীবন। মূল জাত ও সম্প্রদায়ের বাইরে থাকত দাসেরা। প্রথম তিনটি বর্গ বিজয়ী উপজাতির (আর্য) লোক, আর শূদ্ররা হল বিজিত অনার্য।

মিশরীয়দের মধ্যেও প্রথম দুই বর্গ (পুরোহিত ও যোদ্ধা) গড়ে ওঠে বহিরাগত উপজাতির মধ্যে থেকে। স্থানীয় অধিবাসীরা তাদের ক্ষমতায় দমিত হয়ে তাদের অধীনতা গ্রহণ করে বণ্টিত হয় বাকি জাত হিশেবে। স্পার্টাতেও অনুরূপ অবস্থা দাঁড়ায় স্পার্টান (বহিরাগত বিজয়ী) আর হেলোটদের (বিজিত স্থানীয় অধিবাসী) মধ্যে।

ধর্মীয়-অতিকথামূলক পর্যায়ে অধিকার ও আইন এখনও মান নির্ধারণের বিশেষ ক্ষেত্র হিশেবে পৃথক হয়ে ওঠে নি, তা ছিল ধর্মীয়-অতিকথায় অনুমোদনীয় ব্যক্তিগত, সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় জীবনের অবিভক্ত অংশ ও অখণ্ডিত দিক হিশেবে। এই সময়কার আইনে অতিকথামূলক, ধর্মীয়, নৈতিক, সামাজিক-রাজনৈতিক এবং অন্যান্য সব দিক নিবিড়ভাবে বিজড়িত; আইনপ্রণয়নকে সমগ্রভাবেই মহিমান্বিত করা হয়েছে ঐশী আদি উৎসে। আইনকে ধরা হচ্ছে হয় সরাসরি দেবতাদের নয় তাঁদের বরপুত্র — শাসকদের (কিংবদন্তির রাষ্ট্রপ্রতিষ্ঠাতা ও বীর-বিধানকর্তা, অথবা বিদ্যমান ক্ষমতাধরদের) রচনা বলে। সোজাসুজি দেবতাদের কাছ থেকে নিজেদের আইন ও বিধান পাচ্ছে হিন্দু, মিশরী, গ্রীক, ইহুদীরা।

অতিকথামূলক ধারণায় পার্থিব আইন-শৃঙ্খলা বিশ্ব ও মহাজাগতিক শৃঙ্খলার অঙ্গাঙ্গি অংশ, কোনো ব্যক্তির দ্বারা তার নিয়ম, আচার, আইনের যে-কোনো ধরনের লঙ্ঘনে সমগ্রভাবে স্বর্গীয় ও পার্থিব সামঞ্জস্যের ক্ষতি হয়, বিশ্ব বিপর্যয় ঘটতে পারে তাতে। এই থেকেই বিশেষ করে দেখা দেয় মনুষ্যজীবনের খুবই খণ্ড খণ্ড নিয়ামন, নানা রকম ধর্মীয়-নৈতিক নিষেধ ও তা ভঙ্গের জন্য (ইহলোক ও পরলোকে) কঠিন শাস্তি। বিদ্যমান শৃঙ্খলা

ও আইন যেহেতু ঐশ্বরিক ও পবিত্র তাই তার লঙ্ঘনকে ধরা হত ঈশ্বরের প্রতি চ্যালেঞ্জ।*

জ্ঞান, তথা সমস্ত রাষ্ট্রীয়-আইনী ও সামাজিক ব্যাপার চালাবার ওপর পুরোহিতদের একাধিপত্য এবং সেইসঙ্গে তাদের নিজস্ব আচার পালন ছিল দৃষ্টিভঙ্গির অতিকথামূলক পর্যায়ের একটা গুরুত্বপূর্ণ দিক। পুরোহিতরা হল অতিকথার ব্যাখ্যাকার, ঐশ্বরিক ও মানবিক রহস্যের বোদ্ধা, জ্ঞানের একচ্ছত্র অধিকারী, ভাবাদর্শের ধারক ও বাহক, ক্ষমতাধর পদাধিকারীদের নিয়োগকর্তা, আইনদাতা, রাজপুরুষ, বিচারক, বিদ্যমান শৃঙ্খলার সর্বোচ্চ পোষক; এক কথায়, পুরোহিত সম্প্রদায় হল সে সময়কার ধর্মীয়, বুদ্ধিমার্গীয় ও ক্ষমতাধর উচ্চকোটি। পুরোহিতরা শুধু গোপন রহস্যের বোদ্ধা নয়, তার সংগঠকও। অতিকথা রক্ষা করে পুরোহিতরা সেই সঙ্গে রক্ষা করত যে-কোনো নবপ্রবর্তনা ও পরিবর্তন থেকে নিজেদের প্রতিষ্ঠা এবং বিদ্যমান সমাজকে।

*

খিঃ পূঃ ১ সহস্রকে রাজনৈতিক-আইনী ধারণার যে যুক্তিসিদ্ধি দেখা যায়, সেটায় সূচিত হয় অতিকথামূলক ভাবাদর্শ থেকে নির্গমন এবং একই সঙ্গে পুরোহিতদের একাধিপত্য জয়।

এই যুক্তিসিদ্ধি চলে অতিকথাগুলির বিষয়বস্তুর পবিত্রতাহরণ ও নৈতিকতা প্রবর্তনের ধারায়, পুরোহিতরা ছাড়াও অতিকথার ব্যাখ্যায় অন্য লোকের আগমনে, রাষ্ট্রীয়-আইনী প্রশ্নগুলিকে ক্রমশ বেশি স্বাধীন ও ব্যাপক আলোচনায় টেনে আনায়। রাষ্ট্ররূপে গঠিত বিভিন্ন সমাজে এ প্রক্রিয়া চলে বিভিন্ন প্রখরতায়, বিভিন্ন রূপ গ্রহণ করে তা, পরিণামও হয় বিভিন্ন। কিন্তু সমগ্রভাবে আদি ধর্মীয়-অতিকথামূলক ধারণা থেকে সাধারণভাবে বিশ্ব এবং বিশেষ করে রাষ্ট্র ও আইন সম্পর্কে ন্যূনাধিক যুক্তিবাদী ধারণায় সরে যাওয়া লক্ষিত হয় খিঃ পূঃ ৮-৬ শতকের সর্বত্র: এই প্রবণতার ফল দেখা যাবে চীনে কনফুশিয়াস, মো-ৎসজি, লাও-ৎসজি ও

লেজিস্টদের,* ভারতে বুদ্ধ, পারস্যে জারাথুস্ত্রের মতবাদে, প্যালেস্টাইনে ইহুদী পয়গম্বর হেরেমি, ইসাই প্রভৃতির প্রচারে, গ্রীসে মহাকাব্যকার, নাট্যকার, প্রাজ্ঞ, সোফিস্ট ও দার্শনিক, রোমে আইনবিদদের বক্তৃতায়।

আদি অতিকথামূলক ধারণা থেকে (স্বর্গের সঙ্গে চীন সম্রাটের যোগ, নিজ প্রজাদের পিতা হিশেবে সম্রাটের একটা পিতৃস্থানীয় প্রতিষ্ঠা, রাষ্ট্রকে বড়ো একটা পরিবার বলে ধরা, পারিবারিক ও রাষ্ট্রিক ক্ষমতার আনুরূপ্য ইত্যাদি) পৃথক যুক্তিসিদ্ধ যে মতবাদ প্রচার করেন কনফুশিয়াস (খ্রিঃ পূঃ ৫৫১-৪৭৯) তারও ছিল নৈতিক চরিত্র, পরে এটি চীনের সরকারী রাষ্ট্রীয় ধর্ম ও ভাবাদর্শ বলে ঘোষিত হয়।

এসময়কার চীনের রাজনৈতিক চিন্তায়, বিশেষ করে কনফুশিয়াসের বিরোধী, জনগণের নিম্নস্তরের স্বার্থরক্ষক মো-ৎসজির (খ্রিঃ পূঃ ৪৭৯-৩৮১) মতবাদে এই ভাবনা দেখা দেয় যে প্রাক্‌রাষ্ট্রিক স্বাভাবিক অবস্থায় বসবাসী লোকেরা নিজেদের মধ্যে কথা কয়ে নেওয়ায় রাষ্ট্রের উদ্ভব হয়। সমস্ত লোকেদের সাম্যের কথা মো-ৎসজি বলেন যে যুক্তিতে, তাও বেশ কৌতূহলোদ্দীপক। তাঁর মতে, সমস্ত লোক জন্মসূত্রে এবং স্বর্গের সঙ্গে সম্পর্কের দিক দিয়ে সমান (সবাই সমানভাবে 'স্বর্গের দাস')।

স্বাভাবিক নিয়মের ক্রিয়াকলাপ উল্লেখ করে লাও-ৎসজি (খ্রিঃ পূঃ ৬-৫ শতক) ঐশ্বরিক ইচ্ছার ভূমিকা বিষয়ে কল্পনা খণ্ডন করেন। যে স্বাভাবিক নিয়ম (দাও) অনুসরণ করতে তিনি আহ্বান করেছিলেন, সেটা বলতে তিনি বুঝেছিলেন পুরাকালের স্বাভাবিক অবস্থা।

চীনের রাজনৈতিক-আইনী চিন্তার যুক্তিসিদ্ধির প্রোজ্জ্বল প্রতিনিধি হলেন লেজিস্টরা, যাঁদের মতবাদ দানা বাঁধে খ্রিঃ পূঃ ৭-৪ শতকে। পুরনো ঐতিহ্য অস্বীকার করেন লেজিজমের তত্ত্বকারেরা (ৎসজি চান, শান ইয়ান, শেন বু-হাই, হান ফেই প্রভৃতি), প্রতিষ্ঠা করেন চীনের রাজনীতি ও আইনের ঐহিক মতবাদ। তাঁরা মনোযোগ দিয়েছিলেন শক্তিশালী, কেন্দ্রীভূত, প্রতিষ্ঠাপন্ন রাষ্ট্র সৃষ্টির দিকে যা নিয়মিত করবে জনগণের সামাজিক ও ব্যক্তিগত জীবনের সমস্ত দিক। এই উদ্দেশ্যে ঐতিহ্য, নৈতিক ধ্যানধারণা আর কর্মকর্তাদের বিবেচনার ভিত্তিতে রাষ্ট্রকর্ম পরিচালনার বিপরীতে তাঁরা আনেন আইনের ভিত্তিতে চালনা — এ আইনগুলিকে হতে হবে অসংখ্য,

বিশদ এবং কঠোর।* লেজিস্টদের ধ্যানধারণায়, বিধি মেনে চলার ভিত্তি হল পুরস্কারের চেয়ে শাস্তির অগ্রাধিকার।

উৎপাদন ও বাণিজ্যের একসারি ক্ষেত্রে রাষ্ট্রের একাধিপত্য স্থাপন, প্রশাসনিক যন্ত্রকে অর্থনৈতিক কাজ অর্পণ, অধিবাসী ও রাজপুরুষদের ওপর যৌথ দায় (নিজের কাজের জন্য রাজপুরুষদের ব্যক্তিগত দায়িত্বের নীতি ছাড়াও)), অধিবাসীদের আচার-ব্যবহার ও মানসিক ঝোঁকের উপর রাষ্ট্রের নিয়মিত নিয়ন্ত্রণ, আমলাতান্ত্রিক যন্ত্রে পদাধিকারী নিয়োগে পরীক্ষা ব্যবস্থা, আমলাতান্ত্রিকতার ওপর সেন্সর তত্ত্বাবধানের ধারণা উপস্থিত করেন লেজিস্টরা।

রাষ্ট্রকে বৃহৎ একটি পরিবার বলে ধরার কনফুশিয়ান ধারণাকে বর্জন করেন লেজিস্টরা, রাষ্ট্র চালনাকে তাঁরা দেখেছিলেন শাসক ও প্রজাদের মধ্যে নিরন্তর যুদ্ধ হিশেবে। শাসকের অভিষন্ধি ও ক্রিয়ার গোপনতা, প্রজাদের প্রতারণা ইত্যাদি লেজিস্টদের মতে আভ্যন্তরীণ সংগ্রাম রূপ রাজনীতিতে সাফল্যের আবশ্যকীয় শর্ত। রাজনীতিতে গোপনতার ন্যায্যতা প্রমাণ করতে গিয়ে লেজিস্টরা দাও দর্শনে গোপনতার যে বোধ দেওয়া হয়েছিল তাকে রূপান্তরিত করেন।

রাষ্ট্র, আইন, রাজনীতির লেজিস্ট মতবাদের বেশ কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ দিক গৃহীত হয়েছিল রাষ্ট্রে সরকারি ভাবাদর্শ ও আচরণ হিশেবে, যদিও প্রায়ই বাহ্যত কনফুশিয়ান কিছু বুলি জুড়ে দিয়ে।

প্রাচীন পারসিকদের আদি অতিকথামূলক দৃষ্টিভঙ্গির নবায়ন জারাথুস্ত্র (জোরোয়াস্ত্র)-এর নামের সঙ্গে জড়িত। এ'র শিক্ষা বেশ ব্যাপকভাবে ছড়ায় প্রাচীন জগতে (মধ্য প্রাচ্য, এশিয়ার পশ্চিম ভাগে, ভারত, গ্রীসে) এবং খিস্টীয় মতবাদ গড়ে ওঠায় লক্ষণীয় প্রভাব ফেলে। জারাথুস্ত্রের আবির্ভাব মনে হয় খিঃ পূঃ ৯-৮ শতকে; খিঃ পূঃ ৭ শতক নাগাদ জারাথুস্ত্রবাদ একটা সুগঠিত মতবাদ ও ধারারূপে গড়ে উঠে।

জারাথুস্ত্রের শিক্ষার মূল কথা হল বিশ্বে দুই বিপরীত নীতি — সু ও কু-এর মধ্যে দ্বন্দ্ব। সু-এর নীতি রূপ লাভ করেছে আলোকের দেব অরমুজদের রাজত্বে, কু-এর নীতি তামসিক দেব আরিমানের রাজত্বে। সু আর আলোকে বোঝায় সক্রিয় ক্রিয়াকলাপ, কু ও তামসার বিরুদ্ধে মানুষের

সংগ্রাম। এই সংগ্রামেই নিহিত অস্তিত্বের সদর্থক উদ্দেশ্য ও সার্থকতা। কু'য়ের সাময়িক বিজয় সত্ত্বেও শেষকালে, জারাথুস্ত্র বলতেন, জয় হবে সু-এর।

জারাথুস্ত্রবাদ অনুসারে রাষ্ট্রকে হতে হবে অরমুজ্‌দের স্বর্গীয় রাজত্বের পার্থিব প্রতিমূর্তি। রাজা অরমুজ্‌দের সেবক, কু থেকে প্রজাদের রক্ষা করতে হবে তাকে, রাষ্ট্রে কু'য়ের বিরুদ্ধে লড়ে শুভের প্রতিষ্ঠা করতে হবে। এই ধরনের রাজার প্রেরণায় পারস্য রাষ্ট্র এইভাবে ক্রমশ সংকুচিত করবে কু'য়ের শক্তি, বিস্তার করবে সু'য়ের ক্ষমতা। এরূপ সমাজের সম্প্রদায় ভেদ হওয়া উচিত প্রত্যেকের পক্ষে কোনো একটা বৃত্তির স্বাধীন নির্বাচনের ভিত্তিতে। এক-একটা সম্প্রদায়ের নেতৃত্ব থাকা উচিত নিজের কর্মে সদাচারীদের ওপর। অরমুজ্‌দের সেবকদের জারাথুস্ত্র ডাক দিয়েছেন পরস্পরকে ভালোবাসতে, ক্ষমা করতে, শান্তিতে থাকতে।

এ ছাড়াও জারাথুস্ত্রবাদে আছে বিশ্বের অবসান, পরিত্রাতার জন্ম, মৃত্যুর পর প্রায়শ্চিত্ত, শেষ বিচার, মৃতের পুনরুত্থান সম্পর্কে এস্‌কাটোলোজিসুলভ ভাবনা।*

পারস্যে আমরা কম বেশি সুরচিত রাজনৈতিক মতবাদ পাই না, তবে হেরোডোটাসকে বিশ্বাস করতে হলে ('ইতিহাস', তিন, ৮০-৮৮) সেখানেও বিভিন্ন ধরনের রাষ্ট্র সম্পর্কে যথেষ্ট বিকশিত ধারণা ছিল। বিশেষত, তিনি বলছেন রাষ্ট্রের ভবিষ্যৎ গঠন সম্পর্কে সাতজন ষড়যন্ত্রীর আলোচনার কথা।** তিনজন (পারস্যের ওমরাহ্‌ অতান, মেগাবিজ এবং ভবিষ্যৎ রাজা দারিয়াস) মত দেন যথাক্রমে গণতন্ত্র, গোষ্ঠীতন্ত্র ও রাজতন্ত্রের পক্ষে।

অতান গণতন্ত্রের শ্রেষ্ঠত্ব (কর্মকর্তাদের জবাবদিহি, আইনী শৃঙ্খলার অস্তিত্ব, ইত্যাদি) প্রতিপন্ন করে খুবই তীব্র সমালোচনা করেন একচ্ছত্র রাজতন্ত্রের দোষাবলির (স্বেচ্ছাচার, স্বদেশী আচার ও নিয়মাদির লঙ্ঘন, ন্যায় বিচারের অভাব, কুৎসা, জুলুম, নিগ্রহের পরিস্থিতি)। স্বৈরাচারী ক্ষমতার সমালোচনায় সম্মত হন মেগাবিজও, তবে গণরাজ তিনি প্রত্যাখ্যান

করেন বুদ্ধিহীন ইতরদের রাজত্ব বলে। তাঁর ব্যাখ্যায় শুধু গোষ্ঠীতন্ত্র — উচ্চ ওমরাহ্‌দের সেরা, ঘনিষ্ঠ একটা মহলই কেবল রাষ্ট্র চালনায় শ্রেষ্ঠ ব্যবস্থা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ নিশ্চিত করতে পারে।

দারিয়াস গণতন্ত্রের বিরুদ্ধে মেগাবিজের যুক্তি মানেন, কিন্তু গোষ্ঠীতন্ত্রকেও সমালোচনা করেন। সমুন্নত রাজতন্ত্রের পক্ষ নেন তিনি। শ্রেষ্ঠ প্রেরণায় চালিত একজন শাসকের শাসন ত্রুটিহীন। এরূপ শাসনে শত্রুর বিরুদ্ধে সিদ্ধান্ত গোপন রাখা যায় সবচেয়ে ভালো। গোষ্ঠীতন্ত্রে দেখা দেবে গোলমাল, প্রতিদ্বন্দ্বিতা, রক্তপাত; ব্যাপার শেষ পর্যন্ত গড়াবে স্বৈরশাসন প্রতিষ্ঠায়। একচ্ছত্র ধরনের শাসন সবচেয়ে ভালো।

দারিয়াসের মতে, গণতন্ত্রে নীচ ও ইতর লোকেরা সমাজজীবনে প্রবেশ করে এবং খারাপ লোকেরা একত্রে মিলিত হয়ে ও একসঙ্গে কাজ করে ষড়যন্ত্র পাকায়। 'তাই চলতে থাকে' — বলেন দারিয়াস, 'যতদিন না কোনো জননায়ক তাদের নির্মূল করছে। এর জন্য জনগণ শ্রদ্ধা করবে সে ব্যক্তিকে আর পরে এই মহিমাময় (নায়ক) দ্রুত হয়ে উঠবে একচ্ছত্র শাসক। এ থেকে আরো পরিষ্কার হয়ে উঠছে যে স্বৈরতন্ত্রই শাসনের শ্রেষ্ঠ নিদর্শন' (হেরোডোটাস, 'ইতিহাস', তিন, ৮২)। শেষত, দারিয়াস উল্লেখ করেন যে এক্ষেত্রে পারসিকদের স্বাধীনতা দান করছে জনগণ এবং ওমরাহ্‌রা নয়, একচ্ছত্র শাসক।

একচ্ছত্র শাসন প্রতিষ্ঠার জন্য দারিয়াসের আহ্বানে যোগ দেয় ষড়যন্ত্রীদের বাকি চারজন। এইভাবে আলোচ্য প্রশ্নের মীমাংসা হয় রাজতন্ত্রের পক্ষে আর পরের দিন প্রত্যূষে 'হিস্তাস্পের পুত্র দারিয়াস পারস্যের রাজত্ব গ্রহণ করেন নিজের ঘোড়া ও সহিস এবার-এর শৌর্যের কল্যাণে' (হেরোডোটাস, 'ইতিহাস', তিন, ৮৮)।

*

মিশরীয় ও অন্যান্য প্রাচ্য অতিকথার লক্ষণীয় প্রভাবাধীন গ্রীক বৃত্তান্তগুলির একটা যুক্তিসম্মত ব্যাখ্যা দেবার চেষ্টা দেখা যায় হোমারের কাব্যে এবং হেসিওডের বিশ্বসৃষ্টি ও দেবজন্ম গ্রন্থে যাতে দেবতাদের অন্তর্নিহিত নৈতিক দিক ও চরিত্র আলাদা করে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে।

তথাকথিত সপ্ত প্রাজ্ঞ (খ্রিঃ পূঃ ৭-৬ শতক), বিশেষ করে ফালেস, সলোন প্রভৃতি তখনই সূত্রবদ্ধ করছেন ব্যবহারিক জ্ঞানের পুরোপুরি যুক্তিসিদ্ধ নিয়ম যা প্রায়ই রাষ্ট্রীয় আইনের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। সপ্ত প্রাজ্ঞের

অনেকে নিজেরাই ছিলেন রাজনৈতিক জীবনের সক্রিয় শরিক, শাসক কিংবা আইনদাতা (বিশেষ করে সলোন)।

গ্রীসে রাজনৈতিক-আইনী ধারণাদি বিশদে বিকশিত করেন দার্শনিকরা (পিথাগোরাস, হেরাক্লিটাস, ডেমোক্রিটাস) এবং সফিস্টরা*।

প্রাচীন গণতন্ত্রের উদয় ও সংহতির পরিস্থিতিতে খিঃ পূঃ ৫ শতকে আবির্ভূত সফিস্টদের প্রধান আগ্রহ ছিল রাজনীতি, আইন, অধিকারের সমস্যায়। সফিস্টদের প্রবীণ (প্রটাগোরাস, হিপ্পিয়াস, গোর্গিয়াস, আন্টিফোন, প্রদিকাস প্রভৃতি) এবং নবীন (ফ্রাজিমাখ, কালিক্লাস, লিকোফ্রন প্রভৃতি) পুরুষেরা এগিয়ে আসেন সর্বাগ্রে রাজনৈতিক বিজ্ঞতারই শিক্ষাদাতা হিশেবে, আইন এবং রাষ্ট্রজীবনের বোদ্ধা, চিরাচরিত দৃষ্টিভঙ্গির সমালোচক, নতুন রাজনৈতিক-আইনী পরিস্থিতির প্রতিনিধি হিশেবে।

সফিস্টদের নীতিগত সমালোচক ছিলেন সক্রেটিস (খিঃ পূঃ ৪৬৯-৩৯৯)। সফিস্টদের সঙ্গে তর্ক করলেও সক্রেটিস তাদের বেশ কিছু ধারণা গ্রহণ করেন এবং তাদের সূচিত জ্ঞান প্রচারণী কাজ চালিয়ে যান নিজের মতো করে।

সক্রেটিস কোনো লিখিত উৎস রেখে যান নি, কিন্তু প্লেটো ও জেনোফন্ট যা উল্লেখ করেছেন, তাঁর মৌখিক কথোপকথনে থাকত নৈতিক দর্শনের ভিত্তি, যার একটা বড়ো অংশ ছিল অধিকার, রাজনীতি, রাষ্ট্রের আলোচনা।

সফিস্টদের নৈতিক ও জ্ঞানতাত্ত্বিক অপেক্ষবাদ এবং আত্মমুখিনতা, নৈতিক দায় মুক্ত শক্তির জন্য তাদের আবেদনকে খণ্ডন করে সক্রেটিস ন্যায়নীতির, নৈতিক রাজনীতি ও আইনের অবজেকটিভ প্রকৃতির যুক্তিসিদ্ধ, হেতু-পরম্পরাগত বোধবিষয়ক একটা ভিত্তির সন্ধানে ব্যাপৃত থাকেন। নৈতিক-রাজনৈতিক সমস্যাদির আলোচনাকে বোধ ও সংজ্ঞার মাত্রায় তুলে দিয়ে সক্রেটিস উল্লিখিত ক্ষেত্রে নিজস্ব তাত্ত্বিক গবেষণার সূত্রপাত করেন। এই দিক থেকে প্লেটো ও আরিস্টটল সক্রেটিসের দার্শনিক ও তাত্ত্বিক জ্ঞানের উত্তরসাধক।

প্লেটো এবং আরিস্টটলের পর প্রাচীন গ্রীক রাষ্ট্রপাটের পতন ও হেলেনীয় রাজতন্ত্রের মহিমার পরিস্থিতিতে এপিকিউরীয় ও স্টোইকদের মতবাদ বিচার করলে দেখা যায় যে রাজনৈতিক সমস্যাদিতে আগেকার আগ্রহ অনেক ক্ষীণ হয়ে এসেছে।

যেমন গ্রীক (জেনো, ক্রিসিপাস) তেমনি রোমক (সেনেকা, মার্কাস

---

* সফিস্ট (কুতার্কিকেরা) — খিঃ পূঃ ৫ শতকে এথেন্সে গড়ে ওঠা সফিস্ট

অরিলিয়াস প্রভৃতি) স্টোইসিজমে* নীতিশাস্ত্রের প্রাধান্য। স্টোইকরা জীবনের যে আদর্শের কথা বলে তা প্রকৃতি অনুসারী, আর প্রকৃতি হল মূলত প্রাজ্ঞ। বিশ্ব প্রজ্ঞা মানবিক প্রকৃতির প্রজ্ঞাতেও দেখা দেয়, তাই হল রাষ্ট্র ও আইনাদির ভিত্তি।

শুধু রোমক স্টোইসিজম নয়, প্রাচীন রোমের অন্যান্য রাজনৈতিক-আইনী চিন্তাধারাও বিকশিত হয় গ্রীক মতবাদের বিপুল প্রভাবে। সেইসঙ্গে রোমক লেখকেরা, প্রধানত সিসেরো (খ্রিঃ পূঃ ১০৬-৪৩) এবং রোমক ব্যবহারশাস্ত্রীরা (উলপিয়ান, পাপিনিয়ান, কুইণ্টিলিয়ান, মডেস্টিনাস, গাইয়াস, পল, ফ্লোরেণ্টিনাস প্রভৃতি) রাষ্ট্র ও আইন বিষয়ক মতবাদে অনেককিছু আনেন নতুন।

রোমক আইনী ধ্যান-ধারণার একটা বড়ো কীর্তি ব্যবহারশাস্ত্র সৃষ্টি।

আমাদের যুগের গোড়ায় দেখা দিল খ্রিস্ট ধর্ম, যা ফ. এঙ্গেলসের কথায় 'আবির্ভূত হয় নিপীড়িতদের আন্দোলন হিশেবে: প্রথমে তা ছিল দাস ও মুক্তিপ্রাপ্ত দাসেদের, দরিদ্র ও অধিকারহীনদের, রোম কর্তৃক বশীভূত বা ছত্রখান জনগোষ্ঠীর ধর্ম'**। ইহুদিদের মধ্যে উদিত হয়ে খ্রিস্ট ধর্ম পরে অন্য জনগোষ্ঠীর মধ্যে ছড়ায় ও পরিণত হয় বিশ্ব ধর্মে এবং ৪ শতক থেকে তা বহু দেশে রাষ্ট্রীয় ধর্মের স্বীকৃতি লাভ করে।

মানুষের সার্বজনীন সাম্যের ধারণা নতুন ভিত্তিতে স্থাপন করে এবং তা অর্জনের প্রয়াস মারফত খ্রিস্ট ধর্ম প্রথমে ধারণ করে একটা বৈপ্লবিক-গণতান্ত্রিক চরিত্র। পরে গির্জার আমলাতন্ত্রের হাতে অনুশাসনবদ্ধ হয়ে খ্রিস্টীয় মতবাদ ব্যবহৃত হতে থাকে সামাজিক-রাজনৈতিক অসাম্যের ভাবাদর্শীয় সমর্থনে।

প্রাচীন জগতের রাজনৈতিক ও আইনী ভাবনাচিন্তার উদ্ভব ইতিহাসাশ্রিত বলে একই সময়ে তার একটা ঐতিহাসিক সীমাবদ্ধতাও বর্তমান। সেই সঙ্গে আবার এইসব ভাবনাচিন্তার তাত্ত্বিক সূত্রগুলির ব্যবহার চলতে থাকে পরবর্তী ধ্যানধারণাতেও, পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে তা রূপান্তরিত হয়ে নতুন তাৎপর্য লাভ করে।

গোষ্ঠীর অনুগামী প্রাচীন গ্রীক দার্শনিকেরা; এ'রা ছিলেন অপেক্ষবাদের দিকে আকৃষ্ট দার্শনিক অধ্যাপক।

* স্টোইসিজম (ঔদাসীন্যবাদ) — বস্তুবাদ ও ভাববাদের মধ্যে দোলায়মান প্রাচীন দার্শনিক ধারা; স্টোইকদের মতে, প্রাজ্ঞের কাজ হল রিপুবেগ ও মত্ততা থেকে মুক্ত হয়ে বিচারবুদ্ধি অনুসারে দিনযাপন।

§২। প্রাচীন ভারতের রাজনৈতিক-আইনী দৃষ্টিভঙ্গি

সুপ্রাচীন ও সমৃদ্ধ সংস্কৃতির দেশ ভারতবর্ষ। প্রাচীন ভারতে রাজনৈতিক-আইনী চিন্তার বিকাশ একটা উচ্চ মাত্রায় পৌঁছয়।

প্রাচীন ভারতীয় চিন্তায় অবিরাম মনোযোগ দেয়া হয়েছে মহাবিশ্ব, প্রকৃতি ও সমাজের ঘটনাবলি বিকাশের নিয়মানুগতা আবিষ্কারে, তাদের পারস্পরিক সম্পর্ক ও ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার উপলব্ধিতে, মানবিক বিধান, শৃঙ্খলা, আদর্শ ও সম্পর্কের মহাজাগতিক উৎস সন্ধানে। খিঃ পূঃ দু'হাজার বছরের যে প্রধান রচনাগুলি 'বেদ' এই সাধারণ নামে পরিচিত, তাদের মৌল বিষয়বস্তু হল এইটাই।

আর্যদের স্তোত্র নিয়ে সংকলিত সবচেয়ে পুরাতন বেদ ঋগ্বেদে বিশ্বের সমস্ত ঘটনাকে দেখা হয়েছে ঋতের, মহাজগতের সমস্ত শৃঙ্খলা ও নিয়মাদির অভিব্যক্তি হিশেবে।

ঋগ্বেদ অনুসারে ঋত আর সত্য সমধর্মী, একই বিশ্বসৃষ্টি প্রেরণা (তপস) থেকে তাদের উৎপত্তি। স্তোত্রে দ্রুতবর্ধমান 'ঋতের শক্তির' জয়গান করা হয়েছে, বলা হয়েছে যে ইন্দ্রদেব ঋত প্রবর্তন করে তা রক্ষা করছেন। সূর্যদেব মিত্র এবং আকাশের দেবতা বরুণও ঋতের রক্ষক ও অভিভাবক, ঋতের কল্যাণেই তাঁরা মহাবল।

স্তোত্রে মানবিক ব্যাপার-স্যাপার ও গৃহীত রীতিনীতিতে ঋতের প্রভাবের কথা আছে। ঋত লোককে কেবল খাদ্য জোগায় ও তাদের ধনবৃদ্ধি করে তাই নয়, আচরণের সঠিক পথও দেখায়: ঋতের প্রশস্তি 'এমনকি বধিরেরও কানে যায়', 'ঋত চিন্তা পাপ থেকে বাঁচায়,' 'ঋতের কল্যাণে পূজনীয় গরু আছে আমাদের'।

পার্থিব, মানবিক পারস্পরিক সম্পর্ক ও শৃঙ্খলাকে বেদে ঈশ্বরসৃষ্ট মহাবিশ্বের অঙ্গ বলে ধরা হয়েছে। যেমন, চতুর্বর্ণ, বেদের মতে, বাকি সমস্ত বিশ্বের মতোই দেবতারা সৃষ্টি করেছেন পুরুষ থেকে (বিশ্ব দেহ ও প্রাণ)। ব্রাহ্মণ হল তার মুখমণ্ডল, ক্ষত্রিয় তার বাহু, বৈশ্য তার জঙ্ঘা, শূদ্র তার পদতল।

সমাজের বিভিন্ন অংশের মধ্যে সোপানতান্ত্রিক পারস্পরিক সম্পর্কের যে ভাবনাটা পরে সমাজ গঠন বিষয়ক ধ্যানধারণায় অঙ্গীভূত ও প্রভাবশীল হয়ে ওঠে, এখানে আমরা তার একটা আদি প্রকারভেদ দেখতে পাচ্ছি।

ঐশ্বরিক সৃষ্টি ও জাগতিক নিয়ম দ্বারা সমাজব্যবস্থার পূর্বনির্ধারণ, বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সাধারণ শৃঙ্খলার সঙ্গে তার আনুরূপ্যে বিদ্যমান সামাজিক-রাজনৈতিক ও আইনী সম্পর্কগুলি একটা সর্বোচ্চ প্রতিষ্ঠায় ভূষিত হয়। এই ধরনের অতিকথামূলক-জৈব ধ্যানধারণা অনুসারে বিশ্ব নিয়ম নির্ধারিত করছে সমাজের গঠন, বিভিন্ন বর্ণের স্থান, ভূমিকা ও অবস্থা (বলাই বাহুল্য, রাজনৈতিক-আইনী অবস্থাও)। অতএব এইসব বর্ণের প্রতিটি সদস্যের অধিকার ও কর্তব্যও।

আদি হিন্দু সমাজের সমস্ত বর্ণের সদস্যরা নীতির দিক থেকে যদিও স্বাধীন, কেননা দাসেরা বর্ণের অন্তর্ভুক্ত নয়, কিন্তু বর্ণ নিজেই (এবং বলাই বাহুল্য, তার অন্তর্গত সমস্ত লোকে) সমাধিকারী নয়। প্রথম দুটি বর্ণ (পুরোহিত ব্রাহ্মণ এবং যোদ্ধা ক্ষত্রিয়) প্রভুত্বকারী, বাকি দুটি (বৈশ্য — কৃষক, কারুশিল্পী, বণিক যার অন্তর্গত এবং স্বাধীন নিচু মহলরূপী শূদ্র) অধীনস্থ বর্ণ। বর্ণের বিভিন্ন অবস্থার ব্যাখ্যা দেয়া ও ন্যায্যতা প্রমাণ করা হয়েছে পুরুষের বিভিন্ন অঙ্গ (মূল্য ও তাৎপর্যের দিক দিয়ে) থেকে তাদের উদ্ভব, তাতে করে অতিকথামূলক ধারণা অনুসারে প্রতিটি বর্ণের ও তার অন্তর্গত সদস্যদের স্থান ও কাজ পূর্বনির্ধারিত হয়ে যায়।

ঋত অনুসরণ ও বিশ্ব নিয়ম পালনে তাই প্রতিটি মানুষ কর্তৃক তার কর্তব্য ও দায়িত্বের কঠোর পালন বোঝায়, যা আসছে অধিবাসীদের বর্ণভেদ ব্যবস্থা থেকে, এবং তা থেকেই আসছে বর্ণ ও তার সদস্যদের প্রতি দাবি। মানুষের সামাজিক-রাজনৈতিক ও আইনী অবস্থা পূর্বনির্ধারিত হয়ে যাচ্ছে সে কোন বর্ণের লোক তাই দিয়ে, সেটা আবার বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের অপরিবর্তনীয় নিয়ম ও শৃঙ্খলা দ্বারা নির্ধারিত। এই সবকিছু মনে রাখলে খানিকটা শর্তাধীনভাবে বলা যায় যে ঋত হল বাস্তব ধর্মীয়, নৈতিক ও রাজনৈতিক-আইনী শৃঙ্খলা ও আচরণবিধির ভাবাদর্শীয়-নিয়ামক এবং সেইসঙ্গে সাংবিধানিক ভিত্তি, মূল আইন (সাংবিধানিক), যার কঠোর অনুসরণে গোটা জীবন সংগঠিত ও চালিত বলে ধরা হচ্ছে।

বেদে এইভাবে জোর দেয়া হয়েছে সাধারণ আবিশ্ব মহাজাগতিক নিয়মের (ঋত) ওপর, যা বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের ব্যবস্থা ও তার অবজেক্টিভ নিয়মানুগতা হওয়ায় তা সাধারণ নিয়ামনের ভূমিকা নিচ্ছে, যার কর্মক্ষেত্র ও

প্রভাবের মধ্যে পড়ছে লোকেদের আচার-আচরণও। লোকেদের পারস্পরিক সম্পর্ক ও আচরণের নির্ধারক হিশেবে ঋত (বিশ্ব নিয়ম) দেখা দিচ্ছে নৈতিক-আইনী নিয়ম রূপে। তাই আইনবোধের উদ্ভব ও বিবর্তনের প্রেক্ষিতে বিশ্ব নিয়মের (ঋতের) বৈদিক ধ্যানধারণাকে বিচার করলে তাকে বলা যায় বিশ্বব্যাপী স্বাভাবিক বিধির (অথবা স্বাভাবিক নিয়মের) অতিকথামূলক ভাষ্য।

মানবিক সম্পর্ক, রীতিনীতি ও আচরণবিধিকে বিশ্ব নিয়ম দিয়ে ব্যাখ্যা করার বৈদিক ধ্যানধারণা পরে বিকশিত হয় আরেকটি বিখ্যাত, প্রাচীন ভারতীয় চিন্তার আকরগ্রন্থ উপনিষদে, যা রচিত খ্রিঃ পূঃ ৯-৬ শতকে।

জ্ঞানের বিভিন্ন ক্ষেত্রের তালিকাদান প্রসঙ্গে (বেদ, ইতিবৃত্ত, যুক্তিবিদ্যা, পবিত্র জ্ঞানের বিদ্যা, সাংখ্যকশাস্ত্র, পূর্বপুরুষ পূজার নিয়ম ইত্যাদির সঙ্গে সঙ্গে) উপনিষদ 'আচরণবিধির' জ্ঞান সম্পর্কেও উল্লেখ করেছে। প্রসঙ্গ দেখে মনে হয় কথাটা হচ্ছে লোকেদের ঐহিক পারস্পরিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে আচরণের বিধি নিয়ে। মনে রাখা উচিত যে (উপনিষদের কালে এবং খোদ উপনিষদেও) ঐহিক ও ধর্মীয়ের মধ্যে কোনো সুস্পষ্ট সীমারেখা ছিল না। আচরণের সম্মিলিত বিধির মধ্যেও (বিশেষ করে অধিকার ও নৈতিকতার মধ্যে) কোনো সীমারেখা টানা হয় নি।

আলোচ্য নিয়মগুলিতে এমনসব বিষয় আছে যা পরে নৈতিকতা ও অধিকারে বিভিন্ন হয়ে ওঠে আর তার ঐহিক চরিত্র সত্যিই আপেক্ষিক, কেননা এইসব নিয়ম, তার বোধ, ব্যাখ্যা ও প্রয়োগ ছিল অতিকথামূলক ও ঈশ্বরতাত্ত্বিক ধারণার একান্ত প্রভাবাধীন।

লোকেদের আচরণ নির্ধারক বিধিকে উপনিষদে বোঝানো হয়েছে সংস্কৃত 'ধর্ম' কথাটা দিয়ে। গবেষকরা কথাটার বহু অর্থ লক্ষ করেছেন, অন্য ভাষায় তার সার্থক অনুবাদ সম্ভব নয়। অথচ ঐ অর্থটা শুধু উপনিষদ নয়, অন্যান্য প্রাচীন ভারতীয় আকরগ্রন্থ, যেমন, 'মনুসংহিতা' আর 'ধম্মপাদ' বোঝার পক্ষে চাবিকাঠি।

উপনিষদের কালে এবং আদি বৌদ্ধ সাহিত্যে 'ধর্ম' কথাটা 'সত্য' কথাটার কাছাকাছি এসেছে। সেইসঙ্গে বৃহৎ একটা সাহিত্যও দেখা দিয়েছে (ধর্মশাস্ত্র), যাতে 'ধর্ম' কথাটার কোনো কোনো বিশেষ দিক (রাজনৈতিক ও আইনী সমেত) আলোচিত হয়েছে।

একক বোধ হিশেবে 'ধর্ম' তাতে বিধৃত সমস্ত তাৎপর্যের চিন্তাগত ঐক্য। তবে এইসব অর্থগুলি (যেমন, 'ধর্ম' অর্থে পুণ্যকর্ম, সত্য, অধিকার, ন্যায়, আইন, বিধান, নিয়ম, কর্তব্য, বিচার, ধর্মীয় আচার, রীতিনীতি ইত্যাদি) কেবল একই বোধের পরস্পরনির্ভর, পরস্পরসংশ্লিষ্ট, পরস্পরকে সূচিত করা, বিভিন্ন অঙ্গাঙ্গি দিকের অর্থ। কথাটা যেহেতু 'ধর্মের' একক বোধের নানা দিক নিয়ে, তাই তার প্রাথমিক ঐক্যের পটভূমি থেকে কোনো একটা দিককে বার করে এনে আলাদাভাবে তার প্রয়োগ হল কেবল একটা আপেক্ষিক বিশ্লেষণী ক্রিয়া; প্রসঙ্গত, তা সম্ভব কেবল পরবর্তী কালে, অধিকতর বিকশিত তাত্ত্বিক ধারণা ও ভাষার অবস্থান থেকে।

তাই, বর্তমান কালে 'ধর্মের' অর্থ বিশ্লেষণ করে এবং তার অন্তর্ভুক্ত তাৎপর্যগুলিকে গ্রুপে ভাগ করে, সামাজিক চেতনার বিভিন্ন রূপ এবং সামাজিক নিয়ামনের বিভিন্ন প্রকার আদর্শ বিষয়ে আধুনিক ধারণার দৃষ্টিকোণ থেকে আপেক্ষিকভাবে বলা যায় যে 'ধর্ম' বলতে বোঝায় বিভিন্ন ব্যাপার — নৈতিক, আধিকারিক, বিধানিক, ধর্মীয়-নীতিশাস্ত্রীয় ইত্যাদি।

এরূপ বিচারে তার সুস্পষ্ট আপেক্ষিকতা (আধুনিক অবস্থান থেকে মূল্যায়ন) ছাড়াও একটা অপ্রকট আপেক্ষিকতাও ধরে নেয়া হয়, যা নিহিত এই ধরনের বিচারে এইরূপ স্বতঃসিদ্ধি যে নৈতিকতা, অধিকার, নিয়ম, ধর্মীয় সদাচার বুঝি বিভিন্ন এক-একটা জিনিস, এবং এতই বিভিন্ন যে তাতে কোনো গোষ্ঠীর কাঠামোর মধ্যে তাদের আধুনিক ঐক্যই শুধু নাকচ হয় না, তাদের আদি ঐক্যের সঠিকতাতেও সন্দেহ জাগে।*

তবে এটা দৃষ্টিচ্যুত করা উচিত নয় যে নৈতিকতা, অধিকার, বিধান, ভাবাদর্শ, ধর্ম ইত্যাদির আধুনিক প্রভেদীকরণেও সামাজিক চেতনার বিভিন্ন রূপ হিশেবে, উপরিকাঠামো বিষয়ক বিভিন্ন ব্যাপার হিশেবে তাদের ঐক্যের দ্বান্দ্বিক দিকটাও (পার্থক্যের ঐক্য) ধরে নেয়া হয়। তাই বলা যেতে পারে যে এইসব পৃথক ব্যাপার (নৈতিকতা, অধিকার, আইনপ্রণয়ন, ধর্ম, ভাবাদর্শ ইত্যাদি) 'উপরিকাঠামোর' একক বোধ, 'সামাজিক চেতনার, রূপ'

ইত্যাদির একক বোধের মধ্যে পড়ে। তাই পরস্পরসংশ্লিষ্ট বিভিন্ন ব্যাপারের (ও অর্থের) ঐক্য জিনিসটাই হল প্রজ্ঞান প্রক্রিয়ার অপরিহার্য দিক, মোটেই তার কোনো একটা আদি স্তরের ত্রুটি নয়।

আধুনিক পরিস্থিতিতে বিভিন্ন ব্যাপার এবং তাদের পরস্পরসম্পর্কের বোধাশ্রিত ঐক্য, বলাই বাহুল্য, প্রকাশ পায় পূর্ববর্তী যুগগুলির চেয়ে অন্য তাত্ত্বিক মানে এবং অন্য রূপে, তাহলেও প্রকাশ পায় এবং এই ঘটনাটা মানবিক প্রজ্ঞান ও সংস্কৃতির ইতিহাসে, দার্শনিক, সামাজিক, রাজনৈতিক-আইনী চিন্তার ইতিহাসে ধারাবাহিকতা ও নূতনত্বের মধ্যে দ্বান্দ্বিকতার প্রোজ্জ্বল সাক্ষ্য। যেমন, বর্তমান পরিস্থিতিতে অধিকারের ওপর নৈতিকতার প্রভাব, অধিকারের নৈতিকতা, তার মানগুলির নৈতিক প্রতিপাদন কোনো সন্দেহের উদ্রেক করে না। কিন্তু এরূপ প্রভাব পারস্পরিক। নৈতিকতার স্বাভাবিক ক্রিয়াও সম্ভব নয় নৈতিক মূল্যবোধের পেছনে আধিকারিক সমর্থন ছাড়া, আইন দ্বারা ব্যক্তির নৈতিক স্বাধীনতার ক্ষেত্রটার ও তার অভ্যন্তরীণ আত্মিক প্রবণতার স্বীকৃতি ও রক্ষণ ছাড়া। বোঝাই যায় যে আধুনিক পরিস্থিতিতে যখন শুধু নৈতিকতা নয়, অধিকার ও আইনপ্রণয়নও হল লোকেদের সামাজিক সম্পর্ক ও আচরণ নিয়ামনের অবজেকটিভভাবে প্রয়োজনীয় রূপ, তখন এই রূপগুলি পরস্পরকেও প্রভাবিত করবে, পৃথক ও বিচ্ছিন্ন হয়ে তা থাকতে পারে না।

'ধর্ম' কথাটার বিভিন্ন তাৎপর্যের ঐক্যের যা বৈশিষ্ট্য, সেটা নির্দিষ্ট হচ্ছে এইসব বিভিন্ন তাৎপর্যের পরস্পরসম্পর্কের স্বকীয়তা, একটা বোধের পরিধির মধ্যে তাদের মিলনের নিজস্ব চরিত্র ও পদ্ধতি দিয়ে। একটু বিশদে ব্যাখ্যা করা যাক। বিভিন্ন প্রসঙ্গে ও ক্ষেত্রে যা আমরা আগে দেখেছি, 'ধর্ম' কথাটায় বোঝানো হয়েছে কখনো সদাচার, কখনো বাধ্যতা, কখনো সত্য, কখনো ন্যায়, কখনো অধিকার, কখনো আইন, কখনো বিচার, কখনো কর্তব্য, কখনো ধর্মকর্ম, কখনো নিয়ম ইত্যাদি।

কিন্তু এই সমস্ত ক্ষেত্রে কথাটা যখন 'ধর্মের' বিভিন্ন প্রকাশ (তাৎপর্য) নিয়ে, তখন আমাদের সামনে থাকছে একই প্রেরণা ও নীতি। অংশত, এর অর্থ, 'ধর্ম' যেখানে প্রকাশ পাচ্ছে, দৃষ্টান্তস্বরূপ, 'সদাচার' রূপে (অর্থাৎ আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গি থেকে একটা নৈতিক ব্যাপার হিশেবে), সেখানে এই 'সদাচারের' (সমস্ত 'ধর্মের' প্রকাশ হিশেবে, সুতরাং বর্তমান ক্ষেত্রে স্বয়ং 'ধর্মই') মধ্যে পড়ে এবং তাতে বোঝায় 'ধর্মের' অন্য সমস্ত তাৎপর্য, অর্থ ও বৈশিষ্ট্য। সুতরাং 'ধর্ম' হিশেবে 'সদাচার' হল 'কর্তব্য'ও, 'বাধ্যতা'ও, 'সত্য'ও,

'ন্যায়'ও, 'আইন'ও অধিকার'ও 'বিচার'ও (অর্থাৎ তার অস্তিত্বের বৈশিষ্ট্য), 'ধর্মকর্ম'ও ইত্যাদি।

'ধর্ম' কথাটার অন্য তাৎপর্য ধরলেও ব্যাপারটা একই দাঁড়ায়: প্রত্যেকটা আলাদা আলাদা তাৎপর্য সমগ্রের প্রকাশ হিশেবে তার অন্যান্য অংশের গুণও ধারণ করে।

উপনিষদ, 'মনুসংহিতা', 'ধম্মপাদ' প্রভৃতি যেসব গ্রন্থের লেখকেরা 'ধর্ম' সংজ্ঞাটার নিকট আবেদন করেছেন, তাতে নিহিত আইনী বৈশিষ্ট্যের পক্ষে বড়ো একটা ভূমিকা নেয় ধর্মের আইনী তাৎপর্য। আইনে এক্ষেত্রে তেমন সব বৈশিষ্ট্যই বর্তমান যা আছে সত্য, ন্যায়, বিচার, বিধি, মহাবিধি, দায়িত্ব, নিয়ম, আইনপ্রণয়ন, অর্পিত দায়িত্ব, রীতিনীতি, রূপ (সম্পর্কাদির, বিশেষ করে বিবাহের), কর্মকল্প, কর্তব্য, সদাচার, নৈতিক প্রত্যয়, কারুণ্য, ধর্মকর্ম ইত্যাদিতে।

ধর্ম-আইন ধ্যানধারণাটা থেকে আইনে যেসব নৈতিক-সাধুতাশ্রয়ী ও ধর্মীয়-নীতিশাস্ত্রীয় দিক বর্তায়, তাতে সমগ্রভাবে প্রকাশ পায় ভাবাদর্শের দিক থেকে (অর্থাৎ, তখনকার পরিস্থিতিতে নৈতিক ও ধর্মীয় দিক থেকে) সত্য ও ন্যায় হিশেবে আইনের পবিত্রকরণ। এ ছাড়াও, উক্ত ধ্যানধারণা অনুসারে আইনে আছে পুরো একসারি আরো সুনির্দিষ্ট অন্য অনেক বৈশিষ্ট্য। ধর্মরূপী আইন এখানে দেখা দিচ্ছে আদিষ্ট দায়িত্ব এবং বাধ্যতামূলকভাবে পালনীয় সর্বজনীন মহাবিধি হিশেবে (আইনের সর্বজনীন বাধ্যবাধকতা ও বৈধ শক্তির ধারণা), নিয়ম ও আইনসঙ্গত বিধি হিশেবে (আইন ও বিধির মানদণ্ডাশ্রয়ী কাঠামোর ধারণা), সম্পর্কাদির রূপ ও ক্রিয়ার নিদর্শন হিশেবে (সম্পর্কাদির আইনী রূপের দিকে মনোযোগ), রীতিনীতি হিশেবে (রীতিনীতির আইনী চরিত্রের ধারণা, অর্থাৎ স্বাভাবিক আইনের ধারণা, আইন ইতিমধ্যেই দানা বেঁধে ওঠা এবং রীতিনীতিতে প্রচলিত কিছু একটা বলে ভাবনা), প্রত্যয় হিশেবে (আইনকে একটা আত্মিক ব্যাপার বলে দেখা, আইনী চেতনার ধারণা), বিচার-ব্যবস্থা হিশেবে (বিচারকার্য -- আইন প্রতিষ্ঠার উপায়) ইত্যাদি।

ঋতকে মহাবিশ্ব নিয়ম হিশেবে দেখার বৈদিক ধ্যানধারণার তুলনায় উপনিষদের ধর্ম প্রতিটি স্বতন্ত্র লোকের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য একটা ব্যক্তিগত রূপ নিয়েছে। যেমন, উপনিষদে বলা হয়েছে: 'সত্যই ভূতাত্মনের জন্য এটা (মঙ্গলজনক) পন্থা: বেদের জ্ঞান অর্জন, নিজের ধর্ম অনুসরণ, নিজের আশ্রম পালন। সত্যই এটা স্বয়ং ধর্মেরই নিয়ম, বাকিগুলি (অনুরূপ)

কাণ্ডের শাখাপ্রশাখা। এর কল্যাণে (মানুষ) স্থান পায় ঊর্ধ্বে অথবা (নেমে যায়) নিচে। বেদে ঘোষিত এই তোমার ধর্ম। নিজের ধর্ম লঙ্ঘন করে (কোনো) আশ্রমের অন্তর্ভুক্ত হওয়া যায় না।'

বেদ এবং তার প্রামাণিকতার নজির দিয়ে উপনিষদে ধর্মের ব্যাখ্যায় প্রমাণিত হয় যে ধর্ম (আইনের অর্থে, অর্থাৎ ধর্মরূপী আইনও) বৈদিক ঋত অনুসারী। এতে করে ধর্মরূপী আইন হয়ে দাঁড়ায় দেবতাদের মধ্যে, বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে, মানব সমাজে শৃঙ্খলা নির্ধারক সর্বজনীন ঐশ্বরিক নিয়মের মানবিক প্রতিসরণ ও ব্যক্তিগত অভিব্যক্তি।

উপনিষদের ধর্মে, আমরা যা দেখেছি, অধিকার হল একইসঙ্গে দায়িত্ব ও কর্তব্যও।

প্রতিটি লোককে যে তার নিজস্ব ধর্ম দেয়া হচ্ছে, তাতে সেইসঙ্গে বোঝায় যে প্রত্যেকের আছে নিজ নিজ (বিষয়ীগত) দায়িত্ব-অধিকার, কর্তব্য-অধিকার। সমস্ত লোককে তাদের নিজ নিজ ধর্ম-অধিকার (দায়িত্ব-অধিকার) ভাগ করে দেয়াটা হল সমস্ত লোকের ক্ষেত্রে ঋতের, বিশ্ব নিয়মের সর্বজনীন, সর্বব্যাপী, সর্বত্রপ্রবিষ্ট তাৎপর্যের প্রতিষ্ঠা ও রূপায়ণ। ঋতের এই সর্বজনীনতার অন্য প্রকাশ হল যা আমরা দেখেছি, বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে (অর্থাৎ সমগ্রভাবে প্রকৃতিতে, মহাজগতে) নিয়মসঙ্গতি।

সবকিছুই যেহেতু উদ্ভব- ও তাৎপর্যসূত্রে ঐশ্বরিক বিশ্বজনীন নিয়মে (ঋত) অনুপ্রবিষ্ট ও পূর্বনির্ধারিত, তাই ব্যক্তিগত ধর্ম-অধিকার ঋতের অভিব্যক্তি হওয়ায় প্রকৃতির নিয়মানুগত্যের অনুসারী, যেটাও ঋতের আত্মপ্রকাশের একটা ক্ষেত্র ও রূপ। তবে এইটে মনে রাখা উচিত যে ধর্ম-অধিকারের যে ধারণায় স্বভাবতই প্রকৃতির সঙ্গে, তার নিয়মবন্ধনের সঙ্গে (অর্থাৎ তখনো যে ঋত বস্তুগত নিয়ম হিশেবে বিশিষ্ট হয় নি তার প্রাকৃতিক, স্বাভাবিক নিয়ম হিশেবে প্রকাশ) সাযুজ্যশীলতা থাকছে, উৎস হিশেবে তা নির্ভর করছে প্রাকৃতিক-স্বাভাবিক নীতির ওপর নয়, ঐশ্বরিক প্রেরণায়।

ব্যক্তিগত-মানবিক ধর্ম-অধিকার ও ঋতের (বিশ্বজনীন ঐশ্বরিক নিয়ম ও বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের প্রাকৃতিক নিয়মানুগতা) মধ্যে ঐশ্বরিক, প্রাকৃতিক ও মানবিক সহসম্পর্ক এমন যে নিয়মানুগতা এবং সাধারণভাবে আইনসঙ্গতির (বলাই বাহুল্য সমস্ত সত্য, নৈতিক ও আইনী তার অন্তর্গত) উৎস (এবং সেইসঙ্গে গ্যারাণ্টি) হল ঐশ্বরিক নীতিই।

এই উৎস, যা শর্তহীন ও স্বাধীন একটা ভিত্তিভূমির (আইনপ্রণয়নী,

শৃঙ্খলাবিধায়ক ও নিয়ামক নীতি) তুলনায় বাকি সবকিছু, প্রকৃতি ও মানুষও গৌণ, সাপেক্ষ, তারা স্বায়ত্তাধীন ও স্বয়ংনিয়ামক নয়: এইসব গৌণ ও অস্বাধীন ক্ষেত্রে যে নিয়মানুগতা সক্রিয় (ধর্ম সমেত), তা কেবল ঐশ্বরিক নিয়ম (ঋত) দ্বারা শর্তবদ্ধ, প্রকৃতি অথবা লোকেদের (মানব সমাজের) নিজস্ব নিজস্ব নিয়ম দ্বারা চালিত নয়।

সেইসঙ্গে ভবিষ্যতে প্রজ্ঞানের গভীরতা ও আইনবোধের বিকাশক্রমে প্রকৃতি ও মানব সমাজে নিয়মানুক্রম স্বীকারের মাধ্যমে ঐশ্বরিক নিয়মের সর্বব্যাপ্তিকে মূর্ত করাটাই খুবই তাৎপর্যপূর্ণ। প্রকৃতি ও সমাজের স্বাধীনতা ও স্বায়ত্তচালনা বিষয়ে পরবর্তী ধারণা, সুতরাং প্রাকৃতিক (স্বাভাবিক) ও সামাজিক-মানবিক বিশেষ (ঐশ্বরিক নয়) নিয়মিতি ও নিয়মের অস্তিত্ব যে আছে সে ধারণা গড়ে ওঠার পক্ষে এরূপ স্বীকৃতি অপরিহার্য যাত্রাবিন্দু। অধিকার ও নিয়মের মধ্যে সম্পর্ক, মানবিক বোধগুলির মধ্যে স্বাভাবিক ও আপেক্ষিকের মধ্যে সম্পর্ক ইত্যাদি বিষয়ে কোনো একটা অনুমানের পেছনে থাকে সেরূপ ধারণা।

ধর্ম-আইনের দাবি মেনে চলার আবশ্যিকতা (এক-একটা বর্ণের সদস্যদের নিকট সমস্ত দাবিও তার অন্তর্গত) উপনিষদে প্রতিপন্ন করা হয়েছে আত্মার দেহান্তরণ (সংসার) ও অতীত কার্যের প্রতিফল (কর্ম) বিষয়ক ধারণা দিয়ে। সাহিত্যে উল্লেখ করা হয়েছে যে এইসব ধ্যানধারণার ধর্মীয়-ভাববাদী বিষয়বস্তুর সঙ্গে সঙ্গে যুক্তিবাদী দিকও আছে: যথা, মানবিক আচরণ শৃঙ্খলায় কার্য-কারণ সম্পর্ক প্রতিষ্ঠার প্রয়াস, চেতনা ও অভিপ্রায়ের ওপর, মানুষের সামাজিক অবস্থানের ওপর ক্রিয়াকলাপের নির্ভরতা।

ভারতীয় মহাকাব্য 'মহাভারত' (আনুঃ খ্রিঃ পূঃ ৭ম শতক) অনুসারে লোকেদের বিভিন্ন অবস্থা ও দায়িত্ব (ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য বা শূদ্র হিশেবে) উদ্ভূত হয়েছে 'নিজস্ব স্বভাব' থেকে:

> 'প্রাজ্ঞরাও আচরণ করেন নিজেদের স্বভাব অনুসারে:
> সমস্ত জীব স্বভাবে বিদ্যমান; প্রতিরোধে কী ফল?..
> স্বধর্ম যদি গুণহীনও হয়, তাহলেও তা উত্তমরূপে অনুষ্ঠিত
> পরধর্মের চেয়ে শ্রেয়।
> স্বধর্মে নিধনও ভালো, কিন্তু পরধর্ম ভয়াবহ...'

তবে লোকদের এই 'নিজস্ব স্বভাব' যা ধর্ম থেকে অভিন্ন, তা আসলে স্বয়ংচালিত নয়, ঐশ্বরিক প্রকৃতির প্রতিফলন মাত্র। যেমন 'মহাভারতের' 'ভগবদ্‌গীতা' পর্বে শ্রী ভগবান (শ্রীকৃষ্ণ) বলছেন:

'ক্ষিতি, অপ্, তেজঃ, মরুৎ, ব্যোম, মানস, বুদ্ধি,
ব্যক্তিসত্তা — এই আমার প্রকৃতির অষ্ট বিভাগ;
এটা নিম্নতন; কিন্তু আমার অন্যতর উচ্চতন প্রকৃতির জ্ঞানলাভ করো...
অচিরস্থায়ী এই বিশ্বের আমিই আদি, আমিই অন্ত...
আমার কাছ থেকেই সত্ত্ব, তমঃ, রজঃ গুণ।
আমি তাদের মধ্যে না থাকলে তারা থাকবে আমার মধ্যে,
এটা উপলব্ধি করো।'

স্বেচ্ছাচার ভুল ও ব্যর্থ: 'নিজস্ব স্বভাবে' চালিত এবং স্বধর্ম ও স্বকর্মের সঙ্গে জড়িত মানুষ, অনুরূপ ধারণা অনুযায়ী ইচ্ছা ব্যতিরেকেও তাই করে মোহবশে যা করতে চায় না।

বেদ এবং উপনিষদে ধর্মের যে ধারণা প্রকাশ পেয়েছে, তা নিঃসন্দেহেই প্রাচীন ভারতের রাজনৈতিক-আইনী চিন্তা ও কর্মকে প্রভাবিত করেছে। জীবনের সর্বক্ষেত্রে (আত্মিক ও রাজনীতি-আইনী সমেত) ব্রাহ্মণদের প্রাধান্য থেকে এসেছে তখনকার সামাজিক জীবন, আইন-দান ও আইন-প্রয়োগের এই ধ্যানধারণার ব্রহ্মণ্য ব্যাখ্যা ও ভাষ্যের (একমাত্র না হলেও) প্রাধান্যকারী তাৎপর্য।

ব্রহ্মণ্যতার লক্ষণীয় প্রভাবে (ভাবগত ও ব্যবহারিক) বেড়ে উঠতে থাকে, যেমন জায়মান বিধান-দান ব্যবস্থা, তেমনি সাধারণ আইন, যাকে ব্যাখ্যার আবশ্যিকতা থেকে দেখা দেয় ধর্ম বিষয়ে ব্রহ্মণ্য ধারণার প্রতিপাদন ও প্রতিষ্ঠার বিস্তৃত পরিসর। এই ক্ষেত্রে ব্রহ্মণ্যবাদ অন্যান্য ভাবাদর্শীয় ধারার বিরুদ্ধে, ধর্ম বিষয়ে বিভিন্ন বেদবিরোধী ধারণার বিরুদ্ধে (বিশেষ করে বৌদ্ধধর্ম, চার্বাক ইত্যাদির বিরুদ্ধে) তীব্র সংগ্রাম চালায়।

রাজনৈতিক-আইনী ক্ষেত্রে ব্রহ্মণ্যবাদের প্রতিপত্তির সাক্ষ্য দেয় অসংখ্য ধর্মসূত্র, বিভিন্ন ব্রাহ্মণ গোষ্ঠী রচিত লিপিবদ্ধ আইনী সংহিতা।

এইসব সংহিতায় আছে বলবৎ করা (সর্বাগ্রে সাধারণ) আইনের আদর্শাদির তালিকা ও ব্যাখ্যা।

ধর্মসূত্রের ভিত্তিতে পরে গড়ে ওঠে ধর্মশাস্ত্রগুলি, আইনী বিষয়ের উত্থাপন ও ব্যাখ্যায় বেশি প্রণালীবদ্ধতা ও শৃংখলা তাদের বৈশিষ্ট্য। যেমন, মনে করা হয় যে 'মনুসংহিতা' (মনুর ধর্মশাস্ত্র) লিখিতাকারে সংকলিত

হয় আনুমানিক খ্রিঃ পূঃ ২ থেকে ২ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে, তা রচিত প্রাচীনতর কোনো ধর্মসূত্রের ভিত্তিতে।

ধর্মসূত্র ও ধর্মশাস্ত্রগুলি আইনী আদর্শের আদি নিয়মবন্ধন হিশেবে অনিবার্যতই বহন করেছে তার সংকলক-টীকাকারদের ভাবাদর্শীয় প্রভাব ও বিধানিক নূতনত্বের ছাপ,* ব্রাহ্মণদের সম্প্রদায়বিশেষের অভ্যন্তরে ব্যবহার্য কোনো সাধারণ পাঠ্যপুস্তক বা লিখিত বক্তৃতামালার চেয়ে তা অনেক বড়ো কিছু। সে সময়কার পরিস্থিতিতে এগুলি অন্যান্য কাজের (বিদ্যাচর্চা, অধ্যাপনা ধরনের) সঙ্গে সঙ্গে বলবৎ করা আইনের প্রামাণিক আকর গ্রন্থেরও ভূমিকা পালন করেছে।

এই প্রামাণিকতা নির্দিষ্ট ও সংহত হয়েছিল আত্মিক জীবন ও ক্রিয়াকর্মের নির্ধারক ক্ষেত্রগুলিতে ব্রাহ্মণদের প্রাধান্য দ্বারা। রাজক্ষমতার ওপর, তার রাজনৈতিক ও আইনপ্রণয়নী ক্রিয়াকলাপের ওপর নির্ধারক প্রভাব ফেলত ব্রাহ্মণেরা, সমস্ত রাজনৈতিক ও ধর্মীয় পরিচালক পদে অধিষ্ঠিত থাকত, তাদের হাতে ছিল বিচারালয়, ইত্যাদি। এরূপ পরিস্থিতিতে সরকারিভাবে স্বীকৃত ব্রাহ্মণসম্প্রদায়ের ভাবাদর্শী ও তাত্ত্বিকদের দ্বারা ধর্মসূত্র ও ধর্মশাস্ত্রের রচনাটাই ধারণ করেছিল বলবৎ আইনাদির আদর্শ কোডবদ্ধ করার ক্ষেত্রে অবশ্য-অবশ্যই, ভাবাদর্শ ও রাজনীতির দিক থেকে বিধিবদ্ধ (কার্যত এবং বাস্তবত, সম্পর্কাদির গোটা ব্যবস্থা দিয়েই কোনো একটা আনুষ্ঠানিক বিধান দ্বারা নয়) সরকারি ক্রিয়াকলাপের চরিত্র। সেইসঙ্গে ভোলা অনুচিত যে কথাটা যে সময় নিয়ে, তখন আইনের আদর্শের অন্য ধরনের লিখিত তালিকা ছিল না (বিরল ব্যতিক্রম বাদে)।

সেই কারণে বলবৎ হয়ে যাওয়া আইনের আদর্শের উৎস হিশেবে ধর্মশাস্ত্র ও ধর্মসূত্রের তাৎপর্য নাকচ করা ঠিক নয় বলে মনে হয়।

'মনুসংহিতা'র ভিত্তিতে আছে আইন সম্পর্কে এই যে বোধ তা হল নিঃসন্দেহে পালনীয় ও বলবৎ সেইসব আচরণবিধির সমষ্টি যাতে প্রকাশ পাচ্ছে ধর্ম — বর্ণ ব্যবস্থা, তার সভ্যদের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক ইত্যাদি সমেত সমস্ত ব্যাপারের ঐশ্বরিক শৃঙ্খলা। সরকারি গুরুত্ব থাকায় সাধারণ আইনের আদর্শের তালিকা — 'মনুসংহিতা' কার্যকরী আইনের কোঠায় পড়ে। কিন্তু আইনের এই আকরের পক্ষে আইনী যে ধারণাটা উৎসস্বরূপ,

তার কথা ধরলে পরিষ্কার বোঝাই যায় যে সেটা ঐশ্বরিক শাসনের চরিত্র বহন করে, বিধানগুলিকে সরাসরি মনুষ্যজাতির আদি পিতা, ভগবান মনুর ওপর চাপানো হয়।

ন্যায় ও অন্যায় (ধর্ম ও অধর্মের) মধ্যে তফাৎটাকেই ধরা হয় ঐশ্বরিক সৃষ্টির ফল বলে: 'সৃষ্টির সময় প্রত্যেকের জন্য তিনি যে গুণ ধার্য করে দেন — অনিষ্টকরতা বা নিরীহতা, কোমলতা বা কঠোরতা, ধর্ম বা অধর্ম, সত্য বা অসত্য, সেটা আপনা থেকেই তার মধ্যে প্রবেশ করেছে' ('মনুসংহিতা', এক, ২৯)। সুতরাং এই ধারণা অনুসারে জন্মগত আধিকারিক গুণটা স্বতঃচালিত-স্বাভাবিক নয়, প্রাপ্ত, প্রকৃতিশাসিত নয়; ঈশ্বরশাসিত।

বর্ণের ক্রমপর্যায়, বর্ণসদস্যদের অধিকার ও কর্তব্য স্থির করে দিয়ে ব্রাহ্মণদের বিশেষ সুবিধা ও ঐকান্তিক এক্তিয়ারকে 'মনুসংহিতা' অন্যান্য বর্ণের প্রতিনিধিদের নিকট তার অনুজ্ঞা বলে অভিহিত করেছে। সংহিতায় (এক, ১০২, ১০৩) এই কথায় জোর দেয়া হয়েছে যে ব্রাহ্মণ ও অন্যান্য লোকেদের কর্তব্য নির্ধারণের উদ্দেশ্যে মনু রচিত এই শাস্ত্র 'খুঁটিয়ে পাঠ করতে হবে এবং শিষ্যদের তা সঠিকভাবে পাঠ করাবেন আর কেউ নয় (কেবল) পণ্ডিত ব্রাহ্মণ'। আধুনিক ভাষায় তর্জমা করলে এখানে 'মনুসংহিতা' সম্পর্কে ব্রাহ্মণদের স্রেফ বিদ্যাবত্তা ও অধ্যাপনা গুণের চেয়েও বেশি কিছু বলা হয়েছে: আসলে কথাটা হচ্ছে ধর্মশাস্ত্র ব্যাখ্যায় ব্রাহ্মণদের একচেটিয়া অধিকার নিয়ে, যা অনুরূপ পরিস্থিতিতে খোদ ধর্মের ভাষ্য, অর্থাৎ অধিকার ও কর্তব্য কী তা স্থির করে দেয়া অনিবার্য। বহুকাল ধরে প্রচলিত ও বৈদিক যুগ থেকে উদ্ভূত বিভিন্ন বর্ণের মধ্যে শ্রমবিভাগের এই ধরনের ধারণায়, বলাই বাহুল্য, আইনের সমস্ত বিস্তৃত ও সীমাহীন ক্ষেত্রে ব্রহ্মণ্য কর্তৃত্বের চরিত্র স্বাভাবিক ও সরকারি বলে ধরে নেয়া হয়, সন্দেহ নেই যে ধর্ম সম্বন্ধে নির্দেশ রচনাও (ধর্মশাস্ত্র) তার অন্তর্গত।

'মনুসংহিতা' থেকে আরো কয়েকটি অনুশাসন (এক, ৯৮-১০০) তুলে দেয়া যাক, যাতে ধর্মের নির্দেশ, ব্যাখ্যা ও রক্ষার প্রশ্নে ব্রাহ্মণদের কর্তৃত্বমূলক প্রতিষ্ঠা ও তাদের অধিকারের ঐকান্তিক চরিত্র সমর্থিত হয়েছে। 'ব্রাহ্মণের জন্মই হল ধর্মের শাশ্বত আবির্ভাব, কেননা সে জন্মেছে ধর্মের জন্য, তার কাজ ব্রহ্মার সঙ্গে এক হয়ে যাওয়া। ধর্মের রত্নভাণ্ডার রক্ষার জন্য জন্ম নিয়ে ব্রাহ্মণ সমস্ত জীবের প্রভু হিশেবে পৃথিবীতে সর্বোচ্চ স্থানে অধিষ্ঠিত। বিশ্বে যাকিছু বিদ্যমান তা ব্রাহ্মণের সম্পত্তি; জন্মের শ্রেষ্ঠত্ব হেতু এই সবকিছুর ওপর ব্রাহ্মণের অধিকার।'

লক্ষ্য করার বিষয় যে রাজার সমস্ত উচ্চ, এমনকি ঐশ্বরিক প্রতিষ্ঠা সত্ত্বেও 'মনুসংহিতা' অনুসারে (সাত, ৩৭, ৪৩) তাকে ব্রাহ্মণদের পূজা করতে হবে, তাদের উপদেশ ও নির্দেশ পালন করতে হবে (বলা বাহুল্য, ধর্মের প্রশ্নেও), তাদের কাছ থেকে নিতে হবে বেদের জ্ঞান এবং 'শাসনের আদ্য বিদ্যা'। রাজার (তার কর্মচারীদেরও) প্রধান কাজ হল বর্ণ ব্যবস্থা এবং যারা স্বধর্ম অনুসরণ করে তাদের সবাইকে রক্ষা করা। 'মনুসংহিতা'য় (সাত, ৩৯-৪৬) রাজাকে উদ্বুদ্ধ করা হয়েছে বিনয়ী হতে (ব্রাহ্মণ এবং তাদের নির্দেশগুলির ক্ষেত্রে), ভয় দেখানো হয়েছে যে বিপরীত ক্ষেত্রে ঐশ্বর্য, ধর্ম, এমনকি আত্মাও তাকে ত্যাগ করে যাবে।

রাজকর্মচারীদের নির্বাচন করবে রাজা এবং তাদের যে যে গুণ থাকা চাই, 'মনুসংহিতা'য় (সাত, ৫৪) তার মধ্যে বিশেষ করে বলা হয়েছে শাস্ত্রজ্ঞানের কথা।

এসব থেকে কোনো সন্দেহ থাকে না যে ব্রহ্মণ্য ধর্মশাস্ত্রের ('মনুসংহিতা'ও তার অন্তর্গত) একটা আচরণবিধির বাধ্যতামূলক সরকারি উৎসরূপ প্রতিষ্ঠা ছিল, তাকে বিধিবদ্ধ করার জন্য কোনো একটা আনুষ্ঠানিক বিশেষ আইনের প্রয়োজন হয় নি। উল্টে বরং, রাজা এবং তার ব্যবস্থাদিরই প্রয়োজন হত ব্রাহ্মণদের দ্বারা বৈধকরণের। যেমন, রাজার 'উচিত গুরুগৃহ থেকে প্রত্যাগত ব্রাহ্মণদের শ্রদ্ধা করা, কেননা যে ধন ব্রাহ্মণদের দেওয়া হবে, রাজার পক্ষে তা অক্ষয়' ('মনুসংহিতা', সাত, ৮২)। যদি মনে রাখা হয় যে ব্রহ্মণ্য আশ্রম থেকে আগত স্নাতকদের কথা বলা হচ্ছে, তাহলে সেই আশ্রমগুলিই যে কী বিপুল প্রতিষ্ঠা ভোগ করত তা বোঝা যায়; প্রসঙ্গত, ধর্মশাস্ত্র ও ধর্মসূত্রগুলিও রচিত হয়েছে ওইসব আশ্রমেই।

'মনুসংহিতা'য় যুগে যুগে ধর্মের পরিবর্তনশীলতার কথা আলোচিত হয়েছে। 'যুগগুলির সংক্ষেপণ অনুসারে কৃত যুগে এক ধর্ম, ত্রেতা ও দ্বাপরে অন্য, ভিন্ন ধর্ম কলিযুগে। কৃত যুগে প্রধান বলে ঘোষণা করা হয়েছে কৃচ্ছ্রসাধনাকে, ত্রেতায় জ্ঞান, দ্বাপরে যজ্ঞ আর কলিতে শুধুই উদারতা' ('মনুসংহিতা', এক, ৮৫-৮৬)। কালক্রমে ধর্মের এই পরিবর্তনশীলতার সঙ্গে সঙ্গে যা ঘটে জীবনযাত্রা ও আচরণের মূল নীতির (যুগসূচক) পালা বদল ছাড়া 'মনুসংহিতা'য় ধর্ম থেকে অধর্মের দিকে বিবর্তনের উল্লেখ করা হয়েছে। 'কৃত যুগে ধর্ম চতুষ্পদ ও পরিপূর্ণ, সত্যও তাই; অধর্ম থেকে লোকেদের কোনো লাভ হত না। অন্য (যুগে) লোভের (আকাঙ্ক্ষার) ফলে ধর্মের একটি করে পা খোয়া যায়; চৌরিকা, অনৃত

ও মায়ার ফলে এক-একচতুর্থাংশ করে ধর্ম অন্তর্ধান করে' ('মনুসংহিতা', এক, ৮১-৮২)।

ধর্মের অনুরূপ অধঃপতন মনে করিয়ে দেয় অন্যান্য জাতির অতিকথামূলক কল্পনা যাতে বলা হয় যে সত্য ও ন্যায়ের আদি 'স্বর্ণযুগের' স্থলে পরে এসেছে অন্যায়, হিংসা, মিথ্যা ও বলপ্রয়োগ (তাম্র ও লৌহ যুগ)।

বর্ণ ও তার সভ্যদের অসাম্যের ধারণা 'মনুসংহিতা'য় বিধৃত। সর্বোপায়ে এরূপ অসাম্যের ন্যায্যতা প্রতিপাদন করা হয়েছে বর্ণ ব্যবস্থার ঐশ্বরিক পূর্বনির্ধারণ, এবং সুতরাং প্রতিটি বর্ণের সভ্যদের যা উচিত এবং ঐশ্বরিক ধর্মে যা অন্তর্নিহিত তার শর্তহীন পালনের উল্লেখ করে।

এক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ বলে ধরা হয়েছে শাস্তির ভূমিকা, 'মনুসংহিতা' অনুসারে (সাত, ১৪) তারও ঐশ্বরিক প্রতিষ্ঠা আছে, এমনকি ঐশ্বরিক প্রভুর সে পুত্রই। নিজের ঐশ্বরিক পুত্ররূপে দেবত্বে মূর্তিমান হয়ে শাস্তি হল মায়ার সরাসরি বিপরীত, নিজের পার্থিব চেহারায় শাস্তি হল দণ্ড। এই অর্থে 'শাসনবিদ্যা' হল দণ্ডনীতি, যাতে বোঝায় 'লাঠি দিয়ে (রাজ্য) চালনা'।

মূর্তিমান ধর্ম হিশেবে, সমস্ত জীব, দেব ও মানবের রক্ষক শাস্তির সত্যিকার এক প্রশস্তি আছে 'মনুসংহিতা'য় (সাত, ১৪-৩৩)। এই দণ্ড স্তুতির কয়েকটা উদ্ধৃতি: 'দণ্ড রাজা, সে পুরুষ, সে নায়ক, সে শাস্তিদাতা; চতুরাশ্রমের রক্ষক বলে সে গণ্য। দণ্ডই সমস্ত লোককে চালায়, দণ্ডই রক্ষা করে, সবই যখন ঘুমায়, দণ্ড তখন জেগে থাকে; প্রাজ্ঞরা দণ্ডকে বলেছেন (মূর্তিমান) ধর্ম... যারা দণ্ডের যোগ্য, রাজা যদি অক্লান্তভাবে তাদের পেছনে দণ্ডকে নিয়োগ না করত, তাহলে প্রবলেরা দুর্বলদের অগ্নিপক্ক করে যেত যেন মাছ..., কারো কোনো সম্পত্তি থাকত না, উচ্চে নীচে মেশামেশি হয়ে যেত। সারা বিশ্ব অধীনতা মেনে নেয় (কেবল) দণ্ডের মাধ্যমে, কেননা সদ্ব্যক্তি বিরল; কেবল দণ্ডের ভয়েই সারা বিশ্ব উপকারের জন্য খাটে। দেব, দানব, গন্ধর্ব, রাক্ষস, বায়ুচর ও সরীসৃপেরা উপকার করে কেবল দণ্ডের দ্বারা বাধ্য হয়ে। দণ্ডের (নির্দেশে) দ্বিধা ঘটলে সমস্ত বর্ণ নষ্ট হয়ে যাবে, সমস্ত বেড়া ভেঙে পড়বে, সমস্ত জনগণ বিক্ষুব্ধ হয়ে উঠবে। অপরাধীবিনাশক কৃষ্ণগাত্র রক্তচক্ষু দণ্ড যেখান দিয়ে যায় সেখানে প্রজারা বিক্ষুব্ধ হয় না, যদি নায়ক ভালো পর্যবেক্ষণ করে যায়' ('মনুসংহিতা', সাত, ১৭-২৫)।

দণ্ড যেহেতু 'মহাতেজা' ('মনুসংহিতা', সাত, ২৮), তাই তার বেঠিক

প্রয়োগ সবার পক্ষেই বিপুল দুঃখদুর্দশা ঘটতে পারে। দণ্ডের সঠিক নিয়োগের জন্য প্রয়োজনীয় জ্ঞান ও অভিজ্ঞতার উল্লেখ করে 'মনুসংহিতা' দণ্ড দানের সময় কতকগুলি দাবি মেনে চলার আবশ্যিকতায় জোর দিয়েছে। বিশেষ মনোযোগ দেয়া হয়েছে রীতিভঙ্গের স্থান ও কাল এবং সে সম্পর্কে চৈতন্যের মাত্রার ওপর: 'আমূলভাবে (অপরাধের) স্থান ও কাল, চৈতন্যের সম্ভাবনা ও মাত্রা বিচার করে তেমন (শাস্তি) প্রয়োগ করতে হবে অন্যায় পথে চলা লোকেদের ক্ষেত্রে যা দেয়ার কথা' ('মনুসংহিতা', সাত, ১৬)।

শাসনের মূল হাতিয়ার এবং ধর্ম রূপায়ণের ব্যবস্থা রক্ষার গুরুত্বপূর্ণ উপায় হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে 'মনুসংহিতা'য় শাস্তিকে দেখা হয়েছে (সাত, ১৭; আট, ৩১৮) পাপ স্খালনের উপায় হিশেবেও। শেষ বিচারে এই ধরনের ভাবনা জড়িত আইনে (ধর্মে), শাস্তিতে দেবত্বারোপ ও তার ধর্মীয় চরিত্রের সঙ্গে। 'যারা অপরাধ করেছে, কিন্তু রাজার দণ্ড ভোগ করেছে, তারা পরিশুদ্ধ হয়ে স্বর্গে যাবে সৎকার্যসাধক পুণ্যবানদের মতো' ('মনুসংহিতা', আট, ৩১৮)।

বিভিন্ন বর্ণের সদস্যদের অধিকার ও কর্তব্যের অসাম্যের মধ্যে পড়ে অপরাধ ও শাস্তির প্রশ্নের বিধির সমক্ষেও তাদের অসাম্য। একই কৃতকর্মের জন্য শাস্তির বৈষম্য আইনজ্ঞানের একটা বড়ো নীতি যা সুসঙ্গতভাবে অনুসৃত হয়েছে 'মনুসংহিতা'য়। বিশেষ রকমের সুবিধাভোগী অবস্থায় থাকছে ব্রাহ্মণেরা, যাদের ক্ষেত্রে সাধারণত অর্থদণ্ডের ব্যবস্থা হয় যেখানে নিম্ন বর্ণের লোকেদের বেলায় কঠোর শাস্তির (অঙ্গচ্ছেদ ইত্যাদির) আশঙ্কা থাকে। ব্রাহ্মণদের ক্ষেত্রে মৃত্যুদণ্ডও প্রযোজ্য নয়। 'ব্রাহ্মণের ক্ষেত্রে মৃত্যুদণ্ডের বদলে (মস্তক) মুণ্ডন প্রযোজ্য; অন্যান্য বর্ণের ক্ষেত্রে মৃত্যুদণ্ড দেয়া যেতে পারে। সর্ববিধ পাপে পতিত হলেও ব্রাহ্মণকে কখনো হত্যা করা উচিত নয়; (শারীরিক) ক্ষতি না করে তার সমস্ত সম্পত্তি সমেত তাকে দেশ থেকে বিতাড়িত করা দরকার। পৃথিবীতে এমন কোনো কর্ম নেই যা ব্রহ্মহত্যার চেয়ে বেশি ধর্মবিরোধী, সেইজন্য রাজার উচিত তাকে হত্যার কথা চিন্তাতেও স্থান না দেয়া' ('মনুসংহিতা', আট, ৩৭৯-৩৮১)।

'মনুসংহিতা'র শেষ দ্বাদশ অধ্যায়ে আত্মার দেহান্তরের আলোকে ধর্মলঙ্ঘনকারীদের ভাগ্যে কী শাস্তি আছে নরকে, তার তালিকা দেয়া হয়েছে। ধর্মশাস্ত্রের ঐশ্বরিক প্রতিষ্ঠার বর্ণনা দেয়া প্রথম ও শেষ অধ্যায় অবতারণা ও উপসংহারের ভূমিকা নিয়েছে।

১২টি অধ্যায় আর ২৬৫০টি ধারায় 'মনুসংহিতা' ব্যবহারশাস্ত্রীয়

টেকনিকাল দিক থেকে বিধানের একটি বিস্তৃত এবং বেশ খুঁটিনাটিতে রচিত সংকলন, যা সমগ্র ধর্মশাস্ত্রের সাধারণ ঐশ্বরিক-ধর্মীয় প্রতিষ্ঠার পরিপূরণে প্রয়োজনীয় মূর্ত-নির্দিষ্ট প্রেরণায় সমৃদ্ধ।

*

ব্রহ্মণ্যবাদের ভাবাদর্শ থেকে রাষ্ট্র ও আইন বিষয়ে ঐহিক ধারণার দিকে একটা লক্ষণীয় গত্যন্তর দেখা যায় সম্রাট প্রথম চন্দ্রগুপ্তের উপদেষ্টা ও মন্ত্রী কৌটিল্য (চানক্য) রচিত বলে কথিত 'অর্থশাস্ত্র' (খ্রিঃ পূঃ ৪-৩ শতক) গ্রন্থে।

দর্শনশাস্ত্র, তিনটি বেদের শিক্ষা, অর্থনীতি বিষয়ে শিক্ষা, রাষ্ট্রশাসন বিষয়ে শিক্ষাকে শাস্ত্র জ্ঞান করে গ্রন্থটি এই কথায় জোর দিয়েছে যে যৌক্তিক প্রমাণের সাহায্যে তিনটি বেদ বিষয়ক শিক্ষায় বৈধ ও অবৈধের, অর্থনীতি বিষয়ক শিক্ষায় লাভ আর ক্ষতির, রাষ্ট্রশাসন বিষয়ক শিক্ষায় সঠিক ও বেঠিক রাজনীতির অনুধাবন করে দর্শনশাস্ত্র।

'অর্থশাস্ত্র'এ ধর্মের প্রতি চিরাচরিত ভক্তি এবং 'আইন সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত' এই স্বীকৃতির সঙ্গে সঙ্গে শ্রেয় জ্ঞান করেছে ব্যবহারিক **উপকার** (অর্থ) এবং তৎপ্রসূত রাজনৈতিক ব্যবস্থাদি ও প্রশাসনিক আজ্ঞাগুলিকে (বিধানপ্রণয়নের ক্ষেত্রও তার অন্তর্গত)। 'অর্থশাস্ত্র'এ যদিও রাজাকে উপদেশ দেয়া হয়েছে প্রজাদের ভালোবাসতে, 'আইন ও উপকার লঙ্ঘন না করতে,' তাহলেও উপকারটাই দেখা দিয়েছে রাজনৈতিক ক্রিয়াকলাপের নির্ধারক ভিত্তি ও প্রধান নীতি হিশেবে, যা প্রবল, শাস্তিদাতা ক্ষমতার লক্ষ্য ও কাজের অনুসারী।

ধর্মের সঙ্গে সাধারণ সঙ্গতি এবং আইনানুগতার ধর্মীয়-নৈতিক ব্যাখ্যা সত্ত্বেও উপকারকে একটা স্বাধীন নীতি হিশেবে খাড়া করায় সূচিত হয় রাজনীতি ও আইনপ্রণয়নের ঐহিক মতবাদ গঠনে একটা উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ। নৈতিক-ধর্মীয় বন্ধন থেকে রাজনীতিকে এই ধরনের যে মুক্তি দেয়া হয়েছে 'অর্থশাস্ত্র'এ তাতে তার রচয়িতাকে ভারতীয় মাকিয়াভেলি বলে অভিহিত করার খানিকটা ভিত্তি থাকে।*

এ ঘটনাটাও লক্ষণীয় যে রাজনৈতিক ব্যাপার (রাষ্ট্রিক আইনপ্রণয়নীও তার অন্তর্গত) ব্যাখ্যার নতুন নীতি হিশেবে উপকারকে প্রতিপন্ন করা হয়েছে, 'অর্থশাস্ত্র' অনুসারে, অর্থনীতির ক্ষেত্রে এবং ব্যাখ্যা করা হয়েছে 'অর্থনীতি বিষয়ে' এক বিশেষ 'মতবাদ দিয়ে'।

'অর্থশাস্ত্র'এ অনুমোদিত হয়েছে বৈদিক বর্ণব্যবস্থা এবং অপরাধ ও শাস্তির ক্ষেত্রে বিভিন্ন বর্ণের সভ্যদের অসাম্য সমেত তাদের অধিকার ও কর্তব্যের ক্ষেত্রে যে অসাম্য আছে এ ধারণা তাতে নিহিত।

'অর্থশাস্ত্র'এ যে আইনবোধের সাক্ষাৎ মেলে তাকে বলা যেতে পারে ধর্ম বিষয়ে ঈশ্বরতান্ত্রিক ধারণাটা নীতিগতভাবে মেনে নিয়ে কেন্দ্রীয় রাষ্ট্র ক্ষমতার স্বার্থে তার এক রাজনৈতিক-উপযোগিতাবাদী ভাষ্যদানের প্রয়াস। বিমূর্ত-সাধারণীকৃত আকারে বলা যায় যে এই ধারণা অনুসারে রাষ্ট্রে বলবৎ নিয়ম ও আইন শুধু (এমনকি ততটাও) ধর্ম অনুযায়ী নয়, যতটা তা অবশ্য-অবশ্যই রাষ্ট্র ও শাসক ক্ষমতার উপকার ও লাভ প্রকাশ করে। অন্য কথায়, স্বাধীন ও বহু ব্যাপারে নির্ধারক দিক ও মান হিশেবে আইনবিষয়ক বোধের মধ্যে থাকছে রাজনৈতিক স্বার্থের ধারণা।

খিঃ পূঃ ৬-৫ শতকে বেদ ও উপনিষদের একসারি মূল বক্তব্যের সমালোচনা করেন সিদ্ধার্থ, পরে যিনি বুদ্ধ নামে অভিহিত হন। কোনো একটা উচ্চতম সত্তা ও বিশ্বের নৈতিক শাসক, বিধির আদি উৎস হিশেবে ঈশ্বরকে স্বীকার করেন না তিনি। মানবিক ব্যাপার নির্ভর করে লোকেদের নিজ প্রয়াসের ওপর। বুদ্ধের মতে, সর্বজনীন দুঃখকষ্ট থেকে মুক্তির দিকে, নির্বাণের দিকে নিয়ে যায় 'অষ্ট পথ, যথা: সঠিক দর্শন, সঠিক চিন্তা, সঠিক বাণী, সঠিক কর্ম, সঠিক জীবনযাত্রা, সঠিক প্রয়াস, সঠিক অভিনিবেশ, সঠিক ধ্যান'।

দুঃখকষ্ট থেকে মুক্তির এই বৌদ্ধ পথ হল সামাজিক-রাজনৈতিক পুনর্গঠন নয়, নৈতিক ও আত্মিক প্রয়াসের পথ, নীতিগতভাবে তা সবার কাছেই উন্মুক্ত। এতে করে বৌদ্ধধর্ম লোকেদের নৈতিক-আত্মিক সাম্য মেনে নিচ্ছে। এই অবস্থান থেকে বুদ্ধ ও তাঁর অনুগামীরা বর্ণের অসাম্য নীতির সমালোচনা করেন এবং বর্ণব্যবস্থাটার প্রতিই নেতিবাচক মনোভাব নেন। বৌদ্ধদের কাছে 'ব্রাহ্মণ' জন্মগত সুবিধাভোগী কোনো সর্বোচ্চ বর্ণের সদস্য নয়, সে হল ব্যক্তিগত প্রয়াসে পূর্ণতায় উপনীত মানুষ।

খ্রিঃ পূঃ ৪-৩ শতকের বিখ্যাত বৌদ্ধ অনুশাসন গ্রন্থ 'ধম্মপাদে' ঘোষণা করা হয়েছে: 'কিন্তু আমি মানুষকে কেবল তার জন্মহেতু বা তার জননীর জন্য ব্রাহ্মণ বলব না' (ছাব্বিশ, ৩৯৬)। এরূপ ধারণা তখন প্রাধান্যকারী ব্রহ্মণ্যবাদ থেকে প্রচণ্ড পৃথক।

বৌদ্ধদের কাছে ধর্মের অর্থই খুব বদলে গেছে। এটা জড়িত পূর্ববর্তী আস্তিক্যবাদী ধারণা থেকে বৌদ্ধধর্মের বিশ্ববীক্ষামূলক নির্গমনের সঙ্গে। বৌদ্ধধর্ম এই কথা বলে যে অস্তিত্বের সমস্ত বহুরূপিতার ভিত্তি অভ্যন্তরীণ কোনো আত্মা নয়, সর্বসাধারণিক পারস্পরিক নির্ভরশীলতা ও পারস্পরিক নির্ধারণের অচ্ছেদ্য শৃঙ্খলে — অবলম্বন থেকে উদ্ভবের নিয়মে (প্রতীত্যসমুৎপাদে), স্বকীয় ধরনের এক কার্যকারণে আবদ্ধ।

নিয়ম, বিশ্বে নিয়মানুগতা বৌদ্ধ মতবাদে তাদের পূর্বতন আস্তিক্য-বাদী (ঈশ্বরতান্ত্রিক) প্রতিষ্ঠা হারায়। ধর্মকে নিয়ম হিশেবে ব্যাখ্যা করার চরিত্রও প্রভাবিত হচ্ছে এতে। দর্শনের ভারতীয় ঐতিহাসিক ম. রয় ধর্ম বিষয়ে বুদ্ধের অবস্থান প্রসঙ্গে লিখেছেন: 'জ্ঞানালোক তাঁকে এইটে দেখতে সাহায্য করেছে যে বিশ্ব চলেছে নিয়মানুগভাবে। এই প্রাকৃতিক, স্বাভাবিক নিয়মানুগতাকে উনি বলেছেন ধর্ম বা নিয়ম। মানুষের জীবনের মূল লক্ষ্য হল এই নিয়মের জ্ঞানলাভ।'

মানবিক পারস্পরিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে ধর্মের যে নিয়ামক ভূমিকা বৌদ্ধধর্ম স্বীকার করে, তার আলোকে নিয়ম হিশেবে ব্যাখ্যাত ধর্মের আইনী তাৎপর্য স্বতঃস্পষ্ট। সেইসঙ্গে মনে রাখা দরকার যে স্বাভাবিক নিয়ম হিশেবে ধর্মের বৌদ্ধ ব্যাখ্যা খানিকটা আপেক্ষিক: 'স্বাভাবিকতার' কথা এখানে বলা সম্ভব কেবল নিয়মের ঐশ্বরিক চরিত্র খণ্ডনের অর্থে, প্রকৃতি থেকেই ধর্মের উদ্ভব, এ অর্থে নয়।

বৌদ্ধ মতে, সুবুদ্ধির যে দাবি ধর্মে প্রকাশ পায় তার চরিত্রটা ব্যক্তিগত-মানবিক। এটা পরিষ্কার যে কথাটা এখানে ঐশ্বরিক অনুশাসন নিয়েও নয়, খোদ প্রকৃতির সরাসরি নির্দেশ নিয়েও নয় — সেটা পরিবর্তন ও দুঃখকষ্টের একটা নিরবচ্ছিন্ন শেকল, যা থেকে মুক্তি পাওয়া উচিত ও সম্ভব (ধর্ম পালন করে)। ধর্মের বৌদ্ধ ধারণায় এইভাবে প্রকৃতি ও তার অন্তর্নিহিত নিয়মানুগতা উপেক্ষিত নয়, কিন্তু নৈতিক ক্ষেত্রে তা বিবেচিত হয়েছে কু ও দুঃখকষ্টের একটা উৎস হিসেবে যা কেবল ব্যক্তিগত-আত্মিক প্রয়াসে জয় করতে হবে।

মোটের ওপর ধর্মের বৌদ্ধ ধারণার চরিত্র যুক্তিবাদী। 'ধম্মপাদে' বলা

হয়েছে (এক, ১, ২): 'ধর্ম বিচারবুদ্ধি দ্বারা নির্ধারিত, তার সেরা অংশ হল বিচারবুদ্ধি, তারা বিচারবুদ্ধির সৃষ্টি। যদি কেউ কিছু বলে বা করে অশুচি বিচারবুদ্ধি থেকে, তাহলে দুর্ভাগ্য তাকে অনুসরণ করবে, যেমন চাকা অনুসরণ করে চালককে... যদি কেউ কিছু বলে বা করে নির্মল বিচারবুদ্ধি থেকে তাহলে সুখ তাকে অনুসরণ করবে অবিচ্ছিন্ন ছায়ার মতো।'

ধর্মকে বিচারবুদ্ধি বলে জ্ঞান করার বৌদ্ধ ধারণার অর্থ হল ধর্ম একাধারে বিচারবুদ্ধি-সম্পন্ন নিয়ম এবং বিচারবুদ্ধি কৃত নিয়ম। ধর্মের, বলতে কি সমগ্র আদি বৌদ্ধ বিশ্ববীক্ষার ভাষ্য মানবিকতা, অন্য লোকের সঙ্গে সুসম্পর্ক, হিংসাকে হিংসা ও বল দ্বারা প্রতিরোধ না করার প্রচারে সমাচ্ছন্ন। 'ধম্মপাদ' বলেছে (প্রথম, ৫): 'কেননা, এ বিশ্বে হিংসার দ্বারা কখনো হিংসার অবসান হয় নি, কিন্তু অহিংসায় হিংসার অবসান হয়। এই হল শাশ্বত ধর্ম।'

এই অবস্থান থেকে আদি বৌদ্ধধর্ম প্রচলিত ধর্মীয় ও ঐহিক মূল্যবোধগুলিকে খন্ডন ও মূল্যহীন করে দেয়। 'ধম্মপাদে' ঘোষিত হয়েছে (আট, ১৭৮): 'সৎপাত্তির ফল পার্থিব একাধিপত্যের চেয়ে, অথবা স্বর্গারোহণ বিশ্বাধিপত্যের চেয়ে শ্রেষ্ঠ।'

বৌদ্ধ ভাষ্যে ধর্মের আইনী তাৎপর্যের বৈশিষ্ট্য বোঝার পক্ষে 'ধম্মপাদে' শাস্তির যে কথা বলা হয়েছে, সেটা খুবই আগ্রহোদ্দীপক। সমগ্রভাবে সেটা এসেছে লোকেদের সাম্য, অপরাধ ও শাস্তির ক্ষেত্রেও লোকেদের সাম্যের নীতি থেকে। এই রকমের ধারণার সঙ্গে তখনকার বিশ্ববীক্ষা ও আচারব্যবহারের প্রচন্ড পার্থক্য, যাতে উচ্চ বর্ণ, বিশেষ করে ব্রাহ্মণদের ছিল এই ক্ষেত্রেও বড়ো রকমের বিশেষাধিকার। 'ধম্মপাদ' বলেছে (ছাব্বিশ, ৩৮৯): 'ব্রাহ্মণকে আঘাত করা অনুচিত, কিন্তু ব্রাহ্মণও যেন দোষীর ওপর ক্রোধ বর্ষণ না করে। ধিক তাকে যে ব্রাহ্মণকে আঘাত করে, কিন্তু আরো বেশি তাকে যে দোষীর ওপর ক্রোধ বর্ষণ করে।'

শাস্তির ক্ষেত্রে লোকেদের সাম্য 'ধম্মপাদে' আরো সাধারণভাবে এইরকম সূত্রবদ্ধ করা হয়েছে (দশ, ১২৯): 'সবাই শাস্তির সমক্ষে কম্পিত, মৃত্যুর ভয়ে ভীত — অন্যের স্থানে নিজেকে স্থাপন করো। হত্যা করা, হত্যায় বাধ্য করা উচিত নয়।'

'ধম্মপাদে' সুস্পষ্টরূপে ফুটে উঠেছে (হিংসার দ্বারা হিংসার প্রতিরোধ নয়, এই নীতির দরুন) শাস্তির ভূমিকা ও পরিসর সীমিত করার প্রবণতা সমগ্রভাবে যা বৌদ্ধধর্মের অন্তর্নিহিত। 'ধম্মপাদে' (দশ, ১৩১) বলা হয়েছে:

'নিজের সুখান্বেষণে যে সুখেচ্ছু জীবদের শাস্তি দেয়, মৃত্যুর পর সে সুখ পাবে না।' বিনা দোষে শাস্তিদান যে অননুমোদনীয় তাতে বিশেষ জোর দেয়া হয়েছে। 'নির্দোষ ও অপাতককে যে শাস্তি দেয়, দ্রুত তাকে গ্রাস করবে দশ দশার একটি, নিদারুণ কষ্ট, অঙ্গহানি ও দুঃসহ যন্ত্রণা কিংবা ব্যাধি, উন্মত্ততা, রাজবিরূপতা, কঠিন অভিযোগ, আত্মীয়বিয়োগ, ঐশ্বর্য নাশ, অথবা গৃহদাহ' ('ধম্মপাদ', দশ, ১৩৭-১৪০)।

বৌদ্ধ মতবাদে ধর্মের প্রশস্তি যুগপৎ নিয়মানুগত্য, জীবনের নিয়মসঙ্গত পথেরও প্রশস্তি। তার বোধ ও পালন দাবি করে তদুপযোগী জ্ঞান, নৈতিক ও মানসিক প্রয়াস: নিয়মানুগত্যের পথ হল একই সময়ে ন্যায় ও প্রজ্ঞার পথ। প্রাজ্ঞ 'অনিয়মসঙ্গত পথে নিজের সাফল্য কামনা করে না' ('ধম্মপাদ', ছয়, ৮৪)।

ত্রাণ ও নির্বাণের ব্যক্তিগত পথের বৌদ্ধ নির্দেশ থেকেই বোঝা যায় বাস্তব রাজনৈতিক-আইনী ব্যাপারগুলির প্রতি বৌদ্ধধর্মের বৈশিষ্ট্যসূচক অমনোযোগের কারণ। সমগ্রভাবে এগুলিকে দেখা হয় পার্থিব দুঃখকষ্টের সাধারণ শৃঙ্খলের অংশ হিশেবে। তাই ধর্ম সম্পর্কে বৌদ্ধ মতবাদেরও উদ্দিষ্ট ছিল বুদ্ধভক্তদের সংকীর্ণ একটা গোষ্ঠী।

কিন্তু উদয়কালেই বৌদ্ধধর্মের অনেক ভাবনার বস্তুত গুরুত্বপূর্ণ সামাজিক-রাজনৈতিক তাৎপর্য ও ঝঙ্কার ছিল। বৌদ্ধধর্মের ব্যাপ্তি ও তার অবস্থানের সংহতির সঙ্গে সঙ্গে এই তাৎপর্য ক্রমেই শক্তিশালী হয়ে উঠতে থাকে। ক্রমে ক্রমে বৌদ্ধধর্মের ভাবকল্প (ধর্ম সম্পর্কে ধ্যানধারণাও তার অন্তর্গত) রাষ্ট্রিক নীতি ও বিধানপ্রণয়নকেও প্রভাবিত করতে থাকে। অশোকের যে শাসন (খ্রিঃ পূঃ ২৭২-২৩২) ভারতকে ঐক্যবদ্ধ করেছিল, সে সময় বৌদ্ধধর্ম রাষ্ট্রীয় ধর্ম বলে স্বীকৃতি লাভ করে। বৌদ্ধধর্মের প্রভাব ক্রমশ বিস্তৃত হয় দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার অন্যান্য বহু দেশেও।

বৌদ্ধধর্মের প্রভাব চমৎকার ফুটে উঠেছে অশোকের একসারি ব্যবস্থা ও অনুশাসনে, যাতে জোর দেয়া হয়েছে সাম্রাজ্যের সমস্ত অধিবাসীদের মধ্যে, এমনকি পার্শ্ববর্তী দেশগুলিতেও ধর্মপ্রচারের নীতিতে, বলা হয়েছে সমস্ত জনগণের সুখ ও কল্যাণের জন্য রাজা ও রাজপুরুষদের চেষ্টিত থাকার কর্তব্যের কথা, লোকের সামাজিক প্রতিষ্ঠা নির্বিশেষে 'শাস্তির সমতা', নির্দোষকে শাস্তিদান এবং দোষীকে শাস্তি না দেয়ার অবিধেয়তা ইত্যাদির কথা।

যে নিয়ম, যেমন সমগ্র বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডকে, তেমনি মানবিক সম্পর্ককে চালিত করছে, তার স্বাভাবিক চরিত্র বিষয়ে ধারণা সর্বাধিক সুসঙ্গতরূপে বিকশিত হয়েছে লোকায়ত (চার্বাক) ধারায়, যার অনুগামীরা খ্রিঃ পূঃ ৬ শতকেই নিরীশ্বরবাদী ও সাংবেদনিক অবস্থান থেকে বেদ ও উপনিষদের মূল প্রতিপাদ্যগুলির (ভাগ্য, আত্মার দেহান্তর, কর্ম, ধর্ম ইত্যাদির) সমালোচনা করেছেন।

আস্তিক্যবাদী দৃষ্টিভঙ্গি খণ্ডন করে এই ধারার একজন বিশিষ্ট তত্ত্বকার বৃহস্পতি উল্লেখ করেছেন: 'পারলৌকিক কিছু নয়, রাজা, যার অস্তিত্ব বিশ্বের কাছে চাক্ষুষ, সেই সর্বশক্তিমান বলে বিদিত।'

এই ধারার দৃষ্টিভঙ্গি অনুসারে সবকিছু ঘটছে ব্যাপারাদিরই অভ্যন্তরীণ প্রকৃতি (স্বভাব) থেকে।

'ব্যাপারাদির প্রকৃতিরই' শক্তি অনুজ্ঞামূলক (নিয়মসঙ্গত), তা সামাজিক-মানবিক সম্পর্কের ক্ষেত্রেও (সমাজে, রাষ্ট্রে, নৈতিকতা, আইনের ক্ষেত্রেও) সক্রিয়, চার্বাকপন্থীদের এ ধারণা নিঃসন্দেহেই স্বাভাবিক-আইনী।

চার্বাকপন্থীদের উক্তি থেকে 'ব্যাপারাদির প্রকৃতির' নিয়ামক ভূমিকা ও আচরণবিধির ওপর প্রতিষ্ঠিত তাদের আইনবোধকে স্বাভাবিক বিধির ঐহিক সাংবেদনিক ধারণার একটা আদি প্রকারভেদ বলে অভিহিত করা যায়। অধিকন্তু এ ধারণা যেমন 'ব্যাপারাদির প্রকৃতির' এক-একটা নির্দেশের প্রত্যক্ষ (স্বাভাবিক) ক্রিয়া (অর্থাৎ স্বাভাবিক বিধির, স্বাভাবিক নিয়মের কোনো একটা আদর্শ), তেমনি -- চুক্তি মারফত -- তাদের সরকারি স্বীকৃতি ও বিধিবন্ধনের সম্ভাবনাও মানে।

*

সমগ্রভাবে প্রাচীন ভারতীয় রাজনৈতিক-আইনী ভাবনা, যেমন ভারতের, তেমনি ভারতীয় সংস্কৃতির প্রভাবাধীন একসারি দেশের রাজনৈতিক-আইনী ধারণার পরবর্তী বিকাশ বেশ প্রভাবিত করেছে। প্রাচীন ভারতের রাজনৈতিক-আইনী ধারণার প্রতি অতীত ও বর্তমানের বহু গবেষক ও টীকাকারের বিপুল আগ্রহের কারণ সর্বাগ্রে অবশ্যই এ ধারণাগুলির সারগর্ভতা, মৌলিকতা, গভীরতা।

§ ৩। কনফুশিয়াস

দাসপ্রথার যুগে প্রাচ্য জনগণের রাজনৈতিক চিন্তায় একটা বৃহৎ কৃতিত্ব কনফুশিয়াসের (কুন-ৎস্যু, কুন ফু-ৎস্জি, খিঃ পূঃ ৫৫১-৪৭৯) নৈতিক-রাজনৈতিক মতবাদ। এই মতবাদ দেখা দেয় 'বাদশাহী কনফুশিয়াসতন্ত্রের' ভিত্তিতেই, দু' হাজার বছর ধরে যা ছিল সামন্ততান্ত্রিক চীনের সরকারি ভাবাদর্শ, চীন ও প্রতিবেশী রাষ্ট্রগুলির রাজ্যপাট ও রাজনৈতিক মতাদর্শের বিকাশে তা বিপুল প্রভাব ফেলে। বহু শতক ধরে কনফুশিয়ান অনুশাসন ছিল চৈনিক ঐতিহ্য এবং সমাজের সমস্ত শ্রেণীর রাজনৈতিক কৃষ্টি, সজ্ঞানে তা সামন্ততান্ত্রিক সমাজসম্পর্ক বজায় রাখে ও সামাজিক-রাজনৈতিক ব্যবস্থার অচলায়তনে সাহায্য করে।

কনফুশিয়ান মতবাদের ভাবাদর্শীয় প্রভাব চীনের ইতিহাস জুড়ে সমস্ত, সর্বাগ্রে রক্ষণশীল ও প্রতিক্রিয়াশীল ভাবাদর্শীয়-রাজনৈতিক ধারায় প্রকটিত থেকেছে এবং সামাজিক অগ্রগতির পথে একটা বাস্তব বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে।

উনিশ শতকের শেষ থেকে চীনকে আধুনিক করে তোলার প্রতিটি সামাজিক-অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক কর্মসূচিই ঐতিহ্যের বিপুল বাধার সম্মুখীন হয়েছে যা কনফুশিয়াসের মতবাদের সঙ্গে জড়িত।

কনফুশিয়ান মতবাদ দেখা দেয় প্রাচীন চীনা ইতিহাসের জটিল এবং বহু দিক থেকে সন্ধিক্ষণের মতো একটা পর্বে, জাঙ্গো যুগে ('যুধ্যমান রাষ্ট্রপুঞ্জ' — খিঃ পূঃ ৫-৩ শতকে)। চীন এসময় ছিল পরস্পর বিবদমান বহু ছোটো ছোটো নগর-রাষ্ট্রে খণ্ডবিখণ্ড, তাদের সামাজিক-রাজনৈতিক ব্যবস্থা ছিল কৌলিক প্রথা ভেঙে পড়ার অবস্থায়। আলোচ্য পর্বের আগে পুরাকালীন চৈনিক সমাজ-সংগঠনের বৈশিষ্ট্য ছিল বংশ সম্পর্কের অসাধারণ দৃঢ়তা ও সোপানতন্ত্র, পরিবার, কুল ও অন্যান্য সমাজ-সংগঠনের প্রচণ্ড আত্মবদ্ধতা, যাতে গোষ্ঠীভিত্তিক গণতন্ত্র গড়ে ওঠার কোনো অবকাশ ছিল না। বংশ সম্পর্কের অতিশয় দৃঢ়তায় নির্দিষ্ট হয়ে যায় কুলপতি সংস্থাগুলির রাষ্ট্রপতি সংস্থায় বিবর্তনের বৈশিষ্ট্য, অনেক আগেই সমাজের তুলনায় রাষ্ট্রক্ষমতার উন্নয়ন এবং অতিমাত্রায় তার স্বাধীনতা ও আধিপত্য লাভে সাহায্য হয়। কৌলিক ব্যবস্থার শক্তিশালী জেরের ফলে সে যুগের উৎসস্থানীয় গ্রন্থে যা বলা হয়েছে সেই প্রাচীন 'বংশ-রাষ্ট্রে' দেখা দিয়েছিল গণতান্ত্রিক নয়, কর্তৃত্বমূলক প্রবণতা।

প্রাচীন চীনে প্রজাতান্ত্রিক দাসপ্রথাভিত্তিক প্রতিষ্ঠান গড়ে ওঠার সামাজিক পরিস্থিতি ছিল না। এই সঙ্গে যোগ করা উচিত যে কনফুশিয়াসের যুগে বা তার পরেও দাসশ্রমই সামাজিক উৎপাদনের একমাত্র উপায় হয়ে ওঠে নি, যদিও দাসপ্রথা, বিশেষ করে রাষ্ট্রীয় দাসপ্রথার প্রচলন ছিল বিস্তৃত। দাসত্বে নিক্ষেপ করা হত শুধু ভিন্ন উপজাতির লোকেদের নয়, রাষ্ট্রের কাছে দোষী সাব্যস্ত স্বাধীনদেরও। চীন ছিল পিতৃতান্ত্রিক-কৌলিক ব্যবস্থার প্রবল জের নিয়ে দাস-সমাজের 'এশীয় রূপের' নিদর্শন।

খিঃ পূঃ ৫ শতক নাগাদ ব্যক্তিগত মালিকানা ও পণ্য-মুদ্রা সম্পর্কের বিকাশ, সামাজিক স্তরভেদ বৃদ্ধির ফলে চীনা নগর-রাষ্ট্রের ঐতিহ্যাগত কৌলিক গঠন টলে ওঠে। কুলগুলির বিস্তার এবং নতুন স্বাধীন সামন্ত অধিপতিদের খসে-যাওয়া, সম্ভ্রান্ত নয় অথচ ধনী হয়ে ওঠা গোষ্ঠী সদস্যদের নতুন একটা স্তরের উদ্ভব, সেই সঙ্গে কৌলিক অভিজাতদের অনেকের দারিদ্র্য—

এসবের ফলে নগর-রাষ্ট্রের এবং সমগ্রভাবে 'স্বর্গতলের' সামাজিক-রাজনৈতিক ব্যবস্থার ভারসাম্য নষ্ট হয়ে যায়। কৌলিক অভিজাতদের ক্ষমতা মঞ্জুর করত যে নৈতিক ও আচার-আচরণীয় আদর্শ, পুরনো সমাজ-কাঠামোর সংকটে তাদের ক্রিয়া দুর্বল হয়ে পড়ে। যে সমাজ-সংগঠন বরাবরই অত্যন্ত কঠোর, তার পরিস্থিতিতে কৌলিক অভিজাত ক্ষমতার স্থান নিতে পারত কেবল আমলাতান্ত্রিক কেন্দ্রীভূত একটা রাষ্ট্রযন্ত্র, যাতে মূর্ত হবে সমাজের ওপর রাষ্ট্রের আধিপত্য। খ্রিঃ পূঃ ৫-৩ শতকে শাসককে শীর্ষে রেখে ধাপে ধাপে পদাধিকারীদের সাহায্যে কমবেশি পিতৃতান্ত্রিক-কৌলিক ঐতিহ্য বজায় রেখে একটা আমলাতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা গড়ে তোলার প্রক্রিয়া সক্রিয়ভাবে চলে। কেন্দ্রীভূত দাসপ্রথাভিত্তিক সাম্রাজ্য গড়ে উঠলেও সামাজিক-অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় পরিবর্তন সূচিত হল না, যদিও সময়ের আগেই একটা সর্বশক্তিমান রাষ্ট্রীয় আমলাতন্ত্র বিকশিত হওয়ায় দেখা দিল কিছু কিছু সামন্ততান্ত্রিক দিক (যেমন, ভূমিতে রাষ্ট্রীয় সম্পত্তির বৃদ্ধি, আমলাদের জায়গির)। কনফুশিয়াসের যুগে চীনের রাষ্ট্রীয়-আইনী ঊর্ধ্বকাঠামোয় ছিল পিতৃতান্ত্রিক-কৌলিক, দাসভিত্তিক ও আদি সামন্ততান্ত্রিক উপাদানের একটা মিশ্রণ।

এই পরিস্থিতিতে রাষ্ট্রীয়-আইনী ভাবাদর্শের ক্ষেত্রে ঘোর সংগ্রাম চলে দুই মূল বিকল্পের মধ্যে — বিশৃঙ্খলা দূর করে শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনা, চীনে ক্ষমতা কেন্দ্রীকরণের পথ ও পদ্ধতি নিয়ে একদিকে কনফুশিয়াসপন্থীদের দল, অন্য দিকে লেগিস্টদের দল (ফাৎজিয়া — বিধানপ্রণয়নী শাসন ব্যবস্থার পক্ষপাতীরা)। কনফুশিয়াসের মতবাদ লেগিজমের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্কে বিচার্য, কেননা দুই ধারাই পরস্পরের ওপর প্রভাব বিস্তার করে এবং পরিশেষে কনফুশিয়াসবাদকে অনুশাসনের স্তরে তোলার সময় তাদের মূল বক্তব্যগুলির সংশ্লেষ ঘটে।

কনফুশিয়ান যুগের অন্য মতবাদ — মোবাদ ও দাওসিজম কনফুশিয়াসবাদের সঙ্গে গুরুতর প্রতিদ্বন্দ্বিতা চালাতে পারে নি। সর্বোচ্চ পরিমাণ সমরূপিতার জন্য ও সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের 'বাড়াবাড়ির' বিরুদ্ধে মোবাদ (প্রতিষ্ঠাতা মো-ৎসজি — খ্রিঃ পূঃ ৪৭৯-৩৮১) যে আহ্বান জানায় তা লেগিজমের অনেক বেশি সক্রিয়, সর্বগ্রাসী-স্বেচ্ছাতন্ত্রী কর্মসূচির কাছে নতি স্বীকার করে। আর যে দাওসিজম (প্রতিষ্ঠাতা দাও-ৎসজি — খ্রিঃ পূঃ ৩৬৯-২৮৬) 'কর্মত্যাগ' ও ঘটনার স্বাভাবিক গতিতে হস্তক্ষেপ না করাকে প্রধান পুণ্যকর্ম বলে ঘোষণা করে, তাতে প্রকাশ পেয়েছিল কেবল সামাজিক অন্যায় প্রসঙ্গে নিষ্ক্রিয় বিরোধিতা।

কনফুশিয়াস ও লেগিজমপন্থীরা উভয়েই ছিল নতুন, জায়মান আমলাতান্ত্রিক-রাষ্ট্রিক শাসন ব্যবস্থার মতপ্রবক্তা, কিন্তু তার বিকাশের দুই ভিন্ন ধারার প্রতিনিধি — নরমপন্থী রক্ষণশীল আর চরমপন্থী স্বৈরাচারী। কনফুশিয়াসপন্থীরা ছিল সামাজিক নিয়ন্ত্রণের নীতিশাস্ত্রীয় ও আচারভিত্তিক পদ্ধতি অবলম্বন করে অতীতের নৈতিক ও সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের সাহায্যে নতুন রাষ্ট্রযন্ত্র গঠনের পক্ষে। লেগিজমপন্থীরা (যেমন, শান ইয়ান) কেন্দ্রীভূত রাষ্ট্র গঠন ও তাকে শক্তিশালী করতে চাইত এই নীতিতে: 'নির্বোধ ও অজ্ঞ জনগণ মানে মহাশক্তি', 'দুর্বল জনগণ মানে শক্তিশালী রাষ্ট্র'। পিতৃতান্ত্রিক-কৌলিক ব্যবস্থার জেরের বিরুদ্ধে সংগ্রামে মুখ্য করে তোলা হয় রাষ্ট্রের শায়েস্তামূলক ক্রিয়াকলাপ, যা চলবে প্রশাসনিক হুকুম-আইন ('ফা') ব্যবস্থার সাহায্যে।

কনফুশিয়াস ও লেগিজমপন্থীদের মতবাদে প্রতিফলিত হয় চৈনিক সমাজের অন্তর্নিহিত কয়েকটি দিক — ঐতিহ্যের দিকে ঝোঁক এবং সেইসঙ্গে সর্বগ্রাসী নিয়ন্ত্রণের প্রবণতা, রাষ্ট্রযন্ত্রের ক্রিয়াকলাপে আইনধর্মী রীতিনীতি ও লিখিত আইনের ব্যবহার। 'যুধ্যমান রাষ্ট্রপুঞ্জের' যুগে লেগিজমের জয়জয়কার, কিন্তু ইতিমধ্যেই যে রাজনৈতিক-সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য গড়ে উঠেছিল তা উপেক্ষা করায় এবং স্বৈরাচারকে চরমে তোলায় তার পতন হয়। লেগিজম নয়, কনফুশিয়াসবাদ হয়ে দাঁড়ায় উঠতি কেন্দ্রীভূত, আমলাতান্ত্রিক সাম্রাজ্যের সরকারি ভাবাদর্শ।

কনফুশিয়ান মতবাদের কেন্দ্রীয় কথা হল 'জেন' (মানবিকতা)। তার অর্থ মূর্ত-নির্দিষ্ট করা হয়েছে পুরো এক সারি সংশ্লিষ্ট নীতিতে, যেখানে কোনো-না-কোনো পরিস্থিতিতে 'জেন' আবির্ভূত হয়: 'সিয়াও' (সন্তানের ভক্তি), 'চ্‌জুন' (প্রভুভক্তি), 'ই' (কর্তব্য), 'সিন' (বিশ্বস্ততা, অকপটতা), 'ভেন' (মানবপ্রেম), 'চুই' (দয়ালুতা), 'শু' (ক্ষমা)। 'জেন' এই নীতিতেও পরিস্ফুট হয়: 'নিজে যা চাও না, অপরের বেলায় তা ক'রো না'। মানুষের 'জেন' লাভের উপায় হল 'লি' (অনুষ্ঠান, শিষ্টাচার) — কৌলিক ও নীতিশাস্ত্রীয় সূত্র এবং পূর্বপুরুষদের, অতীতের প্রাজ্ঞ শাসকদের প্রবর্তিত আইনসদৃশ রীতিনীতি পালন। এটা শুধু আধুনিক অর্থে আইনসদৃশ রীতিনীতি নয়, ক্রিয়াকর্ম, শিষ্টতা, আচার-অনুষ্ঠান, মানবিক আচরণের বাহ্য

রূপও। কনফুশিয়াস মনে করেন, 'আচার-অনুষ্ঠানের সঙ্গে যা সঙ্গত নয়, তা করা অনুচিত'*।

তাঁর সমকালীন কোনো আদর্শ রাষ্ট্র সম্পর্কে নিজের ভাবনা কনফুশিয়াস গড়ে তুলেছিলেন 'প্রাচীন কালের স্বর্ণযুগ' সম্পর্কে ইউটোপীয় ধারণার সাহায্যে ও তার সচেতন চর্চায়। এরূপ পদ্ধতি প্রাচীন ও মধ্যযুগীয় ভাবাদর্শের পক্ষে স্বতঃই বৈশিষ্ট্যসূচক, ঐতিহাসিক ও সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য তাতে প্রধান ভূমিকা নেয়।

'লি-ৎসজি'তে ('আচার-অনুষ্ঠানের গ্রন্থ') কনফুশিয়াস কথিত 'মহা ঐক্য' বা 'মহা প্রশান্তির' যে যুগের কথা বলা হয়েছে, তাতে তেমন সময়ের কথা আছে যখন 'স্বর্গতল' ছিল সকলের অধিকারে, যখন সেখানে বিরাজ করত ন্যায়। রাষ্ট্রীয় কর্তৃপদে নির্বাচিত হত বিচক্ষণ ও গুণীরা। লোকেদের মধ্যে ছিল আস্থা ও প্রীতির সম্পর্ক। তবে কৌলিক ব্যবস্থায় উদ্ভূত যেকোনো ঐতিহ্যেরই বাহক ছিলেন না কনফুশিয়াস। 'লি' সম্পর্কে তাঁর মতবাদ যথেষ্ট জটিল, যে মূর্ত-নির্দিষ্ট ঐতিহাসিক পরিস্থিতিতে তাঁর বাস, তজ্জনিত নানা অবজেকটিভ স্ববিরোধিতায় তা আকীর্ণ। তাঁর সময়কার সংকটাপন্ন সমাজব্যবস্থা সুস্থির করার উপায়, যে আমলাতান্ত্রিক রাষ্ট্রব্যবস্থা গড়ে উঠছিল তদনুযায়ী সামাজিক পরিচালনার ফলপ্রদ একটা রূপ তিনি দেখেছিলেন আচারানুষ্ঠানের সংরক্ষণ এবং আবশ্যক হলে তার নবীকরণের মধ্যে। তিনি চেয়েছিলেন সামাজিক নিয়ন্ত্রণের নৈতিক-প্রথাভিত্তিক পদ্ধতিতে নতুন প্রেরণা সঞ্চার করতে, নির্ভর করেছিলেন ঐতিহ্যের ওপর, কিন্তু তার ব্যাখ্যা করেছিলেন নতুন ধরনে, 'মানবিকতা' সম্পর্কে তাঁর নিজের মতবাদ অনুযায়ী। একাধিক বার তিনি মন্তব্য করেছেন যে মহানুভব লোকের উচিত নীতিবিরুদ্ধ আচার-আচরণ পরিহার করা। যেমন, ধর্মানুষ্ঠানে নরবলির বিরুদ্ধতা করেছেন তিনি।

শ্রেণীসংগ্রাম প্রচণ্ড বৃদ্ধির পরিস্থিতিতে সামাজিক নিয়ন্ত্রণের ঐতিহ্যভূত পদ্ধতি ব্যবহার করে কনফুশিয়াস তার তীব্রতা হ্রাস করার চেষ্টা করেছিলেন। প্রভুত্বের সম্পর্ককে সচেতনভাবে মানবিক করে তোলার ডাক দিয়েছিলেন তিনি — প্রভুর কাছে অধীনস্থরা থাকবে সন্তানের মতো ভক্তিমান, অধীনস্থদের প্রতি প্রভুরা থাকবে পিতার মতো স্নেহশীল। এ ব্যাপারে তিনি ঐতিহ্যের

শক্তির ওপর ভরসা করেছিলেন, পূর্বপুরুষদের কৃষ্টির ওপর, নতুন পরিস্থিতিতে পারিবারিক-কৌলিক সম্পর্কের দৃঢ়ীকরণে।

তবে কনফুশিয়াসকে কৌলিক প্রথা পুনঃপ্রবর্তনের পক্ষপাতী বলে গণ্য করলে ভুল হবে। ঐতিহ্যের সাহায্য নিয়ে, সাংস্কৃতিক উত্তরাধিকারের ধারণায় তিনি প্রভুত্বের নতুন সম্পর্ককে — জায়মান আমলাতান্ত্রিক রাষ্ট্র শাসনের পরিস্থিতিতে অধীনতাকে যুক্তিসিদ্ধ বলে প্রতিপন্ন করেন। সেই সঙ্গে এই শাসনের স্থিতিশীলতা ও ফলপ্রসূতার গ্যারাণ্টি তাঁর কাছে ছিল অধীনতার সবচেয়ে পিতৃতান্ত্রিক রূপ — পারিবারিক কর্তৃত্বের ধরন প্রবর্তন। এতে করে সংরক্ষিত হচ্ছে ব্যক্তি হিশেবে একটা লোকের বিকাশের সম্পর্কপাত, তার অধীনতা। জনগণ ('সাধারণ লোক') হল পরিবারের ছোটোরা, বড়োদের অধীনে থাকতে তারা বাধ্য। কনফুশিয়াস যা বলেছেন, পরিবারে যে বাধ্য, প্রভুর অবাধ্য সে হয় কদাচিৎ। 'অহংবাদের' বিরুদ্ধে কনফুশিয়াসের সংগ্রামের লক্ষ্য ছিল এইটাই।

কনফুশিয়াসের 'মানবিকতার' প্রেরণা এসেছে জনগণের অধিকারহীনতা থেকে। 'উত্তম শাসনের' সমস্ত ভরসা তিনি রেখেছেন সদাশয় ও প্রাজ্ঞ শাসক আর ওমরাহদের ওপর, যারা তাঁর মতবাদ জেনেছে এবং নিজে থেকেই স্বেচ্ছাচার আর জনগণের স্বার্থে অবহেলা দমন করে।

পিতৃতান্ত্রিক-কৌলিক যে ব্যবস্থার জায়গায় আসছিল আমলাতান্ত্রিক রাষ্ট্রব্যবস্থা, তা বেড়ে উঠছিল ঐ ব্যবস্থারই অগণতান্ত্রিক ঐতিহ্যে। তার নীতি হল জনগণের যান্ত্রিক অধীনতা এবং সোপানভিত্তিক কেন্দ্রীভূতি। কনফুশিয়াস বলেছেন, 'জনগণকে বশ্যতা স্বীকার করানো যায়, কিন্তু কেন সেটা যে সে বুঝতে বাধ্য এমন নয়' ('লুন-ইউয়ি', অধ্যায়: তাই বো, নং ৯)।

তবে জনগণের রাজনৈতিক ও নৈতিক গুণাবলীতে সন্দিহান হলেও কনফুশিয়াস একধরনের 'সামর্থ্যের আভিজাত্যে' বিশ্বাস করতেন যা মতবাদে দীক্ষালাভ ও লোক পরিচালনার সামর্থ্যের ওপর প্রতিষ্ঠিত। এই সুস্পষ্ট স্ববিরোধিতার কারণ সে যুগের চৈনিক সমাজের চরিত্রেই নিহিত। পুরনো সমাজ কাঠামোর ভাঙনে অস্থিরতার উপাদান বৃদ্ধি পায়: বহু সম্ভ্রান্ত পরিবার গরিব হয়ে পড়ে (কিছু প্রাক্তন অভিজাত এমনকি দাসে পরিণত হয়), আর অনভিজাতরা হয়ে ওঠে ধনী, বংশ ও কুলের প্রধান, এমনকি রাষ্ট্রচালক। তাছাড়া, আমলাতান্ত্রিক সংগঠনের বিকাশে প্রয়োজন হচ্ছিল সংগঠন, শিষ্টাচার ইত্যাদিতে পারদর্শীদের এগিয়ে দেবার। সেই কারণে প্রাচীন চীনে অনেক আগেই বিকশিত হয় পরিচালন বিদ্যা। রাষ্ট্র শাসনের

ক্ষেত্রে জ্ঞান রাখে এরকম লোকেদের পুরো একটা সম্প্রদায় প্রয়োজন হয়ে পড়ায় শাসনের যোগ্যতা ও শিক্ষা অনুসারে সামাজিক সচলতার ভিত্তি গড়ে ওঠে। যেমন, জানা আছে যে স্বয়ং কনফুশিয়াসের জন্ম দরিদ্র হয়ে পড়া অভিজাত বংশে, কৈশোরে গুরুভার শ্রমে লিপ্ত থাকতে হয়েছে তাঁকে। তিনি ঘোষণা করেন, 'আমায় যদি শুকনো মাংসের ছিবড়ে (অর্থাৎ অতি অল্প বেতন) দেয়া হয়, তাহলেও শিক্ষা দিতে আপত্তি করব না' ('লুন-ইউয়ি', অধ্যায়: শু এর, নং ৭)।

প্রাচীন চীনা সমাজে শাসনের প্রকৃতিগত সামর্থ্যে খুবই গুরুত্ব দেয়া হত। কনফুশিয়াস কর্তৃক মহৎ লোকের ('জিউনজি') ব্যাখ্যায় তার বেশ প্রভাব পড়েছে। তাঁর মতবাদে ব্যক্তিত্বের এই আদর্শটা বড়ো একটা ভূমিকা নিয়েছে। জিউনজি পাণ্ডিত্য ও পুণ্যকর্মের বিমূর্ত প্রতিমা ততটা নয়, যতটা সে সক্রিয় রাজনৈতিক কর্মকর্তা, সুশিক্ষিত মানুষের আদর্শ, যে শিক্ষাদান ও ব্যক্তিগত আচরণের মাধ্যমে শাসক ও ওমরাহদের মধ্যে নতুন নীতিশাস্ত্রীয় প্রেরণা সঞ্চার করছে। কনফুশিয়াসের কাছে কিছু মাত্রায় স্বায়ত্তচালিত মানবিক ব্যক্তিত্বের আদর্শ তাঁর সমগ্র মানবিকতাবাদের মতোই রাষ্ট্রচালনার প্রশ্নাদির সঙ্গে নিবিড়ভাবে জড়িত, যদিও তাতেই সীমিত নয়। নিজে তিনি ও তাঁর শিষ্যরা এমন শাসকদের চাকরি নেবার চেষ্টা করেছেন যারা তাঁদের পরামর্শ শুনবে।

কনফুশিয়াসের 'জিউনজি' এমন লোক যে ধনীও হতে পারে, দরিদ্রও হতে পারে, কুলীনও হতে পারে, অকুলীনও হতে পারে। শাসকের চাকরি নিয়ে সে থাকতে পারে উচ্চ পদে, আবার নিপীড়িতও হতে পারে। কনফুশিয়াস মনে করতেন ধনলাভ নির্ভর করে ভাগ্যের ওপর। ভাগ্যে যদি তা না থাকে, তাহলে তার জন্য চেষ্টা করে লাভ নেই; কিন্তু ধন থাকলে সেটাকে তিনি লোকের গুণ বলেই মনে করতেন। ঐশ্বর্যের মূল্যায়নে তাঁর প্রধান নীতি হল নৈতিক মাপকাঠি, কেবল মানবিকতা, সততা ইত্যাদির নিয়ম অনুসারেই ধনলাভ। তিনি বলেছেন, 'অসাধুতায় পাওয়া ধন ও মর্যাদা আমার কাছে আকাশে ভাসমান মেঘের মতো' ('লুন-ইউয়ি', অধ্যায়: শু এর, নং ১৭)।

চীনের রাজনৈতিক ভাবনা নিয়ে মার্কিন গবেষক হ. ক্রিল মনে করেন যে চীনে যে সমমাত্রিকতার তত্ত্ব ও প্রয়োগ গড়ে ওঠে, তা সমতা ও রাজনৈতিক গণতন্ত্র সম্পর্কে ইউরোপীয় বোধকেও প্রভাবিত করেছে*। কিন্তু,

---

৮*

কনফুশিয়াসের মতবাদে, শাস্ত্রীয় কনফুশিয়াসবাদে তো আরো বেশি করে, 'সমতা' দেখা দেয় কেবল সবার দ্বারা আচরণ ও ভাবনার একটা বাঁধিগৎ মেনে নেয়ায়, পরিণামে যা লোকেদের সামাজিক-অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক সোপানের ধাপে ধাপে বিভক্ত করে। পশ্চিমে রাজনৈতিক ও সামাজিক সাম্যের বোধ বিকশিত হয়েছে বুর্জোয়া ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের পথে।

কনফুশিয়াসের রাজনৈতিক মতবাদের যে দুর্বলতায় জাঙ্গো যুগে লেগি-জমের নিকট তার পরাজয় নির্ধারিত হয়ে যায়, সেটা হল আমলাতান্ত্রিক রাষ্ট্রযন্ত্রের পক্ষে আইন প্রণয়নের বিধিবদ্ধ রীতির গুরুত্ব ছোটো করে দেখা। সাম্রাজ্যীয় কনফুশিয়াসবাদে এই ত্রুটিটা শুধরে নেয়া হয়, কিন্তু জাঙ্গো যুগে আইনের প্রতি কনফুশিয়ান বিরূপতায় রাষ্ট্র বিশৃঙ্খলা এবং অচল হয়ে পড়া পিতৃতান্ত্রিক-কৌলিক দিকগুলি বিদূরণের গুরুত্বপূর্ণ হাতলগুলি হারায়। অথচ রাষ্ট্রপাট বিকাশের অবজেকটিভ দাবি ছিল আইনপ্রণয়নেরও তদনুরূপ বিকাশ। কনফুশিয়াসের যুগেই লড়াই চলছিল তিনি যাকে আমলাতান্ত্রিক যন্ত্রের ক্রিয়াকলাপের ভিত্তিরূপে স্থাপন করতে চেয়েছিলেন, সামাজিক নিয়ন্ত্রণের সেই ঐতিহ্যাগত নীতিশাস্ত্রীয় আচারধর্মী পদ্ধতি আর অপেক্ষাকৃত নতুন ধরনের নিয়ন্ত্রণ, বিধান প্রণয়নের মধ্যে। কনফুশিয়াসবাদ আর লেগিজমের মধ্যে সংগ্রামে মুখোমুখি হয়েছিল 'লি' আর 'ফা' (আইন)। কেবল খিঃ পূঃ তৃতীয় শতকেই চেষ্টা হয়েছিল 'লি'-কে আইন হিশেবে ব্যাখ্যা করার (সুন ৎসজি, খিঃ পূঃ ২৯৮-২৩৮), তাতে করে সাম্রাজ্যীয় কনফুশিয়াসবাদে লেগিজমের কতকগুলি দিক গ্রহণ করার ভিত্তি প্রস্তুত হয়।

কনফুশিয়াস নিজে কিন্তু রাজনীতির নীতিশাস্ত্রীয় ভিত্তিকে জড়িত করেন নি আইনের সঙ্গে, করেছেন ঐতিহ্যের সঙ্গে। তাঁর মতবাদে 'লি'-র কাজ হল শৃঙ্খলা স্থাপন ও আচরণ নির্ধারণে আইনের কাজ।

'লি-'র ভিত্তিতে শাসনে কনফুশিয়াস দেখেছিলেন, প্রথমত, ফলপ্রদতা: 'যদি ওপর তলায় আচার-অনুষ্ঠান পালিত হয়, তাহলে জনসাধারণকে চালনা করা সহজ' ('লুন-ইউয়ি', অধ্যায়: সিয়ান ভেন, নং ৪১)। আচার-অনুষ্ঠান পালন মারফত তিনি দূর করতে চেয়েছিলেন সামাজিক সংঘাত ও বিবাদ, যা বিচারসভা দ্বারা মীমাংসেয়।

দ্বিতীয়ত, 'লি'-র সাহায্যে শাসনের ফলপ্রদতা কনফুশিয়াস 'মানবিকতার' নীতির সঙ্গে জড়িত করে দেখেন। আইনে বোঝায় বলপ্রয়োগ, শাস্তিদান, যেক্ষেত্রে 'লি' হল স্বেচ্ছাক্রমে আচরণের নির্ধারিত আদর্শ পালন, তার ন্যায্যতার স্বীকৃতি: 'জনগণকে যদি শাসন করা হয় আইনের সাহায্যে, শৃঙ্খলা

রক্ষা করা হয় শাস্তি দিয়ে, তাহলে লোকে (শাস্তি থেকে) এড়িয়ে যেতে চেষ্টা করবে, লজ্জা পাবে না। যদি তাদের শাসন করা হয় সদাচার দিয়ে, শৃঙ্খলা রক্ষা করা হয় আচার-অনুষ্ঠান মারফত, তাহলে লোকে লজ্জা পাবে, নিজেদের সংশোধন করবে' ('লুন-ইউয়ি', অধ্যায়: ভেই জেন, নং ৩)। তবে একেবারেই আইনবিরোধী ছিলেন না কনফুশিয়াস। তিনি ছিলেন ঐতিহ্যাগত নিয়মাদির ঊর্ধস্থ বিধিবদ্ধ, জারি-করা আইনের বিরুদ্ধে। ব্যাপকভাবে আইন জারির নিন্দা করেছেন তিনি। তাঁর মতে, এতে ঐতিহ্যের ক্ষতি হবে।

অথচ আইনপ্রণয়ন প্রথার প্রয়োজন বেড়ে উঠেছিল প্রাচীন ঐতিহ্যের সংকটের পরিস্থিতিতেই, যার সংস্কারের চেষ্টা করেছিলেন কনফুশিয়াস। শাসক আমলাতন্ত্র ও অন্যান্য উচ্চ সম্প্রদায়ের স্বার্থ যাতে প্রতিফলিত হচ্ছিল সেই আদি চৈনিক রাষ্ট্রের বিকাশের প্রক্রিয়াতেই আইন সেখানে আগেই একটা স্বেচ্ছাচারী রূপ ধারণ করে। ফলে আইনসম্মত শাসনের ধারণাটা হেয় হয়ে পড়ে। এতে করে সামাজিক নিয়ন্ত্রণের ঐতিহ্যাশ্রয়ী-আচারধর্মী পদ্ধতির সর্বাধিক প্রয়োগে রাষ্ট্র শাসনব্যবস্থার পুনর্গঠনে সুবিধা হয় কনফুশিয়াসপন্থীদের।

কনফুশিয়াসের ঐতিহ্যানুরাগ তাঁর মতবাদের অনেক অন্তর্নিহিত স্ববিরোধিতার কারণ। যেমন, এক ধরনের 'সামর্থ্যের আভিজাত্য' মেনে নেবার সঙ্গে সঙ্গে তিনি কঠোর সামাজিক কাঠামো বজায় রাখা, সম্ভ্রান্ত ও অসম্ভ্রান্তের মধ্যে কড়া ভেদাভেদের পক্ষপাতী ছিলেন। আইনভিত্তিক শাসনের বিপক্ষে ছিলেন তিনি, কারণ, তাঁর মতে, তাতে উচ্চ-নীচে পার্থক্য মুছে যায়। তবে সম্ভ্রান্তদের উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত সুবিধা ও স্বার্থের রক্ষক বলে তাঁকে ভাবলে ভুল হবে। ব্যক্তিত্বের আদর্শ, 'মহানুভব স্বামী' ও আদর্শ ওমরাহ সম্পর্কে কনফুশিয়াসের ধারণা সর্বাগ্রে নির্ধারিত জন্মসূত্রে নয়, 'মানবপ্রেমের' গুণাবলি দিয়ে। সম্ভ্রান্তকে এইসব গুণাবলিতে ভূষিত হতে হবে। তাছাড়া, শাসকের, 'স্বর্গসন্তানের' নেতৃত্বে এমন কেন্দ্রীভূত শাসনব্যবস্থার পক্ষে ছিলেন কনফুশিয়াস, যাতে অভিজাতদের উত্তরাধিকারীরা পালন করবে কেবল আমলার ভূমিকা, আধিপত্য করবে না। সেইসঙ্গে লেগিজমপন্থীদের বিপরীতে কনফুশিয়াস শাসক শ্রেণীকে পুনর্গঠিত করতে চেয়েছিলেন প্রধানত ক্রমে ক্রমে, বিনা বেদনায়, কেন্দ্রীভূত আমলাতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছিলেন যথাসম্ভব পুরনো অভিজাত সম্প্রদায়ের সাহায্যে, তাদের আগেকার সুযোগ-সুবিধা বজায় রেখে। কনফুশিয়াস নিজেই ছিলেন শাসকবৃন্দের প্রতি প্রগাঢ় শ্রদ্ধাশীল, মহানুভব ব্যক্তি ও ওমরাহ সম্পর্কে তাঁর

যা আদর্শ তার বিরোধী হলেও তিনি প্রায়ই তাদের ত্রুটিকে প্রশ্রয় দিয়েছেন।

'মানবপ্রেম' ও 'আচার-অনুষ্ঠান' সম্পর্কে নিজ মতবাদ অনুসারে কনফুশিয়াস রাষ্ট্রযন্ত্র ও প্রতিটি আমলার কাজকর্মের কয়েকটা পৃথক পৃথক নীতি তুলে ধরেছেন। এর ভেতর তিনি বিশেষ স্থান দিয়েছেন সোপানতন্ত্রকে। শাসনব্যবস্থা চালাবে শাসক — 'স্বর্গসন্তান'; তাঁর ইচ্ছা আর স্বর্গীয় ইচ্ছা, উচ্চতম শাসন নীতি অভিন্ন। প্রত্যেক লোক, বিশেষ করে আমলাদের কঠোর সামাজিক কাঠামোর সঙ্গে, সমাজের প্রতিটি সদস্যের সুনির্দিষ্ট ও নিখুঁত কর্তব্যের সঙ্গে মানিয়ে নিতে হবে। কনফুশিয়াসের শিক্ষা: 'রাষ্ট্রপ্রভুকে হতে হবে রাষ্ট্রপ্রভু, ওমরাহকে ওমরাহ, পিতাকে পিতা, পুত্রকে পুত্র' ('লুন-ইউয়ি', অধ্যায়: ইয়ান ইউয়ান, নং ১১)। পারিবারিক ও শাসনতান্ত্রিক কর্তব্যের লঙ্ঘন বন্ধ করতে হবে।

কনফুশিয়াসের মতে, শাসনের ফলপ্রসূতা ও স্থিতিশীলতার জন্য দরকার সুগঠিত আমলাতান্ত্রিক যন্ত্র দ্বারা শাসকের সম্ভবপর অনাচার দমন। শাসনের এই নীতিটা এসেছে মহানুভব ব্যক্তির আদর্শ এবং তার নৈতিক আত্মোন্নতি সম্পর্কে তাঁর মতবাদ থেকে। শাসকদের কাছেও তিনি নৈতিক আত্মোন্নতির দাবি জানিয়েছেন। যে শাসকেরা পুণ্যবান নয়, তাদের সমালোচনার ভিত্তি এইটেই। অধীনস্থ প্রজাদের মতো শাসককেও সমানভাবে চালিত হতে হবে কালমাহাত্ম্যে পবিত্র মূল সত্যাদির সমষ্টিরূপ, 'দাও' (পথ) দ্বারা। দাওসিজম ও কনফুশিয়াসবাদে 'দাও'-এর বোধ বিভিন্ন। দাওসিজমপন্থীদের কাছে 'দাও' — 'ব্যাপার-স্যাপারের স্বাভাবিক পথ' হল নিষ্ক্রিয় বিরোধিতার ভিত্তি, শাসককে 'জ্ঞানদানে' অস্বীকৃত হতে তা ডাক দেয়, আর কনফুশিয়াসপন্থীদের কাছে 'দাও' হল রাজনৈতিক জীবনে সক্রিয় অংশ নেবার পথনির্দেশ।

জনগণের কল্যাণের জন্য শাসকের যত্ন এবং শাসকের উপর জনগণের আস্থাকে কনফুশিয়াস রাষ্ট্র শাসনের একটা অতি গুরুত্বপূর্ণ নীতি বলে মনে করতেন। কিন্তু তাঁর ক্ষেত্রে এ ধরনের 'জনবাদ' খোদ জনগণের আত্মচেতনা উদ্রেকে সাহায্য করে নি; আসলে রাষ্ট্রের স্বার্থকেই বসানো হয়েছে প্রথম স্থানে। কনফুশিয়াসের মতবাদে এমন প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থা নির্দেশের লক্ষ্য নেওয়া হয় নি যাতে সামাজিক গ্রুপের পক্ষ থেকে আমলাতান্ত্রিক যন্ত্রে আইনসঙ্গত হস্তক্ষেপ দ্বারা অনাচার নিবারণ, সমাজের পক্ষ থেকে সে যন্ত্রের উপর অবিরাম নিয়ন্ত্রণ নিশ্চিত হবে। আমলাতান্ত্রিক রাষ্ট্র পরিণত হয়েছিল রাজনৈতিক শৃঙ্খলার সচেতন রক্ষণশীলতার ব্যবস্থায়। এমনকি কনফুশিয়াস প্রচারিত শিক্ষার গুণকীর্তন, প্রাচীন সংস্কৃতির ঐতিহ্য

রক্ষণ ও উত্তরপুরুষদের দ্বারা তার অনুবর্তনেও জনগণের রাজনৈতিক আলোকপ্রাপ্তিতে সাহায্য হয় নি। কনফুশিয়ান শিক্ষা ব্যবস্থা রাষ্ট্রিক কর্মে সবচেয়ে সক্ষম লোকেদের বাছাই করা ও শিক্ষিত উচ্চকোটিকে আমলাতান্ত্রিক যন্ত্রের সঙ্গে মিলিয়ে দেবার কাজে লেগেছে। কনফুশিয়াসবাদ বিদ্যার্থীদের মনোদিগন্ত সীমাবদ্ধ রেখেছিল কেবল প্রাচীন পুঁথির ব্যাখ্যায়, আটকে রেখেছিল বহু সাধারণ-তাত্ত্বিক মানববিদ্যা ও প্রকৃতিবিজ্ঞানের বিকাশ।

খিঃ পূঃ দ্বিতীয় শতকেই প্রচলিত হতে থাকে কনফুশিয়াস পুজা। কনফুশিয়াসবাদ খিঃ পূঃ ১২০ সালে রাষ্ট্রীয় ভাবাদর্শ, এক ধরনের 'ঐহিক ধর্ম' বলে ঘোষিত হয় এবং শাস্ত্রীয় রূপে তা বহু শতক ধরে হয়ে থাকে সামন্ততান্ত্রিক রাষ্ট্রপাটের ভাবাদর্শীয় ভিত্তি।

সেইসঙ্গে স্বয়ং কনফুশিয়াসের দৃষ্টিভঙ্গি, আদি কনফুশিয়াসবাদ (মেন ৎসজি'র দৃষ্টিভঙ্গি সমেত) আর সাম্রাজ্যীয় কনফুশিয়াসবাদের মধ্যে পার্থক্যটা মনে রাখা দরকার।

আদি কনফুশিয়াসবাদের বৈশিষ্ট্য হল অন্যায়ের স্বরূপমোচন। অপুণ্যবান শাসককে উচ্ছেদ করার অধিকার জনগণের আছে বলে একটা তত্ত্ব রচনা করেন মেন ৎসজি। সাম্রাজ্যীয় কনফুশিয়াসবাদ কিন্তু পরিণত হয় বিদ্যমান ব্যবস্থার সমর্থন ও প্রশস্তিতে। সাম্রাজ্যীয় কনফুশিয়াসবাদকে প্রথম সূত্রবদ্ধ করেন দুন চ্‌জুন-শু (খিঃ পূঃ ২ শতক)। রাষ্ট্রের শাস্তিদায়ক ক্রিয়াকলাপ, প্রশাসনে শাস্তির ভূমিকা বিষয়ে লেগিজমপন্থীদের দৃষ্টিভঙ্গি গৃহীত হয় তাতে আর নৈতিক অনুশাসনে শাসকের নিকট বশ্যতাকে দেয়া হয় প্রধান স্থান। রাষ্ট্রযন্ত্রের গঠন ও ক্রিয়াকলাপের কেন্দ্রীভূতিমূলক এমন বহু নীতিও তাতে বিকশিত যা প্রথম পেশ করেছিল লেগিজমপন্থীরা (যেমন, প্রশাসনিক-আঞ্চলিক বিভাগ, সমবেত দায়দায়িত্ব, সম্ভ্রান্তদের আমলাতান্ত্রিক পদভেদ, সেন্সর ব্যবস্থাদির নীতি)। ১১-১২ শতকে সাম্রাজ্যীয় কনফুশিয়াস-বাদের সংস্কার সাধন করা হয় শাস্ত্রীভূত নয়াকনফুশিয়াসবাদ দিয়ে, তার আবির্ভাব ঘটে কেন্দ্রীভবনের বৃদ্ধি, জঙ্গী সামন্তবিদ্রোহ ও অন্তর্যুদ্ধের বিরুদ্ধে সংগ্রাম প্রসঙ্গে। আমলাতান্ত্রিক সামন্ততান্ত্রিক রাষ্ট্রপাটের দার্শনিক সমর্থনকে পুষ্ট করা হয় বৌদ্ধধর্ম ও দাও ধর্মের কিছু কিছু বক্তব্য ধার নিয়ে।

চীনের রাজনৈতিক চিন্তার ইতিহাসে যেমন তার আদি কনফুশিয়ান পর্বে, তেমনি তার লেগিস্ট প্রকারভেদে শাসক আমলাতান্ত্রিক ভাবাদর্শের বিপরীতে কোনো গণতান্ত্রিক উপায়ান্তর দেখা যায় নি।, উল্টে বরং, কনফুশিয়াসবাদ এবং লেগিজম পরিণামে মিলে যায় বাদশাহীতন্ত্র, বিধিবদ্ধ কনফুশিয়াসবাদে, রাজনৈতিক চিন্তায় তা একাধিপত্য করে, চীনা সমাজের বিভিন্ন শ্রেণী ও স্তরের রাজনৈতিক কৃষ্টি ও সামাজিক মনোভাবের ওপর গভীর প্রভাব বিস্তার করে। কনফুশিয়াসবাদের বিধিবিধানের প্রভাব দেখা যায় এমনকি চীনা ইতিহাসের বিভিন্ন পর্বে জন-অভ্যুত্থানের ভাবাদর্শেও, বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক আন্দোলনেও। চীন গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠার পর কনফুশিয়াস মতবাদের ভাগ্য জটিল ও বিরোধাত্মক, সমাজতন্ত্র নির্মাণে কনফুশিয়ান অনুশাসনের উপযোগিতা প্রমাণের প্রয়াস থেকে ৭০-এর দশকে মাওপন্থী কনফুশিয়াসবিরোধী অভিযান পর্যন্ত তা বিস্তৃত।

বিভিন্ন, বহুক্ষেত্রে এমনকি বিরোধী রাজনৈতিক লক্ষ্যে কনফুশিয়াসের মতবাদ যে ব্যবহৃত হতে পেরেছে, তার অনেকটা ব্যাখ্যা সম্ভবত এই যে তাঁর উক্তিগুলি সংক্ষিপ্ত, পটবিচ্ছিন্ন, সেইসঙ্গে খুবই সাধারণীকৃত, বিশদে ও প্রণালীবদ্ধরূপে তা পেশ করা হয় নি, মূর্ত-নির্দিষ্ট ঘটনা ও উপলক্ষের সঙ্গে তা সংশ্লিষ্ট হতে পারে। কনফুশিয়াসের দৃষ্টিভঙ্গির অবজেকটিভ স্ববিরোধিতারও একটা ভূমিকা আছে।

মাওবাদ ও কনফুশিয়াসবাদের মধ্যে সম্পর্কের কথা বলতে হলে তথাকথিত 'মাও সে-তুঙের চিন্তাধারায়' কনফুশিয়াসের প্রতিক্রিয়াশীল মর্মার্থ 'অতিক্রমের' কথাটা অলীক। বাদশাহী কনফুশিয়াসবাদের প্রতিক্রিয়াশীল ঐতিহ্য থেকে মাও সে-তুঙ নিয়েছেন আমলাতান্ত্রিক রাষ্ট্রযন্ত্র কর্তৃক সমাজের দমনের নীতিটা, শাসকের নিকট চিন্তাহীন বাধ্যতার প্রেরণায় জনগণের লালন। চীনকে স্বল্পকালের মধ্যে বিশ্বের একটা পরম শক্তি করে তোলার জন্য মাও সে-তুঙ ও তাঁর অনুগামীদের অহংকারী প্রয়াসের পেছনে ছিল দেশের অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক পশ্চাৎপদতার বিরুদ্ধে সংগ্রামে জনগণকে কায়দা করে লাগানোর চিরাচরিত পদ্ধতি, এমনকি সর্বগ্রাসী নিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রে নতুন 'উদ্ভাবন দিয়ে' তার পরিপূরণ। 'লিন পাও ও কনফুশিয়াসের সমালোচনা' নিয়ে মাওপন্থী যে অভিযান চলে, তার লক্ষ্য ছিল এক ধরনের কর্তৃত্বমূলক ভাবাদর্শের স্থানে তার ব্যক্তিপূজার চরিত্র অক্ষুণ্ণ রেখে আরেকটা কর্তৃত্বমূলক ভাবাদর্শের প্রতিষ্ঠা। বহু যুগের কনফুশিয়াস ঐতিহ্যে সাহায্য

হয় রাজনৈতিক নেতাদের দৃষ্টিভঙ্গি বিনা সমালোচনায় গ্রহণ করায়। মাওবাদ ও কনফুশিয়াসবাদ মিলে যায় তাদের ব্যক্তিপূজা চরিত্রে। সর্বোচ্চ শাসকের ব্যক্তিপূজার যে সমর্থন করেছেন কনফুশিয়াস, সে সম্পর্কে তদ্‌বিরোধী উক্ত অভিযানে মাওপন্থীরা যে চুপ করে থেকেছে, সেটা অকারণে নয়।

নতুন মানুষ, সমাজতান্ত্রিক সমাজের মানুষকে গড়ে তোলার কাজটা মাওবাদ দেখে 'বিষয়ীর পুনর্গঠন' বিষয়ে কনফুশিয়াস মতবাদের ধারায়, তাতে ভাবাদর্শীয় লালনে আশ্রয় নেয়া হয় বলাত্মক ব্যবস্থার, সরকারি অনুজ্ঞাগুলিকে পরিণত করার চেষ্টা হয় সামাজিক নৈতিকতায়। সমাজতান্ত্রিক নির্মাণের সক্রিয়, সচেতন অংশী হিশেবে নতুন মানুষ গড়ে তোলার মার্কসবাদী-লেনিনবাদী নীতির সঙ্গে এই কর্মসূচির কোনো মিল নেই। মাওপন্থীদের শাস্ত্রবাগীশ আত্মমুখিতাও একইভাবে পরিচালনার সংগঠন ও পলিসির সমাজতান্ত্রিক বৈজ্ঞানিক নীতির বিপরীত।

§ ৪। প্লেটো

মানবজাতির আত্মিক সংস্কৃতিতে, দার্শনিক ও রাজনৈতিক ভাবনার ইতিহাসে প্লেটোর (খিঃ পূঃ ৪২৭-৩৪৭) অবদান অসামান্য। রাজনৈতিক দর্শনের উদ্ভব তাঁর নামের সঙ্গেই জড়িত।

প্লেটোর জন্ম খুবই অভিজাত বংশে। তাঁর জন্মসূত্র পেঁছেছে আটিকার শেষ রাজা কড্‌র্‌ পর্যন্ত আর অতিকথা অনুসারে সমুদ্রদেব পসেইডন (রোমে যিনি নেপচুন) অবধি। এথেন্সের বিধানদাতা সলোনেরও জন্ম এই বংশে। তাঁর কাকা ক্রিটিয়াস 'তিরিশ টায়র্যান্টদের' (স্বৈরশাসক) একজন, এবং সফিস্টদের ও সক্রেটিসের ঘনিষ্ঠ। সম্ভবত সেই কারণেই সক্রেটিসের (খিঃ পূঃ ৪০৭) সঙ্গে প্লেটোর পরিচয়, যা তাঁর পক্ষে অত গুরুত্বপূর্ণ হয়েছিল।

তারুণ্যে প্লেটো রাজনীতিতে লিপ্ত হবেন বলে স্থির করেছিলেন। কিন্তু 'তিরিশ টায়র‍্যাণ্টদের' সময়কার কদর্য ব্যাপার-স্যাপার, তারপর গণতন্ত্র ক্ষমতায় ফিরলেও সক্রেটিসের বিচার ও মৃত্যুদণ্ডে (খ্রিঃ পূঃ ৩৯৯) সরাসরি রাজনীতিতে নামার ঝোঁক তাঁর উবে যায়। এথেন্স পরিত্যাগ করেন প্লেটো। প্রথমে তিনি যান পার্শ্ববর্তী মেগারা দ্বীপগুলিতে, পরে মিশর, দক্ষিণ ইতালি ও সিসিলিতে। পর্যটনের ফলে প্লেটোর জ্ঞান ও ধ্যানধারণা যথেষ্ট পুষ্ট হয়। অবিশ্যি সক্রেটিসের সঙ্গে সাক্ষাৎ হবার আগেও পিথাগোরাস (এবং তাঁর সম্প্রদায়), হেরাক্লিটাস, পার্মেনিডাস, ডেমোক্রিটাস ও সফিস্টদের মূল ভাবধারার সঙ্গে পরিচিত ছিলেন প্লেটো। নয় বছর ধরে সক্রেটিসের সঙ্গে মেলামেশায় তাঁর দার্শনিক, নৈতিক ও রাজনৈতিক জ্ঞান সমৃদ্ধ হয় তাই নয়, নিজের স্বাধীন ধারণা গড়ে উঠতেও সাহায্য হয়।

হেলিওপোলে মিশরীয় পুরোহিতদের সঙ্গে দীর্ঘ আলাপ এবং দক্ষিণ ইতালিতে পিথাগোরাসপন্থীদের সঙ্গে সাক্ষাৎও তাঁর পরবর্তী রচনায় রীতিমতো ছাপ ফেলেছে।

সিসিলির শাসককে দর্শনে দীক্ষিত করার জন্য একাধিক বার প্লেটোর সেখানে গমন বিফল হয়। স্বেচ্ছাচারের পক্ষে যে ঘোঁট স্বাভাবিক, তার ফেরে পড়ে তিনি প্রায় দাসত্বে বাঁধা পড়তে যাচ্ছিলেন, তবে বন্ধুদের তদ্বিরে তিনি নিরাপদে এথেন্সে ফেরেন খ্রিঃ পূঃ ৩৮৭ সালে।

এথেন্সের শ্যামল উপকণ্ঠে যা পুরাণের বীর আকাদেম নামাঙ্কিত, সেখানে প্লেটো একটি কুঞ্জবন সংগ্রহ করে স্থাপন করেন নিজের বিদ্যালয় — প্রখ্যাত আকাদেমি যা চালু ছিল প্রায় ১০০০ বছর (৫২৯ সালে সম্রাট ইউস্টিনিয়ান তা বন্ধ করে না দেওয়া পর্যন্ত)। প্রতিভাবান শিষ্যদের তারকামণ্ডলী দেখা দিল তাঁকে ঘিরে। তাঁদের মধ্যে ছিলেন আরিস্টটল প্রভৃতি দিক্‌পাল মনীষীরা।

প্লেটোর রাজনৈতিক দর্শন, রাজনীতি, রাষ্ট্র ও আইন সম্পর্কে তাঁর শিক্ষামালা তাঁর সমগ্র দর্শনধারার সঙ্গে অচ্ছেদ্যভাবে জড়িত, তা থেকে রাজনৈতিক-আইনী দিকটা আলাদা করে নেওয়া যায় কেবল আপেক্ষিক অর্থে।

দার্শনিক ভাববাদকে লেনিন অভিহিত করেছিলেন 'প্লেটোনিক ধারা'

বলে*। অবজেকটিভ ভাববাদ সম্পর্কে প্লেটোর ধারণার মূল কথা হল: 'সত্যকার সত্তা হল বুদ্ধিতে ধারণীয় কী-একটা বিদেহী ভাব' আর অনুভূতি দিয়ে আমরা যে অভিজ্ঞাত দেহ, বস্তু, ঘটনা পাই, সেটা সত্যকার জিনিস নয়, কেননা মোটেই তা সত্তার সঙ্গে নয়, চঞ্চল, ঘটমান কিছু একটার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট (দ্রঃ 'সফিস্ট', ২৪৬ বি)।

দেহ, বস্তু, ঘটনার জগৎকে প্লেটো অবশ্য অস্বীকার করেন না, তবে মনে করেন যে বিমূর্ততা, স্বতঃসিদ্ধি, জ্ঞানতত্ত্ব — সব দিক থেকেই তা অলীক, অস্বাধীন। ঘটনার জগৎ প্লেটোর কাছে ভাবের জগৎ থেকে একেবারে পৃথক ও বিচ্ছিন্ন নয়, কেননা প্রথমটা তার সমস্ত অলীকতা সত্ত্বেও দ্বিতীয়ের একটা বিকৃত অনুকরণ ও ক্ষীণ ছায়া। ভাবের জগৎ হল অস্থির মানবিক জগতের একটা শাশ্বত অপরিবর্তনীয় ঐশ্বরিক প্রক্ষেপ।

সত্যকার প্রজ্ঞান হল সত্তার, অর্থাৎ ভাব জগতের প্রজ্ঞান। সেটা শুধু 'বিরল লোকেদের' — দার্শনিকদের অধিগম্য ('রাষ্ট্র', পাঁচ, ৪৭৬সি)।

প্লেটোর মতে, দার্শনিক হওয়া জনতার প্রকৃতিসিদ্ধ নয়।

ভাব হল বস্তুর প্রতিমা ও মর্ম, তার অভিজ্ঞতালব্ধ চঞ্চল, অস্থির তাৎপর্যের অর্থ। এইদিক থেকে বস্তুর চেয়ে ভাব যে আদি সেটা হল পরিবর্তনশীল বস্তু ও ঘটনার বহুরূপী অভিজ্ঞতালব্ধ তাৎপর্যের চেয়ে একক চিন্তার আদিত্ব।

ভাবের জগৎ হল বস্তু ও ঘটনার চিন্তারূপী পট। যখন সত্যকার সত্তা ও ঐশ্বরিক আদিরূপের প্রতিরূপ মননের প্রশ্ন ওঠে, ঘটনা ও সম্পর্কের পার্থিব জগৎকে সুশৃঙ্খল করার প্রশ্ন ওঠে (যেমন, রাজনৈতিক-আইনী ব্যাপারাদি), তখন ঘটনার জগতের বিমূর্ত ভিত্তি ও আদি কারণ হিশেবে শুধু নয়, ভাব হয়ে দাঁড়ায় তার সংঘটনের পরিচালক নীতি, মাপকাঠি, আদর্শ (পারাডিগম)।

প্লেটোর ব্যাখ্যায় ('রাষ্ট্র' নিয়ে কথোপকথনে) আদর্শ রাষ্ট্র হল ভাবের বাস্তবায়ন, ভাবজগতের পার্থিব সামাজিক-রাজনৈতিক জীবনে, রাজ্যশাসন ব্যবস্থায় যথাসম্ভব রূপায়ণ।

আদর্শ, ন্যায়পরায়ণ রাষ্ট্রের নির্মিতিতে প্লেটো এগিয়েছেন তাঁর এই অভিমত থেকে যে সমগ্র বিশ্বজগৎ, রাষ্ট্র এবং এক-একটি মানবাত্মার মধ্যে সামঞ্জস্য আছে। ন্যায় ব্যাপারটাই এমন যে ন্যায়নিষ্ঠ ব্যক্তি ন্যায়পরায়ণ রাষ্ট্র থেকে আদৌ স্বতন্ত্র নয়, বরং তৎসদৃশ। সত্ত্ব, রজঃ, স্পৃহা — মানবাত্মার এই তিন গুণের অনুরূপ হল রাষ্ট্রের তিনটি নীতি: মন্ত্রণা,

—

আরক্ষা ও ব্যবস্থাপন। শেষেরগুলির ভেতরে পড়ে তিনটি সম্প্রদায় — শাসক, সৈন্যদল এবং উৎপাদক (কারিগর আর চাষি)।

অপরের ব্যাপারে হস্তক্ষেপ না করে নিজ নিজ কাজে ব্যাপৃত থাকাই হল ন্যায়পরায়ণতা। তাছাড়া ন্যায়পরায়ণতার জন্য আবশ্যক, প্লেটোর মতে, সমগ্রের স্বার্থে প্রত্যেককে ধাপে ধাপে অধীনস্থ থাকতে হবে তার সংশ্লিষ্ট অগ্রনীতির: সত্ত্ব গুণের (অর্থাৎ যাদের মধ্যে এ গুণ মূর্তিমান, সেই দার্শনিকদের) উচিত রাজ্যশাসন; রজোগুণের (যোদ্ধাদের) উচিত দেশের সশস্ত্র প্রতিরক্ষা, প্রথম গুণের অধীনস্থ। এই দুটি ব্যাপারই আবার চালাবে স্পৃহার গুণ (কারিগর, চাষি ও অন্যান্য উৎপাদকদের), যা 'প্রকৃতিগতভাবেই ধনলাভে তৃষিত' ('রাষ্ট্র', চার, ৪৪২)।

রাষ্ট্র উদ্ভবের ব্যাখ্যায় প্লেটো তাঁর অধিকারভেদী সম্প্রদায়ের যুক্তি দিয়েছেন শ্রমবিভাগে। পলিস বা নগর রাষ্ট্র বলতে প্লেটো বুঝিয়েছেন সাধারণ চাহিদায় মিলিত অধিবাসীবৃন্দকে। প্লেটো বিশদে আলোচনা করেছেন যে এসব চাহিদা সবচেয়ে ভালো মিটবে প্রজাদের শ্রমবিভাগে। মার্কস বলেছেন: 'প্লেটোর রিপাবলিকে শ্রমবিভাগ হল রাষ্ট্র গঠনের মূল নীতি, সেটা শুধু মিশরীয় বর্ণভেদ ব্যবস্থার এথেন্সীয় আদর্শায়ন...'*

আদর্শ রাষ্ট্রের নাগরিকদের শিখিয়ে তোলার দিকে খুবই মনোযোগ দিয়েছেন প্লেটো। তার লক্ষ্য হল প্রবর্তিত সম্প্রদায়-সোপানের অনুসরণ ও পুনরাবর্তন, ব্যক্তিগত ও রাজনৈতিক (সামগ্রিক) জীবনে একবার প্রবর্তিত ব্যবস্থার কঠোর পালন।

আদর্শরূপে শিখিয়ে তোলার ওপর পুরো ভরসা না থাকায় প্লেটো আদর্শ রাষ্ট্রের নাগরিকদের মধ্যে এই 'শুভ ভাবনা' প্রচারের ওপর খুবই আস্থা রেখেছেন যে সবাই তারা ভূমিখণ্ডে ভূমিষ্ঠ, তাই যে দেশে তারা বাস করে তার জন্য, তাকে রক্ষার জন্য তাদের উদ্যোগী হতে হবে। প্লেটোর ভাষ্যে পুরাকথার অনুবর্তন এইরূপ 'রাষ্ট্রের সকল সদস্য ভ্রাতা হইলেও (পুরাকথা অনুসরণে এমনভাবে বলিব তাহাদের), তোমাদের গড়িবার সময় ঈশ্বর তোমাদের মধ্যে যাহারা শাসন করিবার যোগ্য তাহাদের জন্মে তিনি মিশাইয়াছেন সোনা, তাই তাহারা বেশি মূল্যবান, এবং তাহাদের সাহায্যকারীদের — রূপা, চাষি ও বিভিন্ন কারিগরদের মধ্যে তিনি মিশাইয়াছেন লোহা আর তামা' ('রাষ্ট্র', তিন, ৪১৫)।

এই পুরাকথাটার তাই উদ্দেশ্য ছিল নাগরিকদের বশ্যতা, একাভিমত ও ভ্রাতৃত্বের সঙ্গে আদর্শ রাষ্ট্রে তাদের অসাম্য প্রতিষ্ঠিত করা। এটা অবশ্য সত্যি যে নাগরিকদের কঠোর সম্প্রদায়ভেদ করে থাকলেও প্লেটো মনে রেখেছেন যে স্বর্ণ থেকে হতে পারে রৌপ্য এবং রৌপ্য থেকে স্বর্ণ বংশধর।

প্লেটো যে সম্প্রদায়ান্তর (কিন্তু স্বেচ্ছায় নয়!) মেনে নিয়েছেন তার লক্ষ্য হল ভাবনার শুচিতা এবং যথাযোগ্য সম্প্রদায়ে আদি বিভাগের নীতি রক্ষা। রাষ্ট্র যদি রক্ষা করে লৌহ কিংবা তাম্র প্রহরী, তাহলে তা ধ্বংস পাবে, পুরাকথাটার এ সাবধানবাণীও নেহাৎ এমনি-এমনি নয়।

প্রহরীরা যাতে তাদের কর্তব্যের সমমাত্রায় থাকে, তার জন্য তাদের গোটা জীবনযাত্রা সংগঠিত হবে সংহতি, মিলন, সাম্য ও যূথবদ্ধতার প্রেরণায়। প্লেটো এই কথায় জোর দিয়েছেন যে 'প্রথমত নিতান্ত প্রয়োজন না থাকলে কারো ব্যক্তিগত সম্পত্তি রাখা চলবে না। তারপর কারো এমন বাসগৃহ বা ভান্ডার থাকা চলবে না যেখানে ইচ্ছুক মাত্রেরই প্রবেশাধিকার নেই' ('রাষ্ট্র', তিন, ৪১৬ডি)। প্রহরীরা তাদের প্রয়োজনীয় রসদ পাবে তৃতীয় সম্প্রদায় থেকে। তারা থাকবে, খাবে একত্রে, অভিযান কালের মতো। সোনা আর রুপো ব্যবহার করা শুধু নয়, স্পর্শ করাও তাদের পক্ষে নিষিদ্ধ।

প্লেটোর মতে, আদর্শ রাষ্ট্র গঠনের পক্ষে নির্ধারক তাৎপর্য ধরে প্রহরীদের স্ত্রী ও শিশুদের বারোয়ারি। আদর্শ রাষ্ট্রে অধিকার ও সুযোগ-সুবিধার দিক থেকে নারীরা পুরুষের সঙ্গে সমান।

প্রথম দুই সম্প্রদায়ের ক্ষেত্রে সাধারণ অর্থে পরিবার নেই। শিশুদের পালন করবে রাষ্ট্র। সন্তানোৎপাদনের জন্য যৌন সঙ্গম কঠোরভাবে ধরাবাঁধা, চরিত্র তার সম্প্রদায়সীমিত। প্রহরীদের ব্যক্তিগত পরিবার নাকচ করে প্লেটো আশা করেন তারা সবাই পরিণত হবে একক শাসক পরিবারের সদস্যে, যেখানে সবাই সবার আত্মীয়।

বিবাহ, জীবনযাত্রা, সম্পত্তি, শ্রম, তথা তৃতীয় সম্প্রদায়ভুক্তদের গোটা জীবন নিয়মবদ্ধ করার দায়িত্ব প্লেটো ছেড়ে দিয়েছেন আদর্শ রাষ্ট্রের ক্ষমতাধরদের হাতে। তাঁর প্রধান আগ্রহ স্বয়ং শাসক ও তাদের সহকারীদের নির্বাচন ও শিক্ষাদানে। 'রাষ্ট্র' গ্রন্থে তৃতীয় সম্প্রদায় সম্পর্কে প্লেটো যে ইচ্ছাপূর্বক অনির্দিষ্টতা রেখেছেন, তাতে সংশোধন সহকারে ধরা উচিত যে সমগ্রভাবে এ সম্প্রদায়ের লোকেরা দাস নয়, স্বাধীন।

প্লেটো ঐশ্বর্য ও দারিদ্র্যের মধ্যে চূড়ান্ত পার্থক্যের বিরোধী, নরমপন্থা, মাঝামাঝি সচ্ছলতার পক্ষ নিয়েছেন তিনি। অন্য সমস্ত রাষ্ট্র থেকে প্রকল্পিত

আদর্শ রাষ্ট্রের প্রধান সামাজিক-অর্থনৈতিক তফাৎ এই যে প্লেটোর মতে সাধারণ প্রতিটি রাষ্ট্রই হল 'একাধিক রাষ্ট্র... তা যেমনই হোক না কেন, তাতে থাকে পরস্পরবিরোধী দুটি করে রাষ্ট্র: একটা গরিবদের, অন্যটা ধনীদের; আর তাদের প্রতিটির ভেতরেও আবার বহু রাষ্ট্র, তাই রাষ্ট্রকে এক বলে দেখতে গেলে তুমি ভুল করবে' ('রাষ্ট্র', চার, ৪২৩)। বলতেই হবে প্লেটো এখানে একটা মোক্ষম কথা বলেছেন, দারিদ্র্য ও ঐশ্বর্যের মধ্যে সামাজিক-অর্থনৈতিক বৈপরীত্যের রাজনৈতিক তাৎপর্যকে দেখিয়েছেন পরস্পরবিরোধী দুই নীতিতে বাহ্যত ঐক্যবদ্ধ রাষ্ট্রের ভাঙন হিশেবে। প্লেটো মনে করেন সমগ্র রাষ্ট্রের সুখের জন্য তিনি যে ব্যবস্থাদির প্রস্তাব দিচ্ছেন, তাতে এই ভাঙনের সমস্যা ও অভ্যন্তরীণ যুদ্ধের কারণ দূর হবে।

প্লেটোর আদর্শ রাষ্ট্র হল সেরা লোকেদের ন্যায়সঙ্গত শাসন। বৈধ আর ন্যায্য যে অভিন্ন সক্রেটিসের এই স্বাভাবিক-আইনী অভিমত তিনি মানেন, কেননা তাদের ভিত্তিতে রয়েছে ঐশ্বরিক (প্লেটো যোগ করেন, আদর্শ) প্রেরণা। সর্বাধিক বলবানের কাছে যা উপযোগী সেইটাই ন্যায্য, সফিস্ট থ্রাজিমাখের এই বক্তব্যের বিস্তারিত সমালোচনা করেছেন তিনি।

দার্শনিকদের শাসন আর ন্যায্য আইনের কার্যকারিতা প্লেটোর কাছে একই আদর্শ প্রকল্পের দুই পরস্পরসম্পৃক্ত দিক।

'রাষ্ট্র' গ্রন্থে প্লেটো যা বলেছেন, সত্যকার দার্শনিকেরা ক্ষমতার জন্য লোলুপ নয়, কিন্তু বাকি সবার এবং রাষ্ট্রের কল্যাণের জন্য তাদের শাসন প্রয়োজন। দার্শনিকদের জন্য রাষ্ট্র নয়, রাষ্ট্রের জন্য দার্শনিক। লোকেদের জন্য রাষ্ট্রীয় যত্নের খাতিরে ধ্যানের শিখর থেকে লোকেদের কাছে দার্শনিকদের প্রত্যাবর্তন দাবি করেছেন প্লেটো।

রাজনৈতিক ক্ষমতায় দর্শনের অধিকার নিয়ে যে নীতিবাক্যটা সুবিদিত তাকে প্লেটো সূত্রবদ্ধ করেছেন এই বিখ্যাত উক্তিতে: 'যতদিন না রাষ্ট্রে দার্শনিকরা রাজত্ব করছে, অথবা বর্তমানের তথাকথিত রাজা ও ক্ষমতাধররা উত্তম ও আমূল ভাবে দার্শনিক না হয়ে উঠছে এবং রাষ্ট্রক্ষমতা ও দর্শন এক হয়ে মিলে না যাচ্ছে এবং যেসব লোক আলাদা আলাদা ভাবে হয় ক্ষমতা নয় দর্শনের দিকে ঝুঁকছে আর তাদের সংখ্যা অনেক — তারা যতদিন না অবশ্য-অবশ্যই দূর হচ্ছে, ততদিন, হে প্রিয়বর গ্লাউকন, অমঙ্গল থেকে রাষ্ট্রের পরিত্রাণ নেই এবং যে রাষ্ট্র ব্যবস্থার কথা আমরা এক্ষুনি মুখে বললাম মানববংশের পক্ষে তা সম্ভব হবে না এবং সূর্যালোক তা দেখবে না' ('রাষ্ট্র', পাঁচ, ৪৭৩ডি)।

শ্রেষ্ঠ ও মহৎদের শাসনরূপী আদর্শ রাষ্ট্রের গঠনটা আভিজাতিক। সেরা ধরনের এই রাষ্ট্র ব্যবস্থা হতে পারে, প্লেটোর মতে, হয় রাজক্ষমতা (যদি শাসকদের মধ্যে কেউ একজন স্বতন্ত্র হয়ে ওঠে), নয় অভিজাতক্ষমতা (যদি শাসক হয় কতিপয় লোক)।

আদর্শ রাষ্ট্রে মূল রাজনৈতিক অধিকার শাসক ও তার সাহায্যকারীদের হাতে কেন্দ্রীভূত। তৃতীয় সম্প্রদায়ের লোকেদের উচ্চ সম্প্রদায়ে অনুপ্রবেশ এবং রাষ্ট্রীয় পদ লাভ, প্লেটোর মতে রাষ্ট্রের সর্বনাশ সমতুল্য।

প্লেটোর দৃঢ় বিশ্বাস এই যে দুরূহতার মধ্য দিয়ে হলেও আদর্শ রাষ্ট্রের প্রকল্প বাস্তব হতে পারে। তাঁর কাছে অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ হল আদর্শ রাষ্ট্রের নিদর্শনটি যেন ইচ্ছুক মাত্রেরই বোধগম্য হয়, সে নিদর্শন আছে আকাশে, ইতিমধ্যেই আদর্শরূপে বিদ্যমান। 'আর সেরূপ রাষ্ট্র কি পৃথিবীতে আছে, হবে কি, এটা একেবারেই গুরুত্বপূর্ণ নয়' ('রাষ্ট্র', নয়, ৫৯২বি)।

কিন্তু আদর্শ রাষ্ট্র যদি পৃথিবীতেও দেখা দেয়, তাহলেও তা চিরকালীন হবে না। সামাজিক-রাষ্ট্রিক ব্যবস্থার পরিবর্তন ও পালাবদলকে প্লেটো বোঝেন নির্দিষ্ট একটা চক্রের মধ্যে আবর্তন হিশেবে। পাঁচ ধরনের রাষ্ট্র ব্যবস্থা (অভিজাততন্ত্র, মর্যাদাতন্ত্র, গোষ্ঠীতন্ত্র, গণতন্ত্র ও স্বৈরতন্ত্র) আর পাঁচ ধরনের চিত্তবৃত্তির মধ্যে সামঞ্জস্য আছে বলে তিনি ধরেন। তাঁর মতে এমনকি জ্যামিতিক সংখ্যাও আছে যা দিয়ে মানবজাতির উত্তরপুরুষদের জন্য আবর্তনের সময়ও স্থির করে দেওয়া যাবে, জন্মের গুণাগুণ নির্ধারণে যা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। সমগ্রভাবে চক্রের মধ্যে পাঁচটি রাষ্ট্র ব্যবস্থার আবর্তন ঘটছে মানব স্বভাব নষ্ট হয়ে যাওয়ার দরুন, তার ফলে লোহা মিশছে রুপোর সঙ্গে, তামা সোনার সঙ্গে, দেখা দিচ্ছে অসামঞ্জস্য আর বিচ্যুতি, শত্রুতা আর বিরোধ।

সঠিক রূপের অভিজাততান্ত্রিক রাষ্ট্র ব্যবস্থাকে প্লেটো দাঁড় করিয়েছেন বাকি চারটি নষ্ট ও ভ্রান্ত ব্যবস্থার বিপরীতে, এগুলিকে তিনি অধঃপতনের ক্রম অনুযায়ী বর্ণনা করেছেন 'রাষ্ট্র'এর অষ্টম গ্রন্থে। তাতে তিনি যুক্তি দিয়েছেন নানা রকমের (দার্শনিক, ঐতিহাসিক, রাজনৈতিক, মনস্তাত্ত্বিক, অতিকথামূলক, অতীন্দ্রিয়বাদী ইত্যাদি) এবং রাজনৈতিক জীবন ও তার রূপ বদলের একটা গতিশীল চিত্র তুলে ধরেছেন। আদর্শ অভিজাততন্ত্রের অধঃপতনে দেখা দেয় ভূমি ও গৃহের উপর ব্যক্তিগত সম্পত্তি, স্বাধীনরা দাসে পরিণত হয়।

রাষ্ট্রে সত্ত্ব নীতির স্থলাভিষিক্ত হয় রজঃ। এটা হল মর্যাদাতন্ত্র, যা বলতে

তিনি কুট-লাসেদেমোন ধরনের রাষ্ট্র ব্যবস্থা বুঝিয়েছেন। এ ধরনের রাষ্ট্র বরাবর যুদ্ধ চালিয়ে যাবে। আর প্লেটোর মতে, যুদ্ধ 'যখন চলতে থাকে, তখন তা ব্যক্তিগত ও সামাজিক দুর্দশার প্রধান উৎস হয়' ('রাষ্ট্র', দুই, ৩৭৩ই)। গ্রীকদের মধ্যে অন্তর্যুদ্ধ তাঁর কাছে সবিশেষ ঘৃণ্য। যুদ্ধে ও কলহে নিমজ্জিত মর্যাদাতান্ত্রিক রাষ্ট্র নষ্ট হওয়ায় ব্যক্তিগত মালিকানায় বিপুল সম্পদ সঞ্চিত হবার ফলে দেখা দেয় গোষ্ঠীতন্ত্র। এ ব্যবস্থাটার ভিত্তি হল সম্পত্তিভিত্তিক অধিকার। ক্ষমতায় যায় ধনীরা, গরিবেরা শাসনে অংশ নেয় না। গোষ্ঠীতন্ত্র টিকে থাকে ভীতি প্রদর্শন ও সশস্ত্র শক্তি প্রয়োগে। গোষ্ঠীতান্ত্রিক রাষ্ট্র অভ্যন্তরে দ্বিধাবিভক্ত: তাতে গরিবদের রাষ্ট্র আর ধনীদের রাষ্ট্র পরস্পরের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান। লোভী ও অপদার্থ ধনীদের বিরুদ্ধে বিদ্বেষ জমে ওঠে নির্বৃত্তদের মধ্যে, পরিণামে রাষ্ট্রবিপ্লব ঘটে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয়। প্লেটো লিখেছেন ('রাষ্ট্র,' আট, ৫৫৭): 'গণতন্ত্র, আমার মতে, তখন প্রতিষ্ঠিত হয় যখন জয়লাভ করে দরিদ্ররা তাদের প্রতিপক্ষদের কয়েকজনকে নিশ্চিহ্ন করে, অন্যদের ভাগিয়ে দেয় এবং অবশিষ্টদের নাগরিক অধিকার ও রাষ্ট্রীয় পদ দিয়ে সমান করে দেয়, গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় এই পদগুলি দেওয়া হয় অধিকাংশ ক্ষেত্রে লটারি করে।'

সমগ্রভাবে গণতন্ত্রকে প্লেটো প্রীতিকর ও রকমারি ব্যবস্থা বলে মনে করেন, কিন্তু তাতে উচিতমতো শাসন নেই। গণতন্ত্রের সাম্য সমান এবং অসমান উভয়কেই সমান করে দেয়।

তিনি মনে করেন যে মিথ্যা মতামত জনতার প্রকৃতিগত হওয়ায় গণতন্ত্রের আমলে নৈতিক দিশা থাকবে না, মূল্যবোধগুলির নব মূল্যায়ন ঘটবে: 'ঔদ্ধত্যকে তারা বলবে জ্ঞানালোক, অসংযমকে — স্বাধীনতা, লাম্পট্যকে — মহত্ত্ব, নির্লজ্জতাকে পৌরুষ' ('রাষ্ট্র', আট, ৫৬১)।

দোষদুষ্ট রাষ্ট্রে যেটাকে ধরা হয় কল্যাণ, যার জন্য লোকে আপ্রাণ চেষ্টিত (মর্যাদাতান্ত্রিক রাষ্ট্রে — সামরিক সাফল্য, গোষ্ঠীতান্ত্রিক রাষ্ট্রে — ধন, গণতন্ত্রে — স্বাধীনতা) সেইটাই হয়ে দাঁড়ায় নির্দিষ্ট রাষ্ট্রটির পক্ষে সর্বনাশা। অন্য কথায়, প্রতিটি রাষ্ট্র ধ্বংস পায় সে রাষ্ট্র গঠনের যা মূলনীতি তার প্রকৃতিগত অন্তর্নিহিত বিরোধ এবং সে নীতির অপব্যবহারের দরুন।

প্লেটো আরো মনে করেন গণতন্ত্র অধঃপতিত হয় তার বিপরীতে — স্বৈরতন্ত্রে। মাত্রাধিক স্বাধীনতা আবর্তিত হয় মাত্রাধিক দাসত্বে। স্বৈরতন্ত্র হল সবচেয়ে নিকৃষ্ট ধরনের রাষ্ট্র ব্যবস্থা, সেখানে আইনহীনতার রাজত্ব, ধ্বংস

পায় লোকে, যারা স্বৈরশাসকের সম্ভাব্য প্রতিপক্ষ। স্বৈরতন্ত্র হল দুর্বৃত্তগোষ্ঠী পরিবেষ্টিত সবচেয়ে খারাপ লোকের আধিপত্য।

'রাষ্ট্র'এর অষ্টম গ্রন্থে স্বৈরাচারের যে সমালোচনা প্লেটো করেছেন, তা সম্ভবত সমগ্র বিশ্ব সাহিত্যের মধ্যে সবচেয়ে জাজ্বল্যমান। একথা অবিশ্যি ঠিক যে স্বৈরশাসককে নাকি দিন কাটাতে হয় অভিজাত রাজার চেয়ে ৭২৯ গুণ কষ্টে, 'রাষ্ট্র'এর নবম গ্রন্থে (৫৮৭ই) প্লেটোর এ যুক্তি অবিশ্বাস্য। বোঝা যাচ্ছে রাষ্ট্র রূপ পরিবর্তনের সমগ্র চক্রের ভেতর সুখের দোলন সীমা অতটাই।

প্লেটোর রাজনৈতিক দর্শনের বহু দিক আরো বিকশিত হয় তাঁর পরবর্তী কালের কথোপকথনগুলিতে ('ক্রিটিয়াস', 'পলিটিক', 'আইন')। তিনি যেসব অতিকথা ও পুরাকথার উল্লেখ করেছিলেন, তাতে যে ধরনের বিস্তৃত এবং মূলত সংবাদ গোছের মালমশলা ছিল, তা থেকে তিনি সরে এসেছেন এক্ষেত্রে। আগেকার সক্রেটিস কথোপকথনের কালে যখন তিনি ঝুঁকেছিলেন যুক্তিবাদী বিশ্লেষণ ও এক-একটা বোধের সংজ্ঞা নির্ণয়ে, সে তুলনায় তাঁর পরবর্তী কালের তত্ত্বানুসন্ধানে তিনি এগিয়েছেন দার্শনিক মননশীলতায় এবং অতিকথার সারগর্ভ তথ্যের নিজস্ব বিচারে।

অতিকথায় নিবদ্ধ অতীতের যেসব ঘটনার ভূমিকা ও তাৎপর্য, প্লেটোর মতে, মানব জীবনের পক্ষে ক্ষণিক নয়, তার আদর্শায়ন এখানে হাজির করা হয়েছে দিশার চেতনা আকারে। অতিকথার ঘটনাবলি (দেবতাদের উপস্থিতি, এক-একটা অঞ্চলে পার্থিব মানুষদের চালাবার জন্য তাঁদের ব্যবস্থা, লোকেদের রাজনৈতিক জ্ঞান সমেত সাধারণ জ্ঞানালোক ও সংস্কৃতি বৃদ্ধিতে অভ্যস্ত করা, ইত্যাদি) হয়েছে পরবর্তী কালীন প্লেটোর দার্শনিক ও রাজনৈতিক নির্মিতির যাত্রাবিন্দু। তাঁর মতে, কেবল এইসব ঘটনার আলোকেই উত্তরকালের মানুষের ব্যাপার-স্যাপার নিয়ে চিন্তা করা সম্ভব। অতীতের যেসব খবর প্লেটোর হাতে ছিল, তা নেহাৎ মামুলি নয় (যেমন, আটলান্টিসের কথা আমরা প্রথম শুনি তাঁর কাছ থেকেই); সম্ভবত এগুলি তাঁর কাছে পৌঁছেছে অংশত বিখ্যাত পূর্বপুরুষদের কাছ থেকে (ক্রিটিয়াস মারফত সলোন থেকে), অংশত সরাসরি মিশরীয় পুরোহিতদের কাছ থেকে, যারা তাদের প্রশস্ত জ্ঞানের শিখর থেকে গ্রীকদের মনে করত এদিক দিয়ে ছেলেমানুষ আর অজ্ঞ। যেমন, জ্যেষ্ঠ ক্রিটিয়াস (খুব সম্ভব, ক্রিটিয়াসের পিতামহ, সফিস্ট ও

স্বৈরশাসক) বহুকাল আগের আদর্শ রাষ্ট্রের কথা প্রসঙ্গে 'পুরোহিতেরা যা জানিয়েছিল আর সলোন এখানে যা নিয়ে এসেছিল' ('ক্রিটিয়াস', ১০৮) তার উল্লেখ করেছিলেন। উল্লিখিত কিংবদন্তি অনুসারে হেরাক্ল স্তম্ভের (অর্থাৎ জিব্রাল্টারের) দুই দিকে বসবাসী জনগোষ্ঠীর মধ্যে যুদ্ধ হয়েছিল নয় হাজার বছর আগে (সলোনের সময় থেকে)। প্রথম দলের প্রধান ছিল আটলান্টিস দ্বীপের রাজারা, দ্বিতীয় দলের নেতৃত্বে প্রাগৈতিহাসিক এথেন্স। প্রাচীন এথেন্স ও আটলান্টিসকে প্লেটো বর্ণনা করেছেন এই বলে যে তারা মানবজীবনের ঐশ্বরিক সংগঠন ও পৃথিবীবাসীদের শাসনের আদর্শ।

'ক্রিটিয়াস'এ তিনি প্রাচীন এথেন্সের যে সমাজসংগঠনের ছবি দিয়েছেন তাতে যদি মনে পড়ে 'রাষ্ট্র'এ তাঁর আদর্শ প্রকল্পের কথা, তাহলে 'বহু বিশেষ বিধিবিধান' ('ক্রিটিয়াস', ১২০বি) ছিল যে পসেইডন অনুজ্ঞাগুলিতে, তার ভিত্তিতে আটলান্টিস প্রশাসনের মূলকথাটা একটা নতুন অর্থলাভ করেছে 'আইন' গ্রন্থে।

বহু গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক-আইনী সমস্যার ওপর প্লেটো আলোকপাত করেছেন 'পলিটিক' কথোপকথনে। এতে যে অতিকথার উল্লেখ তিনি করেছেন তাতে জিউসেরও আগে, ক্রনোসের কালে লোকজীবনের কথা আছে। মহাবিশ্ব ভাগে ভাগে এক-একজন অধিপতি দেবতাকে দেওয়া ছিল আর ঐশ্বরিক রাখালেরা (অধ্যাত্মা) বন্যতা আর পারস্পরিক ভক্ষণ থেকে লোকেদের রক্ষা করত। বিনা যুদ্ধবিবাদে মানুষের জীবন বয়ে চলত প্রকৃতির সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে। 'দেবতার পরিচালনায় থাকায় কোনো রাষ্ট্র ছিল না, নারী ও শিশুদের ওপর কোনো মালিকানাও ছিল না...' ('পলিটিক', ২৭২)। প্লেটোর মতে, তখনকার লোকে বর্তমানের তুলনায় ছিল অশেষ সুখী। কিন্তু কালক্রমে মহাবিশ্বে পরিবর্তন শুরু হল এবং নিজেদের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে মহাবিশ্বের যে অংশগুলো (মানুষ সমেত) ছিল, সমস্ত আঞ্চলিক দেবতা তা হারাল। লোকেরা তখনো দুর্বল, অসহায়, এতে তারা পড়ল বিষম কষ্টে। কিন্তু দেবতারা নিজেরা সরে গেলেও লোকেদের প্রয়োজনীয় শিক্ষাদানের সঙ্গে সঙ্গে দিয়ে গেল আগুন, শিল্পকলা, বীজ আর উদ্ভিদ।

তাই প্লেটোর অতিকথার আশ্রয় নেওয়ার উদ্দেশ্য ছিল, মহাবিশ্বে পরিবর্তন ঘটার আগে লোক পরিচালনার যে মহাজাগতিক-ঐশ্বরিক আদিনিদর্শন ছিল, তা থেকে মানব জীবন সংগঠনের সঠিক রূপ অনুকরণের প্রয়োজনীয়তাকে প্রতিষ্ঠিত করা।

প্লেটোর মতে, রাজনীতি হল সর্বাগ্রে একটা রাজকীয় বিদ্যা, এখানে

নির্ধারক ব্যাপাব হল সত্যকার রাজকীয় জ্ঞান আর লোক শাসনের নৈপুণ্য। তিনি মনে করেন, শাসকের এই গুণগুলি থাকলে 'তিনি শাসন করছেন আইন অনুসারে নাকি বিনা আইনে, স্বেচ্ছায় নাকি ইচ্ছার বিরুদ্ধে, তিনি ধনী নাকি নির্ধন, এসবের আর গুরুত্ব থাকে না: এগুলি হিসাবে ধরা কথনোই এবং কোনো ক্ষেত্রেই সঠিক হবে না' ('পলিটিক', ২৯৩বি)। এ গ্রন্থে একমাত্র তাকেই সঠিক রাষ্ট্র বলে মানা হয়েছে, যার শীর্ষে আছে সত্যকার জ্ঞানী শাসক; আর বোঝাই যায়, সে জ্ঞানের মূলকথাটা হল শাসনের ঐশ্বরিক নিদর্শন অনুকরণের বোধ।

অবশ্য আদর্শ শাসনের ক্ষেত্রে বর্জন করা হচ্ছে কেবল বড়ো বেশি খুঁটিনাটি আইন, কেননা একথা মেনে নেওয়া হয়েছে যে আইনপ্রণেতা প্রণয়ন করেন তেমন 'আইন যা অতি সাধারণ চরিত্রের, অধিকাংশের জন্য রচিত, আর প্রত্যেকেরই জন্য তা তিনি লিখেই করুন বা মুখেই করুন — কেবল আরো স্থূলাকারে, দেশের অলিখিত আইন অনুসারে' ('পলিটিক', ২৯৫)।

অন্য যেসব রাষ্ট্রে সত্যকার জ্ঞানী শাসক নেই, তাদের চালিত হওয়া উচিত লিখিত আইন ও স্বদেশীয় প্রথা অনুসারে।

'পলিটিক'এ রাষ্ট্র ব্যবস্থাগুলিকে বিভিন্ন ভাগে ফেলা হয়েছে ঐশ্বরিক-মহাজাগতিক আদিনিদর্শন অনুকরণের ধারণার ভিত্তিতে। জ্ঞানবান নৃপতি-রাজনীতিককে নিয়ে শ্রেষ্ঠ রাষ্ট্রটি কল্পিত হয়েছে ঐশ্বরিক শাসনের সঙ্গে রাজশাসনের সর্বাধিক সাদৃশ্যের সূত্রে (অবশ্য দেবতা আর মর্ত্য রাজার মধ্যে পার্থক্যটা মনে রেখে)। মহাজাগতিক ওলটপালটের পর রাজকীয় শাসনটাকেই রাখা হয়েছে বাকি সমস্ত ধরনের রাষ্ট্রের পক্ষে অনুকরণযোগ্য নিদর্শন হিশেবে। এসব রাষ্ট্রে শাসন চলবে আইন অনুসারে, যা হল 'জিনিসটার সত্যের অনুকরণ, যথাশক্তি তার রূপরেখা দেবে প্রাজ্ঞ ব্যক্তিরা' ('পলিটিক', ৩০০সি)। আদর্শ যে রাষ্ট্রের শাসক চালিত হয় সত্যকার জ্ঞান দ্বারা, তা ছাড়াও প্লেটো আরো তিন ধরনের শাসনের (রাজতন্ত্র, অল্পাংশের ক্ষমতা, অধিকাংশের ক্ষমতা) কথা বলেছেন, এদের প্রত্যেকটি আবার আইন পালনের রীতি আছে কি নেই সেই অনুসারে দুই ভাগে পড়ে: আইনপরায়ণ রাজতন্ত্র হল রাজশাসন, আইনবিরোধী রাজতন্ত্র — স্বৈরশাসন; অল্পসংখ্যকের আইনপরায়ণ ক্ষমতা — অভিজাততন্ত্র, বেআইনী — গোষ্ঠীতন্ত্র; গণতন্ত্রও হয় আইনপরায়ণ আর বেআইনী। সত্যকার শাসনব্যবস্থা সমেত মোট দাঁড়ায় সাতটি রাষ্ট্র। তাই প্লেটোর ছকে আইন পালনের নীতিটা স্বীকৃতি পেয়েছে যদিও তার ভূমিকাটা প্রধান নয়, বরং

সহায়ক। গোষ্ঠীতন্ত্র, গণতন্ত্র ও স্বৈরতন্ত্রের ওপর বরাবরকার মতো আক্রমণ চালিয়ে প্লেটো মন্তব্য করেছেন, বাকি অন্য সমস্ত রাষ্ট্র যদি হয় আইনপরায়ণ তাহলে গণতন্ত্র হবে তাদের মধ্যে সবচেয়ে খারাপ; আর সবাই যদি হয় বেআইনী তাহলে গণতন্ত্র হবে তাদের মধ্যে সেরা (অর্থাৎ গণতান্ত্রিক বিশৃংখলা স্বৈরতন্ত্র ও গোষ্ঠীতন্ত্রের চেয়ে বেশি কাম্য)।

যে রাজনৈতিক জ্ঞানের জন্য সত্যকার শাসক অন্য সকলের থেকে পৃথক, তাকে প্লেটো সমরবিদ্যা, বিচারনৈপুণ্য ও বাগ্মীর পটুতা থেকে আলাদা করে দেখেছেন। যেমন, বিচারক হল কেবল আইনের ভাণ্ডারী ও রাজক্ষমতার সেবক। শেষ কথা হিশেবে প্লেটো রাজনীতি বিদ্যাকে রাষ্ট্রীয় বস্ত্র বয়নের নৈপুণ্য বলে চিহ্নিত করেছেন: 'রাজকীয় বিদ্যা সোজাসুজি বয়নকর্মের দ্বারা সাহসী ও বিবেচক লোকেদের প্রবণতা মেলায়, সমভাবনা ও সৌহার্দ্যে তাদের জীবন ঐক্যবদ্ধ করে এবং এতে করে চমৎকার ও জমকালো বস্ত্র বানায়। এ বস্ত্র বাকি সমস্ত লোককে, স্বাধীন ও দাসেদের রাষ্ট্রে জড়িয়ে নেয়, তাদের ধরে রাখে নিজের ফাঁসগুলোতে, রাষ্ট্র চালায় ও ব্যবস্থাদি নেয়, এমন কিছুই তার নজর এড়ায় না, যাতে সে হয়ে উঠতে পারে, তার পক্ষে যতটা সম্ভব, সুখী' ('পলিটিক', ৩১১সি)। বয়নবিদ্যার সঙ্গে রাজনীতির এই তুলনাটা প্লেটোর একটা বড়ো আবিষ্কার, তাকে বলা যেতে পারে বর্তমান কালে রাষ্ট্রের যান্ত্রিক বোধের পুরাকালীন প্রতিমান।

বার্ধক্যে উপনীত প্লেটোর শেষ কথোপকথন হল 'আইন'। এটা তাঁর রাজনৈতিক-আইনী জ্ঞান ও মতবাদের নির্যাস। এতে তিনি 'যোগ্যতায় দ্বিতীয়' রাষ্ট্র ব্যবস্থার ছবি দিয়েছেন ('আইন', ৭৩৯বি)।

'রাষ্ট্র'এ বর্ণিত প্রথম রাষ্ট্র থেকে এর মূল তফাৎটা সামাজিক-অর্থনৈতিক চরিত্রে।

দ্বিতীয় রাষ্ট্রের ৫০৪০ জন নাগরিক লটারিতে জমি ও বাসগৃহ পাচ্ছে, তা ব্যবহারের অধিকার থাকছে তাদের, কিন্তু তার ওপর ব্যক্তিগত মালিকানা নয়। ভূমিখণ্ডটা রাষ্ট্রের সাধারণ সম্পত্তি বলে গণ্য। তার উত্তরাধিকার বর্তাবে সন্তানদের শুধু একজনের কাছে।

সম্পত্তির পরিমাণ অনুসারে নাগরিকেরা চারটি শ্রেণীতে বিভক্ত। ধনী হয়ে উঠে বা দরিদ্র হয়ে গিয়ে নাগরিকেরা তদনুযায়ী শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত হয়। ধন ও দারিদ্র্যের সীমা নির্ধারণের জন্য আইন থাকবে।

আইন অনুসারে ব্যক্তিগতভাবে সোনা বা রুপোর ওপর মালিকানার অধিকার থাকবে না কারো। তেজারতি নিষিদ্ধ। সমস্ত বিলাসব্যসন বাতিল।

৫০৪০ জন নাগরিকের মধ্যে দাস ও বিদেশীরা গণ্য নয়, যারা কৃষি, কারিগরি ও ব্যবসায় (প্রধানত ছোটো ব্যবসা এবং মুনাফা লোটার জন্য নয়) নিযুক্ত।

'যোগ্যতায় দ্বিতীয়' রাষ্ট্রের প্লেটোনিক নির্মিতির একটা পূর্বশর্ত হল এই যে 'নাগরিককে যথাশক্তি যথেষ্ট দাস সরবরাহ করা হবে' ('আইন', ৭৭৮)।

পরিভোগী সাম্যের পক্ষ নিয়ে প্লেটো এই কথায় জোর দিয়েছেন যে 'প্রভুর যে অংশটা প্রাপ্য হবে তা কোনোক্রমেই প্রাচুর্যে বাকি দুই অংশের চেয়ে বেশি হবে না, যা দাস এবং সমানভাবে বিদেশীদের প্রাপ্য। এমনভাবে ভাগাভাগি করতে হবে যাতে প্রত্যেকটি অংশ সমান হয় উৎকর্ষের দিক থেকেও' ('আইন', ৮৪৮সি)।

প্রথমের মতো দ্বিতীয় রাষ্ট্রের জীবনযাত্রাতেও সর্বত্র সঞ্চার করতে হবে সমভাবনা ও যূথবদ্ধতার প্রেরণা। ব্যক্তিগত পরিবার স্বীকৃত হলেও সন্তানপালনের সমস্ত ব্যাপারটাই আইনে নিয়ন্ত্রিত এবং বহুসংখ্যক পদাধিকারীর হাতে ন্যস্ত। নারীরা পুরুষের সঙ্গে সমান অধিকার ভোগী, যদিও উচ্চতন শাসক পদে তারা যাচ্ছে না।

রাজনৈতিক অধিকার ভোগ করে শুধু নাগরিক। তাদের প্রধান কাজ সাধারণ রাষ্ট্র ব্যবস্থার সংরক্ষণ ও অনুসরণ। নাগরিকেরা সবাই সমাধিকারী, তবে সমতাকে প্লেটো বোঝান আভিজাতিক অর্থে: 'কেননা অসমানদের কাছে সমান হয়ে উঠবে অসমান যদি উপযুক্ত ব্যবস্থা পালিত না হয়' ('আইন', ৭৫৭)।

এ গ্রন্থে বর্ণিত রাষ্ট্রকে প্লেটো বলেছেন মিশ্র ব্যবস্থা, যাতে রাজতন্ত্র আর গণতন্ত্র — এই দুই মূল রাষ্ট্র ব্যবস্থার উপাদান মিলেছে। পারসিক ও এথেনীয়ানরা এ দুটি নীতিকে চরমে নিয়ে যায় নি, যেখানে দুই নীতির অংশভাক হওয়ায় ভাল রাষ্ট্রের হওয়া উচিত স্বাধীনতা ও অধীনতার প্রশ্নে নরমপন্থী।

প্লেটোনিক রাষ্ট্রের শীর্ষে থাকছে বহুধাপী নির্বাচন মারফত বাছাই করা ৩৭ জন শাসক। তাদের নির্বাচনে অংশ নিচ্ছে সমস্ত নাগরিক নয়, শুধু তারাই যারা অস্ত্রধারী কিংবা ইতিপূর্বেই যুদ্ধে যোগ দিয়েছে। শাসকের বয়স হবে ৫০ থেকে ৭০-এর মধ্যে। ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত থাকা চলবে ২০ বছরের

বেশি নয়। শাসকদের অধিকার অনেক, তবে সর্বাগ্রে তারা হল 'আইনের রক্ষক'।

নির্বাচিত পরিষদের (৩৬০জন সদস্য — প্রতি শ্রেণী থেকে ৯০ জন করে) ক্ষমতা যথেষ্ট। সামান্য উল্লেখ করা হয়েছে লোকসভার। তাতে শুধু প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীর নাগরিকদের উপস্থিতি বাধ্যতামূলক (অন্যথায় শাস্তি)। কিন্তু তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণীর নাগরিকদের উপস্থিতি বাধ্যতামূলক নয়। উচ্চ পদে প্রার্থীদের দাবি আইনসঙ্গত কি না তা পরীক্ষা করে নিতে হবে।

ঊর্ধ্বতন রাষ্ট্রীয় সংস্থাগুলির তালিকা দেওয়া ছাড়াও প্লেটো আরো একটি, মূলত রাষ্ট্রোর্ধ্ব সংস্থা গঠনের কথা বলেছেন: সেটি হল সবচেয়ে প্রাজ্ঞ ও প্রবীণ ১০ জন রক্ষীদের নিয়ে বিশেষ একটা 'নৈশ সভা' গঠন এবং তাদের ওপর রাষ্ট্রের ভার অর্পণ ('আইন', ৯৬৯বি)। রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তার এই আরক্ষা সংস্থার সদস্যরা প্রথম প্রকল্পের দার্শনিকদের মতোই মহাজাগতিক ও রাজনৈতিক জ্ঞানে সমৃদ্ধ, কেবল তারাই হতে পারে ধর্মগুণ রক্ষার সুযোগ্য প্রহরা। এইভাবে দ্বিতীয় সুষ্ঠু রাষ্ট্র আরো কাছাকাছি আসছে প্রথমের।

'আইন' (৭৩৫) গ্রন্থে প্লেটো দুই ধরনের রাষ্ট্র ব্যবস্থার কথা বলেছেন: একটাতে সবার ওপরে থাকছে শাসক, দ্বিতীয়টায় শাসকও আইনের অধীনস্থ।

তিনি লিখেছেন: 'যে রাষ্ট্রে আইন শক্তিহীন, তা কারো ক্ষমতাধীন, আমি দেখতে পাচ্ছি তার মৃত্যু সন্নিকট। আর যেখানে আইন শাসকদের প্রভু, শাসকরা তার দাস, সেখানে আমার চোখে পড়ছে রাষ্ট্রের পরিত্রাণ, এবং দেবতারা রাষ্ট্রকে যা দিতে পারে সেসকল কল্যাণ' ('আইন', ৭১৫)।

তাঁর ধারণায় সুসম্পূর্ণতার দিক থেকে দ্বিতীয় রাষ্ট্রটি ঠিক সেইটে যেখানে শাসকদের ওপর আইন প্রযোজ্য। তবে কার্যক্ষেত্রে রাষ্ট্র ও আইনের সমস্ত প্লেটোনিক নির্মিতির (শুধু 'আইন'এ নয়, পূর্ববর্তী কথোপকথনেও) ওপরে থাকে শুধু রাজনৈতিক নয়, মননশীল আভিজাত্যের আধিপত্য: সত্যকার জ্ঞান যার আছে, সে শাসক আইনের ঊর্ধ্বে। 'কেননা, ঐশ্বরিক নিয়তির ইচ্ছায় যদি কখনো এমন লোক আবির্ভূত হয় যে তার স্বভাবক্রমেই এইসব দৃষ্টিভঙ্গি আত্মস্থ করতে সক্ষম, তাহলে যেসকল আইনে তার চালিত হবার কথা, সেগুলির আদৌ কোনো প্রয়োজন থাকে না তার। কোনো বিধি কোনো শৃঙ্খলাই জ্ঞানের চেয়ে বড়ো নয়' ('আইন', ৮৭৫ডি)।

প্লেটোর রাজনৈতিক দর্শনের যা বৈশিষ্ট্য, দার্শনিক ও রাজনৈতিক পটকে মেশানো ও মেলানো, সেটা এইক্ষেত্রে দাঁড়িয়েছে দুটি ভিন্ন সমস্যার মিশ্রণ।

আইনের চেয়ে প্রজ্ঞার শ্রেষ্ঠত্বের যে মানে দাঁড়ায় সেটা মোটেই রাজনৈতিক নয়, দার্শনিক; রাজনীতিতে সে শ্রেষ্ঠত্ব প্রকাশ করতে হলে, দৃষ্টান্তস্বরূপ প্লেটোর কাছে সুবিদিত সক্রেটিসের ভাগ্য থেকে যা দেখা গেছে, তার একটা অন্য আখ্যা প্রয়োজন, প্রায়ই তাকে বলা হয় অপরাধ। এই শ্রেষ্ঠত্ব আইন মারফত প্রতিষ্ঠিত করা হলেও (প্লেটো অবিশ্যি অতটা চরমে যান নি), তখনও কথাটার দার্শনিক ও রাজনৈতিক অর্থ হবে একেবারে বিভিন্ন। প্লেটোনিক ধারণার যে মাহাত্ম্য ও দুর্বলতা দর্শন ও রাজনীতির পরবর্তী দীর্ঘ ইতিহাসে অনেককেই অনুপ্রাণিত ও হতাশ করেছে, তা হল: যে প্রজ্ঞাকে বোঝা উচিত দার্শনিক দিক থেকে, সেটাকে সরাসরি রাজনীতিতে রূপদানের প্রয়াস। তবে যেমন প্লেটো, তেমনি তাঁর অসংখ্য অনুগামীদের ক্ষেত্রে দার্শনিক ভাবকে রাজনীতিতে স্থানান্তরণের প্রয়াস কেবল রাজনীতির আদর্শায়ন আর দর্শনের রাজনীতিকরণের মধ্যে ঘুরপাক খেয়েছে।

রাষ্ট্রের মতো আইনের ব্যাপারেও প্লেটোর দৃষ্টিভঙ্গি শাসনের অতিকথামূলক আদিনিদর্শনে নিবদ্ধ। 'আইন' (চার, ৭১৩বি) গ্রন্থে ফের ক্রনোসের কালের সুখময় শাসন আর সমাজের কথা স্মরণ করা হয়েছে যা অনুকরণ করা উচিত ভালো সবকিছুর। তিনি বলেছেন: 'লোকে যা বলে, ক্রনোসের কালে যেরকম জীবন ছিল, সর্বোপায়ে সেটা আমাদের অনুকরণ করা উচিত; যেমন সামাজিক, তেমনি ব্যক্তিগত ব্যাপারে, আমাদের রাষ্ট্রের ও সাংসারিক ব্যবস্থায়, অমরতার যে অংশ আমাদের অন্তর্নিহিত তাতে যতটা সম্ভব, আইন দ্বারা প্রজ্ঞার এই নির্দেশকে সিদ্ধ করে দৃঢ় বিশ্বাসে সে জীবন আমাদের অনুসরণ করা উচিত' ('আইন', ৭১৩ই)।

আইনকে প্রজ্ঞার নির্দেশ হিশেবে ধরাটা অধিকারের দর্শনের পরবর্তী গোটা যুক্তিবাদী ধারায় একটা সাধারণ স্থান নিয়েছে। প্লেটো যেভাবে বোঝেন, আইনে সূত্রবদ্ধ হচ্ছে বর্তমানে যা বিদ্যমান তা নয়, ঠিক অবিদ্যমান সম্পর্কেরই চৈতন্য। দুই রাষ্ট্রের প্রকল্পের মতো প্লেটোর আইনগুলিও নিজের খুশিমতো রচিত, বাইরে থেকে চাপানো। আইনের সাহায্যে প্লেটো আশা করেন যে বিদ্যমান বিশৃঙ্খলার পরিস্থিতিতে অবিদ্যমান শৃঙ্খলা ফিরিয়ে এনে দমন করা যাবে এই বিশৃঙ্খলা।

তাঁর কল্পিত রাষ্ট্রের অধিবাসীদের যে আইন ও শৃঙ্খলা দেওয়া হচ্ছে তার প্রতিরোধ হবে অনুমান করে তিনি অনুপযোগী লোকেদের বাদ দিয়ে 'রাষ্ট্রের শুদ্ধিকরণ' এবং কেবল 'ভালো লোকেদের' রেখে দেওয়ার প্রস্তাব করেছেন ('আইন', ৭৩৫সি-৭৩৬সি)। এই 'শুদ্ধিতে' মৃত্যুদণ্ড কিংবা

বিতারণের কথা ধরা হয়েছে। তবে প্লেটো প্রস্তাবিত অনেক ব্যবহারিক আইনেও এরূপ শাস্তি আছে।

আইন সম্পর্কে নিজের ধারণা প্লেটো বিকশিত করেছেন সফিস্টদের সঙ্গে বিতর্কে। যা আইনসঙ্গত, ন্যায়সঙ্গত থেকে যা অভিন্ন, তার পরিমাপক সর্বাগ্রে মানুষ, প্রটাগোরাসের এই মতের বিপরীতে প্লেটো মনে করেন পরিমাপক দেবতা। থ্রাজিমাখের দৃষ্টিভঙ্গির সমালোচনা করে প্লেটো ন্যায্য ও অন্যায্য আইনের মধ্যে পার্থক্য টেনেছেন। সেই আইনগুলিই ন্যায্য যা ক্ষমতাগ্রাসী সীমাবদ্ধ কোনো একটা গ্রুপের জন্য নয়, গোটা রাষ্ট্রের সাধারণ কল্যাণের জন্য যা রচিত। যে রাষ্ট্র ক্ষমতার জন্য রাজনৈতিক সংগ্রামে লিপ্ত, প্লেটো তাকে আদৌ রাষ্ট্র বলেই ধরেন না। 'আমরা এই কথা মানি, যেখানে কতিপয় লোকের স্বার্থে আইন প্রচলিত, সেখানে রাষ্ট্র ব্যবস্থার কথাই ওঠে না, ওটা শুধু অভ্যন্তরীণ ঝগড়াঝাঁটির ব্যাপার, সেখানে যা ন্যায্য বলা হয়, সেটা বৃথাই বলা হয়' ('আইন', চার, ৭১৫বি)।

প্লেটোর কথোপকথনে রাষ্ট্র এবং আইন সম্পর্কে আদর্শমুখী দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গির সঙ্গে সঙ্গে আছে ঐতিহাসিক-ভৌগোলিক চেতনার একটা আদি অঙ্কুরও যা পরে দেখা যায় আরিস্টটল, মাকিয়াভেলি, বদেনের মধ্যে এবং যা ক্লাসিক্যাল রূপ লাভ করেছে মঁতেস্ক্যের 'আইনাদির প্রেরণা প্রসঙ্গে' রচনায়। এখানে অতীত শুধু আদিনিদর্শন ও পরিসরের আদর্শায়িত বিন্দুতেই আবর্তিত নয়, তা যেন ঐতিহাসিক ধারা (মহাপ্লাবন থেকে প্লেটোর সময় অবধি) বেয়েও এগিয়েছে সমাজ, রাষ্ট্র, রীতিনীতি, আচারব্যবহার, আইনপ্রথার বদলাবদলি করে। যেমন, প্লেটো বর্ণনা করেছেন কেমন ছিল মহাপ্লাবনের পরবর্তী আদিম সমাজ, তার কৌলিক ও পারিবারিক ব্যবস্থা, গোষ্ঠীপ্রধানদের প্রভুত্ব, আচারব্যবহার, পিতৃপুরুষদের আইনকানুন; তারপর রাষ্ট্রে কয়েকটি কুলের মিলন, অভিজাত শাসনব্যবস্থা, অথবা রাজকর্তৃত্বের উদয়, বিধান রচনার প্রবর্তন; ইলিওন, আর্গস, মেসেনিয়া, লাসেডেমোনের ইতিহাস, তাদের সমাজব্যবস্থা ও আইন প্রথার সঠিক ও বেঠিক দিক; পারস্য এথেন্সের ইতিহাস এবং রাজতন্ত্র ও গণতন্ত্রের চরমসীমার নেতিবাচক পরিণাম। এই প্রসঙ্গে প্লেটো এই সিদ্ধান্তে এসেছেন যে বিধানকর্তার উচিত নম্র পন্থা অনুসরণ (একদিকে শাসকদের ক্ষমতা, অন্যদিকে শাসিতদের স্বাধীনতা সীমিত করে)। এক্ষেত্রে নির্দিষ্ট রাজ্যটির ভৌগোলিক অবস্থান, জলবায়ু, মৃত্তিকা ইত্যাদিতে প্রভাবিত হয় রাষ্ট্রব্যবস্থা,

বিধানপ্রণয়নের চরিত্র। প্লেটোর মতে, 'স্থানীয় পরিস্থিতিকে উপেক্ষা করে আইন জারী সম্ভব নয়' ('আইন', ৭৪৭ডি)।

প্লেটোর রাজনৈতিক-দার্শনিক ধারণার যা মূলকথা, অনুকরণ, তাতে ধরে নেওয়া হয় যে দেবতাদের তুলনায় মানুষ পুত্তলিকা, অস্বাধীন, সৃজনক্ষমতাহীন। মানুষেরা দেবতাদের খেলনাপাতি, এই অতিকথায় সেটা তিনি বলেছেন খোলাখুলি। লোকের আভ্যন্তরীণ অবস্থা তাদের নিয়ে যায় বিভিন্ন দিকে। অন্য সমস্ত আকর্ষণ রোধ করে লোকের উচিত শুধু একটা, আইনের স্বর্ণসূত্র অনুসরণ করা ('আইন', ৬৪৫)।

মানুষ এবং মানবজীবন দেবতাদের কাছে তুচ্ছ। এই সূত্রে প্লেটো জীবনকে বলেছেন খেলা। আইন-কানুন আসলে হল লোকেদের নিয়ে দেবতাদের উদ্ভাবিত এই খেলার কয়েকটি শর্তবদ্ধ নিয়ম। বিধানদাতা প্লেটো কিন্তু সেই সঙ্গে থেকে যাচ্ছেন নন্দনতাত্ত্বিক। সেই কারণে তিনি পুত্তলিকা-মানুষদের কাছ থেকে দাবি করছেন উত্তম খেলা। 'প্রত্যেকের উচিত পৃথিবীতে নিজের জীবন যাপন করা যথাসম্ভব দীর্ঘকাল এবং উত্তমরূপে। তাহলে শেষাবধি কী সঠিক? বেঁচে থাকতে হবে ক্রীড়াক্রমে' ('আইন', ৮০৩ই)।

আইন কার্যকৃত করা নিয়ে প্রত্যয় ও বাধ্যকরণকে মেলানো বিষয়ে প্লেটোর যুক্তি পুত্তলিকা-মানুষ আর খেলনার ধারণায় অনেকখানি ক্ষীণবল হয়ে পড়ে। এই রাজনৈতিক-আইনী নীতিটাকে প্লেটোই প্রথম সুনির্দিষ্টরূপে সূত্রবদ্ধ করেন, এই থেকে এগিয়ে তিনি আইনের মুখবন্ধ থাকার সিদ্ধান্তও প্রতিপন্ন করেন।

পুত্তলিকা-মানুষের অতিকথায় উদ্বুদ্ধ হয়ে প্লেটো আইন দ্বারা মানুষের মধ্যে সামূহিক বন্ধনের একটা ছবি এঁকেছেন। প্লেটোর আইনে লোকের দিন-রাত্রির কর্তব্য নির্দিষ্ট করে তার প্রকাশ্য ও ব্যক্তিগত জীবনকে নিয়ন্ত্রিত করা হয়েছে, শুধু এইটুকু বললে কমই বলা হবে। তা ছাড়াও এইসব আইন নানা ধরনের ঐহিক সাধারণ্য ও ছোটোখাটো সাংসারিক ধূর্ততাকেও নিজেদের অভিভাবকত্বের অধীন করেছে।

মিশরের দশ হাজার বছরের সুস্থিতিতে মুগ্ধ প্লেটো আইনের অটলতার নামে কবিদের যেকোনো অভিনবত্ব, শিশুদের খেলায় যেকোনো পরিবর্তন, অন্যান্য রাষ্ট্রের সঙ্গে সম্পর্কের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেছেন। প্লেটোর আইনে ৪০ বছর বয়স না হওয়া অবধি পরদেশ পর্যটন নিষিদ্ধ। শুধু রাষ্ট্রীয় প্রয়োজনে ছাড়া (ঘোষক, রাজদূত, ফেওরদের — আইনের রক্ষকদের ধরা হয়েছে) সাধারণভাবে ব্যক্তিগত প্রয়োজনে বিদেশযাত্রা একেবারে বারণ। এইসব

সরকারী যাত্রার উদ্দেশ্য হল অন্য রাষ্ট্রে প্লেটোনিক ব্যবস্থার গুণগান এবং শৃঙ্খলার তত্ত্বাবধান। বিদেশীদের গ্রহণের ব্যাপারটাও খুবই সীমাবদ্ধ ও সর্ববিধ সতর্কতায় পরিবেষ্টিত।

আইনের অটুট পাহারায় থাকছে বিচারক। প্লেটো মন্তব্য করেছেন, রাষ্ট্রে বিচারালয়ের সুব্যবস্থা না থাকলে সেটা আর রাষ্ট্রই থাকে না। তবে প্লেটোর ধারণায় ন্যায়বিচার কোনো একটা স্বাধীন ক্ষমতা ও পৃথক রাষ্ট্রীয় কাজ নয়। তিনি নিজেই স্বীকার করেছেন যে 'বিচারক কি রাষ্ট্রীয় পদাধিকারী নাকি নন, সেটা স্থির করা সহজ নয়' ('আইন', ৭৬৮সি)।

নির্দিষ্ট কয়েকটি ক্ষেত্রে প্রত্যেক শাসকই বিচারকের কাজ করে। প্লেটোর মতে, ন্যায়বিচারের সাধারণ প্রতিষ্ঠায় রাষ্ট্রের সমস্ত নাগরিককেই অংশ নিতে হবে। নানা ধরনের সালিশ বিচারালয় ও ব্যক্তিগত মানহানির বিচারালয় ছাড়াও প্রতিটি রাষ্ট্রীয় পদ থেকে এক বছরের জন্য নির্বাচিত বিশেষ বিচারকদের নিয়ে বিচারালয়ের কথাও আছে। এই বিচারকদের যোগ্যতা যাচাই করে নিতে হবে।

প্লেটো সক্রিয় বিচারালয়ের পক্ষপাতী, মনে করেন যে চুপচাপ বিচারক ন্যায়বিচারের খারাপ নির্বাহক। মামলায় অভিযোগ থেকে আত্মরক্ষার কথাও আছে, কিন্তু উকিলের কাজকর্মকে তিনি দেখেন পক্ষপাতদুষ্ট দৃষ্টিতে, সেটা এসেছে সফিস্টদের প্রতি তাঁর মনোভাব থেকে।

ব্যবহারশাস্ত্রকে প্লেটো খুবই উচ্চ স্থান দিয়েছেন, ঐশ্বরিক ও অলৌকিক আইন (nomos) আর মনন (noys) শব্দদুটির ধ্বনির মিল তিনি অকারণ বলে মনে করেন না। তিনি লিখেছেন: 'সমস্ত বিদ্যার মধ্যে আইনবিদ্যাই বিদ্যাচর্চারত মানুষকে পূর্ণতা দান করে' ('আইন', ৯৫৭সি)। আইনবিষয়ক রচনাদি অনুশীলনের সুপারিশ করেছেন তিনি বিচারকদের কাছে।

প্লেটোর ছকে, অনাচার ও অপরাধের জন্য কঠোর পার্থিব শাস্তির যে ব্যবস্থা আছে, তার সঙ্গে যোগ হয় দেবতাদের প্রতিহিংসাত্মক বিচার। কিন্তু সেটাও প্লেটোর কাছে মনে হয় যথেষ্ট নয়। আত্মার অমরতা নিয়ে অতিকথা অবলম্বনে, প্রাকৃতিক ও দৈহিক সবকিছুর চেয়ে আত্মার জ্যেষ্ঠত্ব ও আদিত্বকে তিনি তত্ত্বান্বিত করেছেন আইনের মর্যাদার সঙ্গে। আইন আত্মার অংশী, তাও আদিসত্তার মধ্যে পড়ে।

প্লেটোর দার্শনিক-অতিকথাশ্রিত দৃষ্টিভঙ্গির গ্রন্থন মূলত একটা রাষ্ট্রীয়

ধর্মের রূপ নেয় যার লক্ষ্য নাগরিকদের একমতাবলম্বিতা ও প্লেটোনিক রাষ্ট্রের আইন-শৃঙ্খলা ও রাষ্ট্র ব্যবস্থা সুদৃঢ় করা।

আজ আড়াই হাজার বছর ধরে প্লেটোর দার্শনিক, রাজনৈতিক, আইনী ও সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে বিতর্ক থামছে না। প্লেটোর দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে এমন অসাধারণ দীর্ঘস্থায়ী আগ্রহ ও গুরুত্বের সাধারণ কারণ এই যে তাঁর মধ্যে দেখা যাবে যেমন গবেষক প্লেটোর সৃজনী গভীরতা, তেমনি তিনি ছিলেন এমনসব সুপ্রসর সমস্যাধারা নিয়ে প্রণালীবদ্ধ আলোচনার উৎসমুখে যাদের তাত্ত্বিক ও ব্যবহারিক তাৎপর্য মাত্র তাৎক্ষণিক নয়।

প্লেটোর শিষ্য ও সমালোচক আরিস্টটল তাঁর রাজনৈতিক-আইনী দর্শনে শুধু প্রভাবিত হয়েছিলেন তাই নয়, প্লেটোর ভাবধারা প্রচারে নিজেও বহুদিক দিয়ে সহায়তা করেছেন।

প্রাচীন গ্রীক লেখকদের মধ্যে প্লেটোর বেশকিছু রাজনৈতিক-আইনী প্রতিপাদ্যের (বিশেষত আরিস্টটলের ভাষ্যে) প্রভাব পড়ে ঐতিহাসিক পলিবিয়াসের ওপর। রাষ্ট্ররূপের বৃত্তাকার আবর্তন এবং মিশ্র শাসনের প্রাধান্য নিয়ে প্লেটোর যে ধ্যানধারণা তিনি বিকশিত করেন, তাতে তা জনপ্রিয় হয়ে ওঠে বিশেষ করে প্রাচীন রোমক ও পরবর্তী পশ্চিম-ইউরোপীয় লেখকদের মধ্যে। রোমক লেখকদের মধ্যে প্লেটোর প্রভাব সবচেয়ে বেশি পড়েছে সিসেরোর ওপর। মিশ্র শাসন ছাড়াও তিনি প্লেটোর স্বাভাবিক বিধি সম্পর্কিত অনেক ধারণা গ্রহণ করেন।*

প্লেটো ও তাঁর অনুগামীদের (বিশেষ করে প্লটিনাসের) রচনাগুলি ছিল আদি খ্রিস্টান ও মধ্যযুগীয় লেখকদের মনোযোগের কেন্দ্রে।** প্লেটোনিক-আরিস্টটলীয় রাজনৈতিক-আইনী মতবাদের খ্রিস্টীয়করণ, ধর্মীয় ভাবাদর্শীয় লক্ষ্যে তার রূপান্তরের পথে অগাস্টিনের 'ঐশ্বরিক নগর প্রসঙ্গে' রচনাটি একটি দিক্‌চিহ্ন।

টমিজমের রাজনৈতিক ধ্যানধারণায় গৃহীত ও নিজের ধরনের প্রতিসৃত

হয়েছে প্লেটো থেকে আগত রাষ্ট্রের রূপ, শ্রেষ্ঠ রাষ্ট্রে আত্মিক চৈতন্যের প্রাধান্য, আইন প্রণয়নের ঐশ্বরিক আদি উৎস ইত্যাদি অনেক ভাবনাই।

আদর্শ রাষ্ট্রের প্লেটোনিক নির্মিতির সম্প্রদায়ভেদী সোপানতান্ত্রিক দিকগুলি খুবই মনে ধরেছিল সোপানতান্ত্রিক সামন্ত সমাজের।

প্রতিটি সম্প্রদায় তাদের নিজ নিজ কাজে ব্যাপৃত থাকবে, প্লেটোর এই ভাবনাকে অন্যান্য সম্প্রদায়ের ব্যাপারে যাজক মহলের পক্ষ থেকে হস্তক্ষেপের বিরোধিতা করে একটা প্রগতিশীল রূপ দেন পাদুয়ার মার্সিলিয়াস।

রেনেসাঁসের যুগে অগাস্টিনের নয়াপ্লেটোবাদ, লাতিন অনুবাদ এবং তার নানাধরনের ভাষ্য বাদ দিয়েই পাঠকেরা প্লেটোর রচনার সঙ্গে সরাসরি পরিচয়ের সুযোগ লাভ করে।* প্লেটো নিয়ে আগ্রহের পুনরাবির্ভাব, তাঁকে নিয়ে অনুশীলনের মধ্যে প্রতিফলিত হয় আপ্তবাক্যে পরিণত আরিস্টটলবাদ থেকে মুক্তির প্রয়াস।

আইনানুগ রাজতন্ত্রের যে প্রশংসা এবং স্বৈরশাসনের স্বেচ্ছাচারের যে নিন্দা প্লেটো করেছিলেন, মিশ্র শাসনের (রাজতন্ত্র, অভিজাততন্ত্র ও গণতন্ত্রের বিভিন্ন দিক মিলিয়ে) প্রতি তাঁর যে অনুরাগ ছিল, ১৬ শতকে সেটা ব্যাপকভাবে কাজে লাগানো হয় সম্প্রদায়ভেদী-প্রতিনিধিত্বমূলক রাজতন্ত্রের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণের জন্য। প্লেটোর মতো মনার্কোমাখরাও (ফ্রান্সিস্ক গটমান, ইউনিয়াস ব্রুটাস প্রভৃতি) রাজা আর স্বৈরশাসকের মধ্যে একটা নীতিগত বৈপরীত্য আরোপ করতেন।

শ্রেষ্ঠ, ন্যায়পরায়ণ, আদর্শ রাষ্ট্র সম্পর্কে প্লেটোর ধারণার একটা মূলত নতুন অর্থ ও প্রয়োগ দেখা যায় ট. মুর ও ত. কাম্পানেলার সামাজিক-ইউটোপীয় নির্মাণে। প্লেটোর তথাকথিত 'কমিউনিজম'** থেকে এঁদের ইউটোপীয় সমাজতন্ত্রের নীতিগত পার্থক্য সর্বাগ্রে তাঁদের সামাজিক-রাজনৈতিক অবস্থানে। কিন্তু নিজেদের মূলত নতুন আদর্শের দূরকল্পী সূত্রায়ণে তাঁরা যেমন প্লেটোর আদর্শ রাষ্ট্র সম্পর্কে ভাবনা এবং তার

রূপায়ণসম্ভাব্যতাকে ব্যবহার করেছেন, তেমনি সে রাষ্ট্রের তাত্ত্বিক নানা নির্মাণকেও কাজে লাগিয়েছেন।

পূর্বোল্লিখিত নীতিগত কুণ্ঠাগুলির কথা মনে রেখেই একথা বলা উচিত যে আঠারো শতকের ইউটোপীয়দের অবস্থানেও দেখা যায় প্লেটোর প্রভাব। বিশেষ করে স্বাভাবিক ব্যবস্থার উপযোগী এবং হারিয়ে যাওয়া অতীতের ('স্বর্ণযুগের') সবচেয়ে কাছাকাছি একটা আদর্শ বিধান প্রণয়ন সম্পর্কে মরেলি ও মাব্লির দৃষ্টিভঙ্গিতে তা পরিস্ফুট। এমনকি সাঁ-সিমোঁ, ফুরিয়ে, ওয়েনও সমাজের ইউটোপীয় পুনর্গঠনের প্রকল্পে এমন কতকগুলি ছক ও ভাবনা নিয়েছেন যা এসেছে প্লেটো থেকে (শ্রমবিভাগ জনিত সামাজিক স্তরভেদ, রিপুবেগের সামঞ্জস্য ও সুসমঞ্জস সমাজ, লালনপালনের ভূমিকা, মেয়েদের অবস্থা, ইত্যাদি)।

রেনেসাঁসের যুগে প্লেটোনিক উত্তরাধিকারের প্রতি যে যুক্তিবাদী মনোভাব দেখা দিয়েছিল, তা সমগ্র আদিবুর্জোয়া ভাবাদর্শেরই বৈশিষ্ট্য।

রাজনৈতিক বিশ্লেষণে গাণিতিক-জ্যামিতিক পদ্ধতির প্রয়োগ যে সম্ভব, স্পিনোজা ও হবসের এ যুক্তির পুরাকালীন পুরোধা হলেন প্লেটো। রাজনীতিকে প্লেটো দেখেছিলেন লোকেদের ও তাদের রিপুবেগকে পরিচালনার রাজকীয় বয়নবিদ্যা হিশেবে, আর হবসের কাছে রাষ্ট্র হল মানবিক রিপুবেগের পরিণামস্বরূপ এক বিশাল যন্ত্রবিশেষ — এ দুইয়ের সাদৃশ্যও চোখে না পড়ে যায় না। রাষ্ট্রের সমস্ত নাগরিকের পক্ষেই ধর্ম যে বাধ্যতামূলক, এ ধারণাটাও আসছে প্লেটো থেকে, সাম্প্রতিক কালে যার ইতরবিশেষ করা হয়েছে নানা ধরনের তথাকথিত নাগরিক ধর্ম হিশেবে (স্পিনোজা, রুসো, পুফেনডর্ফ ইত্যাদি)।

পুলিসি রাষ্ট্র সম্পর্কে হ. ভলফের ধারণার সঙ্গে অনেক বিষয়ে মিল আছে প্লেটোর সর্বত্রবিরাজমান সবার জন্য সযত্ন রাষ্ট্রের।

'আইনাদির প্রেরণা প্রসঙ্গে' নামক রচনার মূল ভাবনার সমতলতায় রয়েছে প্লেটো থেকে মঁতেস্ক্যের অনুবৃত্তি। আচারব্যবহার, রাজনৈতিক গঠন আর আইনের মধ্যে যোগাযোগ প্রমাণে, 'আইনের মর্ম' নির্দিষ্ট হয় যেসব কারিকায় তার বর্ণনায় মঁতেস্ক্য নিজের প্রামাণ্য পূর্বসূরী হিশেবে প্লেটোর উল্লেখ করেছেন একাধিক বার*। বিভিন্ন রূপের শাসনের মূল নীতি সম্পর্কে

ম'তেস্ক্যুর বোধ তথা এইসব রূপ পরিবর্তন নিয়ে তাঁর ব্যাখ্যাও প্লেটোর প্রভাবে চিহ্নিত। সোজাসুজি প্লেটো অনুসরণে ম'তেস্ক্যু মনে করেন যে প্রতিটি শাসনব্যবস্থার ভাঙন শুরু হয় তার নিজস্ব নীতির অবক্ষয় থেকে। ক্ষমতা ভাগাভাগির কথা প্লেটো বলেন নি। কিন্তু মিশ্র শাসনের শ্রেষ্ঠত্ব বিষয়ে প্লেটোনিক ধারণা রয়ে গেছে ক্ষমতা ভাগাভাগির ম'তেস্ক্যুীয় মতবাদে এবং বিশেষ করে বিভিন্ন ক্ষমতার ভারসাম্য রক্ষার জন্য তাঁর দাবি প্রমাণে।

শাসক ও দার্শনিকের সমাপতনের প্রয়োজন নিয়ে প্লেটোর বিখ্যাত বক্তব্যটি অস্ত্র জুগিয়েছে আলোকপ্রাপ্ত স্বৈরতন্ত্রের পক্ষপাতীদের (ভল্টেয়ার, দিদেরো প্রভৃতি)। 'প্রাজ্ঞ আইনের' ওপর ভরসাও (হেলভেশিয়াস, হলবাক, দিদেরো) জ্ঞানপ্রচারকদের ওপর সেই একই প্লেটোনিক প্রভাবের আরেকটি প্রকাশ।

প্লেটো আর রুসোর মধ্যে যোগ-সম্পর্কটা কিছু স্বকীয় ধরনের। সর্বাগ্রে উভয়েই প্রাকৃতিক অবস্থার আদিম কমিউনিজমে আকৃষ্ট, যখন সবই ছিল সার্বজনীন, সাধারণ সুখ বিরাজমান, ব্যক্তিগত সম্পত্তি ছিল না। উভয়েই মনে করেন সুনীতির পতন একটা অতি গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার যাতে ঘটেছে ব্যক্তিগত সম্পত্তির আবির্ভাব।

এ ছাড়াও নিজের রাজনৈতিক-আইনী দৃষ্টিভঙ্গিতে ও নির্মাণ প্রকল্পে রুসো রাজনীতিতে অংশের ওপর সমগ্রের প্রাধান্য (রাষ্ট্র, সম্প্রদায় ও ব্যক্তিমানুষের মধ্যে সম্পর্কে) বিষয়ে প্লেটোর মূল ভাবনাই অনুসরণ করেছেন।

অংশত সোজাসুজি প্লেটো ও আরিস্টটল এবং অংশত রুসোর কাছ থেকে (বিশেষত সার্বজনীন অভিপ্রায় এবং সকলের অভিপ্রায়ের মধ্যে তাঁর প্রভেদীকরণ) পাওয়া এই ধারণাটা হেগেলও বিশেষাকারে বিকশিত করেন। হেগেলের মতে — অনেকে যা মনে করতেন, প্লেটোনিক রাষ্ট্র কোনো একটা অসার বিমূর্ত আদর্শের নিদর্শন নয়, এ হল অখণ্ড গ্রীক নৈতিকতার (কথাটার হেগেলীয় অর্থে) আদর্শায়িত অভিব্যক্তি*। হেগেল মনে করেছেন, বাস্তবতার সঙ্গে দর্শনের সম্পর্ক বিষয়ক মূল প্রশ্নটায় প্লেটো সঠিক অবস্থান নিয়েছেন, কেননা গ্রীক পলিসের (নগর-রাষ্ট্র) আদর্শ বাস্তবতাকে রূপনিবদ্ধ করেছেন দার্শনিক ধারায়।

রাজনীতি এবং অধিকার, উপযোগী রাষ্ট্র সম্পর্কে কাণ্টের ধারণাও প্লেটোর

আদর্শ প্রকল্পের সঙ্গে মেলে। রাজনীতিতে দর্শনের দাবি নিয়ে পুরনো বিতর্কটা মূলত তখনো চলেছে। কিন্তু কাণ্টের দাবি অনুদ্ধত ও নম্র। রাজারা দার্শনিক হল, অথবা দার্শনিকদের রাজা করা হল, এটা অসম্ভব ও অনাবশ্যক। 'কিন্তু দার্শনিক শ্রেণী অন্তর্ধান করল অথবা নীরব হয়ে গেল এটা হতে দেওয়া রাজাদের অথবা স্বৈরক্ষমতাধর জনগণের (সাম্যের আইন অনুসারে স্বশাসিত) উচিত নয়, প্রকাশ্যে কথা বলার সুযোগ দিতে হবে তাদের'*। কেবল-দর্শনের কল্যাণেই প্রকাশ্যতার পরিস্থিতিতে সূত্রবদ্ধ ও সাধিত হতে পারে 'রাজনীতির সত্যকার কর্তব্য' — 'সমাজের (সুখের) সাধারণ লক্ষ্য' অর্জন।**

ফিখ্‌টের ওপর প্লেটোর প্রভাব আরো বেশি অনুভবযোগ্য। 'বাণিজ্যিক রুদ্ধ রাষ্ট্র' গ্রন্থে (১৮০০) ফিখ্‌টে স্পষ্টতই প্লেটোনিক ধারণার দিকে ঝুঁকেছেন (সমস্ত জীবনের বিশদ নিয়ামন, পেশা অনুসারে নাগরিকদের রাষ্ট্রীয় বিভাগ, প্রকল্পিত রাষ্ট্রের অর্থনৈতিক আত্মবদ্ধতা ও আত্মপ্রাচুর্য ইত্যাদি)।

বৃহদাকার মানুষের সঙ্গে রাষ্ট্রের তুলনা, আত্মা ও রাষ্ট্রের মূলনীতির মধ্যে সাদৃশ্য, রাজনৈতিক সমগ্রের সঙ্গে তার অংশের সম্পর্ক নিয়ে আঙ্গিক ও মনস্তাত্ত্বিক যে দৃষ্টিভঙ্গি প্লেটোর মধ্যে দেখা যায় তা কোনো না কোনো রূপান্তরে লক্ষ করা যাবে রাষ্ট্র, রাজনীতি, আইন বিষয়ক মতবাদের 'আঙ্গিক' বোধের অনেক প্রতিনিধির রচনায়।

উনিশ-বিশ শতকে প্লেটোনিক স্বাভাবিক-বিধির ধারণার ব্যাপক প্রসার দেখা যায় স্বাভাবিক বিধির পুনরুদয় নিয়ে নানান চিন্তায়।

পুনরাগত স্বাভাবিক বিধির বিভিন্ন ক্যাথলিক ভাষ্যে দেখা যাচ্ছে ও রূপান্তরিত হয়ে চলেছে প্লেটো ও আরিস্টটলের স্বাভাবিক-বিধির ধারণাকে খ্রিস্টীয় চেহারা দেবার টমিস্ট ধারা।

রাষ্ট্র ও আইন সম্পর্কে প্লেটোনিক মতবাদের বিস্তারিত নয়াকাণ্টীয় ব্যাখ্যা মিলবে বিশ শতকের গোড়ায় জার্মান দার্শনিক এরিখ কাসিরেরের লেখায়। স্বাভাবিক বিধিকে ব্যবহারশাস্ত্রের সঙ্গে দর্শনের একটা যোগসূত্র হিশেবে বুঝিয়ে কাসিরের ঠিক প্লেটোনিক ভাববাদেই তার উৎস দেখেছেন। তাঁর

মতে, যেখানে আলোচনা চলেছে যা 'চাপিয়ে দেওয়া নয়, প্রকৃতিগতভাবেই বিদ্যমান' তা নিয়ে, তখন প্লেটোর সমস্ত প্রসঙ্গেই প্রবেশ করে স্বাভাবিক বিধির নীতি*। আইনের নয়াকাণ্টীয় 'শুদ্ধ' ভাবের অর্থে তিনি প্লেটোর রাষ্ট্রকেও বলেছেন 'আইনী প্রতিষ্ঠান (প্রথা) যা তার অস্তিত্বের জন্য বাইরের প্রাকৃতিক আবশ্যিকতার কাছে নয়, আদর্শ নীতির কাছে ঋণী'। স্বাভাবিক বিধির এই ধরনের বোধ থেকে কাণ্ট অবধি নানা ধরনের স্বাভাবিক বিধি বিষয়ক মতবাদের ওপর আলোকপাত করেছেন কাসিরের।

কাসিরের জোর দিয়ে বলছেন: 'প্লেটো মুক্তি কথাটার আধুনিক বোধের বিরোধী নন, কেননা তিনি স্বেচ্ছাচারী সম্প্রদায়ের প্রভুত্বের পক্ষে নন, বিচক্ষণদের শাসনের পক্ষে'**।

সমগ্রভাবে প্লেটোর রাজনৈতিক দর্শন এবং স্বাভাবিক বিধি সম্পর্কে তাঁর ধারণা নিয়ে বিশ শতকের গোড়ায় বিশেষ মনোযোগী হয়ে ওঠেন বিখ্যাত রুশ বৈজ্ঞানিক-ব্যবহারশাস্ত্রী প. নভ্‌গোরদৎসেভ। প্লেটোর উত্তরাধিকার বিষয়ে তাঁর মনোভাবের বৈশিষ্ট্য হল উদারনৈতিক নয়াহেগেলবাদ ও নয়াকাণ্টবাদের দিকগুলিকে মেলানো।

প্লেটো-সক্রেটিসের প্রাচীন উত্তরাধিকার নিয়ে আরো বেশি গবেষণার ডাক দিয়েছেন নভ্‌গোরদৎসেভ, আর ২০-এর দশকের শেষের দিকে জার্মান ঐতিহাসিক-দার্শনিক ক. গ্রনাউ একেবারে 'প্লেটোর পুনরুজ্জীবনের' কথাই বলেছেন। তিনি লিখেছেন: 'আমরা, আজকের লোকেরা, বিশেষ করে আমরা, জার্মানরা অবশ্যই আত্মার প্লেটোনিক রাজ্যে শত বর্ষ আগের মতো অত তীব্রভাবে সুন্দরের ভাবনা ও শিল্পের নিয়মাদির সন্ধান করি না; আমরা সর্বাগ্রে খুঁজি পরিষ্কার, অবজেকটিভ মানদণ্ড যা দিয়ে আমরা রাষ্ট্রের আত্মিক নির্মাণে নামতে পারব এবং খুঁজি সেজন্য লালনপালনের সমস্যা'***।

সেই বছরগুলিতেই অনুরূপ মত প্রকাশ করেছেন বিখ্যাত জার্মান ঐতিহাসিক ভেরনের ইয়াগেরও****।

৪০-এর দশকে গ্রীক-প্লেটো ধরনের মুক্তি ও বিধি, সত্য আর আইন, লগস আর ডিকের মধ্যে সম্পর্ক স্থাপনের জন্য সংগ্রাম ঘোষণা করেন প্রখ্যাত

জার্মান দার্শনিক নয়াকান্টপন্থী এর্নস্ট কাসিরের*। আগে যে র. পেলমানের কথা বলেছি, তিনি প্লেটোর রাজনৈতিক দর্শনকে রক্ষা করেন বহুজনের এই আক্রমণ থেকে যে প্লেটোনিক নির্মিতিতে ব্যক্তির অধিকার ও স্বাধীনতা উপেক্ষিত হয়েছে। প্লেটোর অতি মূল্যবান উত্তরাধিকার হিশেবে তিনি তুলে ধরেছেন জনগণের এবং স্বাধীনতার সেই শত্রুর বিরুদ্ধে সংগ্রাম যাকে এই আদি কমিউনিস্টবিরোধী তৎকালীন সোশ্যাল-ডেমোক্রাসির সঙ্গে এক করে দেখতেন**।

প্লেটোর রাজনৈতিক দর্শনের যুদ্ধোত্তর ও বর্তমানের বহু বুর্জোয়া ব্যাখ্যার বৈশিষ্ট্য হল আধুনিক আত্মিক পরিস্থিতি ও ভাবাদর্শীয় সংগ্রামের সঙ্গে প্লেটোর উত্তরাধিকারকে খাপ খাইয়ে নেবার প্রয়াস।

ওদিকে আবার ব. রাসেল, ক. পপ্পার, ই. টোপিচ প্রভৃতি বুর্জোয়া উদারনীতিকেরা প্লেটোর রাজনৈতিক মতবাদের তীব্র সমালোচক (লক্ষণীয় যে সবাই এঁরা দৃষ্টবাদের অনুগামী)। প্লেটোকে তাঁরা সমগ্রভাবে সর্বগ্রাসী শাসন ব্যবস্থার পক্ষপাতী, কর্তৃত্বপ্রধান রাষ্ট্রের প্রবর্তক বলে বর্ণনা করেন। পপ্পারের মতে, ঠিক প্লেটো থেকেই এসেছে যেমন মধ্যযুগীয় কর্তৃত্বপ্রাধান্য, তেমনি আধুনিক সর্বগ্রাসী রাষ্ট্রের মতবাদ। সর্বগ্রাসিতার মধ্যে আধুনিক কমিউনিজমকেও ধরে পপ্পার তার উৎস দেখেছেন প্লেটোর 'কমিউনিজমের' মধ্যে***।

সংযোগ গ্রন্থি হিশেবে হেগেলকে ধরে পপ্পার সেতু পাতেন প্লেটো থেকে মার্কস অবধি, উভয়ের বিরুদ্ধেই সমানভাবে চালান কমিউনিস্ট বিরোধী আক্রমণ। প্লেটোর রাজনৈতিক দর্শনকে ব. রাসেল বলেছেন 'রাজনীতিতে কর্তৃত্ববাদ'।

প্রাচীন যুগের দার্শনিককে আধুনিক গণতন্ত্রী বা সর্বগ্রাসিতার পক্ষপাতী বলে দেখাবার প্রয়াস মূলতই অনৈতিহাসিক। মূর্ত-নির্দিষ্ট ঐতিহাসিকতায় প্লেটো পোষণ করতেন অভিজাততান্ত্রিক রাজনৈতিক মত। এই অবস্থানের দার্শনিক রূপ দেওয়া হয়েছে আদর্শ রাষ্ট্রের পরিকল্পনায়, প্লেটোর সমসাময়িক পটভূমি ছাড়া তা পরিগ্রহ করে আদর্শ একটা মডেলের চরিত্র

এবং রাজনৈতিক-আইনী ক্ষেত্রে দিশারীর একটা তাত্ত্বিক রূপকল্প। কিন্তু এই ধরনের সব তাত্ত্বিক মডেলের সর্বাঙ্গীণ মূল্যায়ন এবং ভবিষ্যতে তাদের যথোচিত প্রয়োগের জন্য প্রয়োজন এগুলির মূর্ত-নির্দিষ্ট ঐতিহাসিক পটভূমি এবং তাদের উদ্ভবের সামাজিক-অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, জ্ঞানতাত্ত্বিক ভিত্তি।

আমাদের থেকে সুদূর অতীতে নিবেদিত প্লেটোর রাজনৈতিক দর্শনের অনেককিছুই সেকেলে, তুচ্ছ, ভ্রান্ত এবং আমাদের কাছে অপ্রযোজ্য। প্লেটোনিক মতবাদের একসারি দার্শনিক-রাজনৈতিক প্রস্তাবের প্রতিক্রিয়াশীলতা সুস্পষ্ট। কিন্তু এ মতবাদে এমন জিনিসও আছে যা অবধারণার দিক থেকে মূল্যবান। 'প্লেটো কর্তৃক নগরের (গ্রীকদের কাছে যা রাষ্ট্র থেকে অভিন্ন) স্বাভাবিক ভিত্তি হিশেবে শ্রমবিভাগের যে বর্ণনা তৎকালের পক্ষে প্রতিভাদীপ্ত'* তার উল্লেখ করেছেন ফ. এঙ্গেলস। রাজনৈতিক-আইনী সমস্যাদির একটা বিস্তীর্ণ যৌগিকের ওপর দার্শনিক আলোকপাতে প্লেটোই অগ্রদূত, এদের অনেকগুলির বিচারই প্লেটোর সৃজনশীল প্রতিভায় চিহ্নিত।

রাজনৈতিক মতবাদের পরবর্তী ইতিহাসে স্থান নিয়েছে তাঁর অনেকগুলি তাত্ত্বিক পরিকল্পনা — জ্ঞানতত্ত্বের দিক দিয়ে যা মূল্যবান তাও, যা বিভ্রমাত্মক তাও। বিভিন্ন তাদের সামাজিক-রাজনৈতিক আর ভাবাদর্শীয় অভিমুখ ও প্রয়োগ। এই সবকিছু সম্পর্কে একটা সমালোচনামূলক মনোভাব ছাড়া রাজনৈতিক মতবাদের ইতিহাস এবং রাজনীতি, আইন, রাষ্ট্রের আধুনিক তত্ত্বাদিতে একটা ভালোরকম দিশা পাওয়া যাবে না তাই শুধু নয়, রাজনৈতিক বাস্তবতায় সুচিন্তিত অভিমুখও সম্ভব হবে না।

প্লেটোর মতো এমন বিশালকায় লেখকের সৃজনশীল উত্তরাধিকারে যা নঞর্থক তাও সদর্থকের চেয়ে কম শিক্ষাপ্রদ নয়। আমরা হয়ত প্লেটোর রাষ্ট্রে বাস করতে চাইব না, কিন্তু কিরকম রাষ্ট্রে বাস করা ভালো তা বেশি বোধগম্য হয়েছে প্লেটোরই পরে।

২৫। **আরিস্টটল**

আরিস্টটল এক দিক্‌পাল প্রাচীন মনস্বী। পৃথক একটা স্বাধীন বিষয় হিশেবে রাজনীতিবিদ্যার ভিত পাতেন তিনি।

মার্কসবাদ-লেনিনবাদের প্রতিষ্ঠাতারা তাঁর সৃজনী উত্তরাধিকারে উচ্চ মূল্য দিয়েছেন। ক. মার্কস তাঁকে বলেছেন প্রাচীন কালের প্রতিভাধর দ্বান্দ্বিক গবেষক ও মহামনীষী*। ক. মার্কস, ফ. এঙ্গেলস ও ভ. ই. লেনিন আরিস্টটলীয় মতবাদের দ্বান্দ্বিক গভীরতা লক্ষ করেছেন এবং অখণ্ড

মনোযোগ নিবদ্ধ করেছেন তাঁর দর্শনের বস্তুবাদী দিকগুলিতে।*

আরিস্টটলের (খ্রিঃ পূঃ ৩৮৪-৩২২) জন্ম অনতিবৃহৎ স্তাগির শহরে। তাঁর পিতা নিকোমাখাস বহুকাল ছিলেন মেসিডোনিয়ার রাজা তৃতীয় আমিন্তার সভাচিকিৎসক। পিতার মৃত্যুর পর সতেরো বছরের আরিস্টটল চলে আসেন এথেন্সে (খ্রিঃ পূঃ ৩৬৭), সেখানে অধ্যয়ন করেন এবং পরে প্লেটোর মৃত্যু অবধি অধ্যাপনা করতে থাকেন তাঁর আকাদেমিতে। এথেন্স ত্যাগ করে (খ্রিঃ পূঃ ৩৪৭) তিনি অন্যান্য গ্রীক রাষ্ট্রে বাস করেন এবং মেসিডোনিয়ার রাজা দ্বিতীয় ফিলিপের আমন্ত্রণক্রমে খ্রিঃ পূঃ ৩৪২-৩৪০ সালে তাঁর পুত্র আলেকজাণ্ডারের শিক্ষকতা করেন। পরে আরিস্টটল ফের এথেন্সে। এখানে তিনি স্থাপন করেন তাঁর নিজস্ব দার্শনিক আশ্রম (লিকেই) এবং তার পরিচালনা করেন প্রায় মৃত্যু অবধি। খ্রিঃ পূঃ ৩২৩ সালে আলেকজাণ্ডারের মৃত্যুর পর মেসিডোনিয়া প্রীতির জন্য তাঁর বিরুদ্ধে নিরীশ্বরতার অভিযোগ আনার উপক্রম হয়। সক্রেটিসের মতো এক্ষেত্রেও ব্যাপারটা ছিল এথেন্সের প্রতি আনুগত্যহীনতা নিয়ে। হস্তদন্ত নগর ছেড়ে যাওয়ার কারণ সম্পর্কে তিনি বিদ্রূপভরে বলেছিলেন ওটা দর্শনের বিরুদ্ধে এথেন্সবাসীদের পাপের পুনরাবৃত্তি করতে চান নি বলে। কয়েক মাস পরে তাঁর মাতার জন্মভূমি এভবেয়া নদীতীরের খালকিসে মৃত্যু হয়।

*

রাজনীতিবিদ্যার একটা সর্বাঙ্গীণ বিশদীকরণের চেষ্টা করেন আরিস্টটল। বিজ্ঞান হিশেবে রাজনীতি তাঁর কাছে নৈতিকতার সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত। আরিস্টটলের মতে, রাজনীতির বৈজ্ঞানিক বোধ হল সুনীতির (সদ্‌গুণের) বিকশিত ধারণা, নীতিশাস্ত্রের (সদাচারের) জ্ঞান।

রাজনীতিবিদ্যার বিষয় হল সুন্দর ও ন্যায়, কিন্তু নীতিশাস্ত্রেও ঐ একই বিষয় আলোচিত হয় সদাচার হিশেবে। নীতিশাস্ত্র তাঁর কাছে রাজনীতির সূত্রপাত, তার উপক্রমণিকা। আরিস্টটলের 'নীতিশাস্ত্র'এ সুবিশিষ্ট নৈতিক প্রসঙ্গ ছাড়াও একান্তরূপে রাজনৈতিক-আইনী সমস্যাও গবেষিত হয়েছে।

বিভিন্ন শিল্প ও বিজ্ঞান যেসব লক্ষ্যার্জনে চেষ্টিত, তার সোপান শ্রেণীতে রাজনীতিবিদ্যার লক্ষ্যই সর্বোচ্চ। প্রয়োগবিষয়ক বাকি অন্য সমস্ত বিদ্যার লক্ষ্য এর অন্তর্ভুক্ত (রাজনীতি নিজেই প্রয়োগের, ক্রিয়াকলাপের বিদ্যা,

কেননা রাজনীতি হল মানুষের, রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ কল্যাণের বিদ্যা) ('নীতিশাস্ত্র', এক, §১)।

মানবজাতির সর্বোচ্চ লক্ষ্য পরমানন্দ মেলে সদাচারভিত্তিক ক্রিয়াকলাপে। এই লক্ষ্যার্জনে রাজনীতিও চালিত। 'রাজনীতির লক্ষ্য সর্বোচ্চ; তার প্রধান প্রযত্ন হল নাগরিকদের একটা নির্দিষ্ট রূপের উৎকর্ষ দান করা, তাদের সুন্দর প্রবেশমুখী লোক করে তোলা' ('নীতিশাস্ত্র', এক, §১০)।

'নীতিশাস্ত্র'এ 'উত্তম মানুষের' নৈতিক সদাচার ও গুণ নিয়ে যে বিশ্লেষণ করা হয়েছে, সেটাই হল 'রাজনীতি'তে রাজনৈতিক সদাচার, 'উত্তম নাগরিকের' বৈশিষ্ট্য এবং রাজনৈতিক আদানপ্রদানের সমস্ত ক্ষেত্রের ওপর আলোকপাতে উত্তরণের আয়োজন।

সদাচার হল আত্মাহৃত ধর্ম। আরিস্টটলের মতে, তা ডায়ানোএথিক (মননগত) এবং নৈতিক (ঐচ্ছিক) — এই দুইভাগে বিভক্ত। নৈতিক সদাচার হল চরিত্রের সদাচার। স্বভাবগতভাবেই তা অর্জন আমাদের পক্ষে সম্ভব, আচরণের উপযোগী অভ্যাসাদি শীলিত করে আমরা তাদের সুসম্পূর্ণতায় তুলতে পারি। আরিস্টটলের মতে, লোকে প্রকৃতিগতভাবেই সদাচারী এমন নয়, কিন্তু নীতিবান হবার সম্ভাবনা থেকে সত্যসত্যই সদাচার অর্জন এবং তদনুযায়ী অভ্যাস আয়ত্তিতে উত্তরণ তার ক্ষমতাধীন। নীতিবান বা দুর্নীতিগ্রস্ত হওয়া নির্ভর করছে আমাদেরই ওপর ('নীতিশাস্ত্র', তিন, § ৭)।

তবে এ কথাও সত্যি যে আরিস্টটল এইসব উপস্থাপনা থেকে সরে গিয়ে মনে করেন যে সত্যকার লক্ষ্যার্জনের প্রয়াস ব্যক্তিগত নির্বাচনাধীন নয়: 'মহানুভব লোক' হবার গুণ কেবল স্বাভাবগত ('নীতিশাস্ত্র', তিন, §৭)।

নীতিশাস্ত্র ও রাজনীতির মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক চমৎকার ফুটে উঠেছে ন্যায্যতার সমস্যা আলোচনায়। আত্মা থেকে অর্জিত গুণ হিশেবে ন্যায়পরায়ণতা হল মহত্তম সদাচার (পৌরুষ, নম্রতা, বদান্যতা, মহানুভবতা ইত্যাদির তুলনায়) এবং তা নীতিশাস্ত্রের অন্তর্গত; এই দিক থেকে ন্যায়পরায়ণতা সদাচারের একটা অঙ্গ। কিন্তু ন্যায়পরায়ণতার অন্য একটা দিকও আছে — অন্যান্যদের সঙ্গে তার সম্পর্ক। এই অর্থে মানবিক সম্পর্কের সমস্ত সদাচারই ন্যায়পরায়ণতায় বিধৃত এবং তা রাজনীতির বিষয়।

দুই ধরনের ন্যায্যতার মধ্যে পার্থক্য করেছেন আরিস্টটল: বণ্টনভিত্তিক ও সমমাত্রিক ('নীতিশাস্ত্র', পাঁচ, §৫)। নীতি হিশেবে বণ্টনভিত্তিক ন্যায্যতায় বোঝায় সমাজের কোনো একজন সভ্যের যোগ্যতা, আনুপাতিক অবদান অনুসারে সাধারণ সম্পদের বণ্টন। এক্ষেত্রে যথানুসারী বিভূতির (ক্ষমতা,

সম্মান, অর্থ) যেমন সমান, তেমনি অসমান ভাগাভাগি সম্ভব। সমমাত্রিক ন্যায্যতার নিরিখ হল পাটীগণিতিক সাম্য, এ নীতি প্রয়োগের ক্ষেত্র হল নাগরিক-আইনী ব্যাপারাদি, ক্ষতিপূরণ, শাস্তিদান ইত্যাদি।

দুই ধরনের ন্যায্যতার যে যুক্তি দেন আরিস্টটল, তা মূলত দুই ধরনের সাম্য বিষয়ে প্লেটোর বক্তব্যের পুনরুক্তি। উভয় ক্ষেত্রেই ব্যাপারটা সামাজিক-রাজনৈতিক সম্পর্কে নির্দিষ্ট একটা অসাম্যের ন্যায্যতা প্রতিপাদন নিয়ে। উভয় দৃষ্টিভঙ্গি থেকেই দেখা দিয়েছে একই অন্তর্লীন অগণতান্ত্রিক, আভিজাতিক অবস্থান। ন্যায্য অসাম্য (প্লেটো অনুসারে) অথবা অসমান ন্যায্যতা (আরিস্টটল অনুসারে) রাজনৈতিক-আইনী জীবনের সঠিক সংগঠনের একান্ত আবশ্যিক শর্ত।

উপরোক্ত নীতিশাস্ত্রীয় বিচার থেকে রাজনীতির পক্ষে মূলগত গুরুত্বপূর্ণ যে সিদ্ধান্ত টানা হয়েছে তা হল এই যে রাজনৈতিক ন্যায় থাকে স্বাধীন ও সমান লোকেদের মধ্যে। এ ন্যায়ের লক্ষ্য হল এই লোকেদের আত্মনির্ভর পরিভোগ (অটার্কি)।

এইভাবে রাজনৈতিক ন্যায় হল কর্তৃত্বের রাজনৈতিক রূপের একটা নীতি (দাসের ওপর প্রভুর, সন্তানের ওপর পিতার কর্তৃত্ব থেকে যা পৃথক), এবং লোকেদের মধ্যে সম্পর্ক সংগঠনের রাজনৈতিক উপায়ের একটা নিয়ম। রাজনৈতিক সামাজিকতায় তার সভ্যদের স্বাধীনতা ও সাম্য বলতে বোঝায় আধিপত্য ও অধীনতা। 'নীতিশাস্ত্র'এর প্রসঙ্গ পেঁছয় রাষ্ট্র ব্যবস্থা এবং তার বিভিন্ন রূপের প্রশ্নে, 'রাজনীতি'র মৌলিক সমস্যাদিতে।

রাজনীতি নিয়ে বৈজ্ঞানিক গবেষণার পদ্ধতি আরিস্টটল সূত্রবদ্ধ করেছেন এইভাবে: একটা জটিল সমগ্ররূপ রাষ্ট্রকে তার অঙ্গ-উপাদানে বিভাজন, তার প্রতিটি পৃথক পৃথক বৈশিষ্ট্যের বিচার, তারপর এইসব উপাদানের বিভিন্ন সমন্বয় হেতু সমগ্রের রূপলাভ ও সক্রিয়তার বিশ্লেষণ। তবে এইসমস্ত উপাদানের বিভাজন ও সংযোজন ঘটে বহুমুখী, 'রাজনীতি'তে তা অনুসৃত হয়েছে বিভিন্ন ভিত্তিতে।

আরিস্টটলের চোখে সমগ্রের গঠন এবং তার উপাদানগুলির অন্বয়ে প্রাধান্য করে আঙ্গিক চৈতন্য, প্রায়ই তিনি রাষ্ট্র ও জীবন্ত দেহসত্তার প্রত্যক্ষ তুলনার আশ্রয় নেন, সমাজের বিভিন্ন উপাদানের সঙ্গে আত্মা, দেহ ইত্যাদির সাদৃশ্যের কথা বলেন।

রাজনীতির আরিস্টটলীয় ভাষ্যের একটা মূলগত দিক হল বহুসংখ্যক তুলনামূলক ঐতিহাসিক নজির, অতীতকালের এবং তাঁর সমসাময়িক রাষ্ট্রীয়-

আইনী অভিজ্ঞতার উল্লেখ, রাজনৈতিক ক্রিয়াকলাপের তাত্ত্বিক সামান্যীকরণ ও ব্যাখ্যায় একটা সচেতন উপস্থাপন। প্লেটোর তুলনায় তাঁর নির্মিতিগুলিতে অতিকথার ভূমিকা সামান্য। প্লেটো যা করেন নি, বাস্তব কর্মকাণ্ডের দিকে বড়ো একটা পদক্ষেপ করেন আরিস্টটল, সেটা দেখা যাবে যেমন তাঁর বিশ্লেষণের ধরন ও প্রণালীতে, তেমনি তাঁর গবেষণার বিষয়বস্তুকে (রাজনৈতিক বাস্তব ক্রিয়াকর্ম) গুরুত্বপূর্ণ বাস্তববাদী দৃষ্টিভঙ্গিতে গ্রহণের দিক থেকেও। আরিস্টটল চেষ্টা করেছেন বাস্তব রাজনৈতিক সম্পর্কের অভ্যন্তরীণ যুক্তিপরম্পরা ও সত্যকার অর্থ ধরতে, অর্থাৎ সেই ক্ষেত্রটার অর্থ ধরতে, যেখানে প্লেটোর কাছে বাস্তব কিছু নেই, আছে শুধু আদর্শ আদিরূপের পুত্তলিকাবৎ অনুকরণ অথবা তা থেকে বিচ্যুতি।

কিন্তু সমগ্রত, রাজনৈতিক গবেষণাকে যুক্তিযুক্ত করা এবং সর্বদা যথেষ্ট ভিত্তি না থাকলেও গুরুর সঙ্গে ঘোর বিতর্ক সত্ত্বেও আরিস্টটল তাঁর নির্মিতিগুলিতে রয়ে গেছেন প্লেটোর আদর্শায়িত রাজনৈতিক-আইনী প্রকল্পগুলির বহুল প্রভাবাধীনে। প্লেটোর প্রস্তাবনাগুলি থেকে প্রায়ই তিনি এগোন কোনো উচ্চবাচ্য না করে এবং বেশ কিছু ক্ষেত্রে তাঁর সঙ্গে নিজের পার্থক্যকে অতিরঞ্জিত করেন।

রাষ্ট্র হল স্বাধীন ও সমাধিকারী লোকেদের একটা রাজনৈতিক গোষ্ঠী — সমগ্রভাবে এই ধারণা থেকেই আরিস্টটল সামাজিক-রাজনৈতিক ও রাষ্ট্রিক-আইনী সমস্যাগুলির বিচার করেছেন।

রাষ্ট্র সম্পর্কে নিজের বোধ ও সংজ্ঞায় তিনি এগিয়েছেন প্রাচীন কালের পলিস বা নগর-রাষ্ট্রের আদর্শ রূপরেখা থেকে। আরিস্টটল যাকে রাষ্ট্র বলেছেন সেটা হল কেবল হেলেনীয় সংস্কৃতির ফলশ্রুতি এবং গ্রীকদের মধ্যে আদানপ্রদানের সর্বোচ্চ রূপ। বর্বরেরা (ইউরোপীয় ও এশিয়াবাসীরা), আরিস্টটলের মতে, রাষ্ট্রীয় জীবন যাপনে অক্ষম ('রাজনীতি', সাত, ৬, ১, ১৩২৭বি ১৬)।

রাষ্ট্র হল স্বাভাবিক বিকাশের ফল। এদিক থেকে তা স্বাভাবিকভাবে উদ্ভূত পরিবার ও বসতির মতো আদিম গোষ্ঠীর অনুরূপ। কিন্তু মেলামেশার বাকি সমস্ত রূপকে ধারণ করে রাষ্ট্র হল গোষ্ঠীর সর্বোচ্চ রূপ। রাজনৈতিক গোষ্ঠীতে মেলামেশার অন্য সমস্ত ধরনের সাযুজ্য লাভ করে তাদের লক্ষ্য (জীবনের কল্যাণ) এবং পরিপূর্ণতা। প্রকৃতিগতভাবেই মানুষ রাজনৈতিক জীব, লোকের এই রাজনৈতিক প্রকৃতির ভ্রূণ পূর্ণতা পায় রাষ্ট্রে (রাজনৈতিক গোষ্ঠীতে)। তবে সমস্ত লোকে, সকল জাতিসত্তাই

বিকাশের এই পর্যায়ে ওঠে নি। বর্বরদের মানবিক প্রকৃতি অবিকশিত, তারা স্বাধীন ও সমাধিকারী লোকেদের রাজনৈতিক গোষ্ঠীর উচ্চতায় ওঠে নি। 'প্রকৃতিগতভাবেই বর্বর ও দাস কথাদুটি অভিন্ন' ('রাজনীতি', এক, ১, ৫, ১২৫২বি ১৭)।

আরিস্টটলের মতে, প্রভু ও দাসের সম্পর্কটা পারিবারিক ব্যাপার, রাষ্ট্রের নয়। রাজনৈতিক ক্ষমতা আসে স্বাধীনতা ও সমাধিকারের সম্পর্ক থেকে, সন্তানের ওপর পিতার, দাসেদের ওপর প্রভুর আধিপত্য থেকে সেটা নীতিগতভাবে অন্যবিধ। বর্বরদের গোষ্ঠী অরাজনৈতিক এবং প্রাক্‌রাষ্ট্রীয়। রাজনীতি, রাজনৈতিক ন্যায়, রাষ্ট্র, আরিস্টটলের মতে, দেবতাদের নিম্নে ('নীতিশাস্ত্র', ছয়, §১৩), বর্বরদের ঊর্ধ্বে। দেবতা ও বর্বরদের মাঝখানে আছে নৈতিকভাবে বিকশিত গ্রীকরা — রাষ্ট্রের নাগরিকরা। 'আপতিক পরিস্থিতির দরুন নয়, নিজের প্রকৃতিগতভাবেই যে রাষ্ট্রের বাইরে বাস করে, সে হয় অতিমানব নয় নৈতিক দিক থেকে অবিকশিত প্রাণী' ('রাজনীতি', এক, ১, ৯, ১২৫৩এ ১৬)।

লোকেদের এবং তাদের ভেতরকার বিভিন্ন রূপের আদানপ্রদানের প্রকৃতি যেহেতু পূর্ণতা লাভ করে রাষ্ট্রে, তাই, আরিস্টটল মন্তব্য করেছেন, 'রাষ্ট্রের প্রকৃতি পরিবার ও ব্যক্তিমানুষের প্রকৃতির অগ্রবর্তী', 'প্রকৃতিগতভাবেই রাষ্ট্র আসে ব্যক্তির আগে' ('রাজনীতি', এক, ১, ১২, ১২৫৩এ ১৬)।

ব্যক্তি ও বিভিন্ন ধরনের গোষ্ঠীর তুলনায় রাষ্ট্রের অগ্রবর্তির যে থিসিস পরবর্তী কালের রাজনৈতিক মতবাদে (রুসো, হেগেল প্রভৃতি) গৃহীত হয়েছে, আরিস্টটলের কাছে তার তাৎপর্য এইরূপ: প্রথমত, মানুষ ও মানবিক আদানপ্রদানের যা প্রকৃতি, তার সর্বোচ্চ লক্ষ্য সাধিত হয় রাষ্ট্রে। দ্বিতীয়ত, শুধু রাষ্ট্রের কাঠামোর মধ্যেই ব্যক্তি, পরিবার ইত্যাদি হয়ে ওঠে জীবন্ত ও অখন্ড রাজনৈতিক দেহযন্ত্রের ক্রিয়াশীল উপাদান।

আরিস্টটলের কাছে তাই রাষ্ট্রের অগ্রবর্তিতা দাঁড়াচ্ছে রাজনীতির ক্ষেত্রে তাঁর টেলিওলজিকাল (লক্ষ্যের সোপানধর্মিতা ও অধীনঅক্রম) ও আঙ্গিক ধারণার ওপর। সময়ের দিক থেকে কিন্তু কালানুক্রমে ও প্রাকৃতিক-ঐতিহাসিক ভাবে তথা নৈতিক-সাংস্কৃতিক ভূমিকায় ব্যক্তি, পরিবার ইত্যাদির চেয়ে রাষ্ট্র অনেক পরবর্তী একটা গঠন।

প্লেটোর মতো আরিস্টটলের কাছেও রাষ্ট্র একটা সমগ্র, তার অঙ্গ উপাদানগুলির ঐক্য-ঘটিত ব্যাপার, কিন্তু 'রাষ্ট্রকে মাত্রাতিরিক্ত একীভূত করে' দেখার জন্য তিনি সমালোচনা করেন প্লেটোকে ('রাজনীতি', দুই, ১,

৭, ১২৬১বি ১৫)। রাষ্ট্র বহু উপাদান নিয়ে গঠিত, ঐক্যের গণ্ডির অভ্যন্তরে সেগুলির বিশেষ বিশেষ পার্থক্য আছে। এইসব উপাদানের বড়ো বেশি ঐক্যের চেয়ে কম মাত্রার ঐক্য বরং বাঞ্ছনীয়। যেমন, সম্পত্তি, স্ত্রী ও শিশুদের সর্বজনীন করার যে প্রস্তাব প্লেটো দিয়েছেন, সেরূপ মাত্রাতিরিক্ত ঐক্যের প্রয়াসে রাষ্ট্র ধ্বংস পাবে।

এই অবস্থান থেকে আরিস্টটল প্লেটোনিক রাষ্ট্রের উভয় প্রকল্পেরই সমালোচনা করেছেন। প্লেটোর বক্তব্যের কথা মনে রেখেই তিনি লিখেছেন: আসলে 'সক্রেটিসের প্রকল্পের মৌলিক ভুলটাকে দেখতে হবে তাঁর বনিয়াদী পূর্বানুমানের বেঠিকতায়। আসলে দাবি করা উচিত যেমন পরিবার, তেমনি রাষ্ট্রের ক্ষেত্রে পরম নয়, আপেক্ষিক ঐক্য' ('রাজনীতি')।

ব্যক্তির অধিকার, সর্বাগ্রে নিজস্ব সম্পত্তির ওপর ব্যক্তির অধিকারকে দৃঢ় প্রত্যয়ে সমর্থন করেছেন আরিস্টটল, ব্যক্তিগত পরিবার এবং রাষ্ট্রের তুলনায় তার সুনির্দিষ্ট কতকগুলি বৈশিষ্ট্য থাকার আবশ্যিকতা প্রতিপাদন করেছেন। সম্পত্তি, পরিবার ও শিশুদের সামাজিকীকরণ ও রাষ্ট্রীয়করণের অসংখ্য বিরোধীদের মধ্যে তাঁর যুক্তিগুলি পরে ব্যাপকভাবে ছড়ায়।

শেষ বিচারে ব্যক্তিগত মালিকানার মূল প্রোথিত লোকের প্রকৃতিতেই, নিজের প্রতি তার স্বাভাবিক ভালোবাসায়। 'নীতিশাস্ত্র'এই তিনি আত্মপ্রেমকে অতি মূল্যবান একটা সদাচার বলে ব্যাখ্যা করেছেন: 'প্রতিটি মানুষ নিজেই নিজের সবার বড়ো বন্ধু, তার উচিত সবার চেয়ে নিজেকে ভালোবাসা' ('নীতিশাস্ত্র', নয়, §৮)। কথাটার বহুলপ্রচারিত লজ্জাকর অর্থে যে অন্যায় স্বার্থপরতা বোঝায়, তা থেকে এরূপ আত্মপরতা বিচক্ষণ ও সুন্দর। সুতরাং ব্যক্তিগত সম্পত্তিকে বিচক্ষণ ও সদাচারী নীতি বলে মেনে নেওয়া উচিত বিধানদাতাদের।

কিন্তু সেই সঙ্গে আরিস্টটল অর্থগৃধ্নুতা, মাত্রাতিরিক্ত ধনসঞ্চয় ইত্যাদিরও বিরোধী। তাঁর অবস্থান হল এই যে সম্পত্তি হওয়া উচিত ব্যক্তিগত, কিন্তু তার সদ্ব্যবহার ও ফলভোগ হওয়া উচিত সাধারণ।

আরিস্টটল মনে করেন, আধুনিক রাষ্ট্রে যে অকল্যাণ বর্তমান তা আসছে সম্পত্তির ওপর সামাজিক অধিকারের অভাব থেকে নয়, আসছে লোকেদের নৈতিক অধঃপতন থেকে। আর প্লেটো যেসব ব্যবস্থার প্রস্তাব করেছেন তা সিম্ফনিকে ধ্বনিসঙ্গতি অথবা ছন্দকে কেবল তাল দিয়ে বদল করার সমতুল্য। এসব কিছু কেবল রাষ্ট্রের ক্ষতি সাধন করবে অথবা তাকে সার্বিকভাবে ধ্বংস করবে।

তিনি বলেছেন, রাষ্ট্র একটা জটিল কথা। আকারের দিক থেকে তা একটা সংগঠন, নাগরিকদের সুনির্দিষ্ট একটা সামূহিকতা। এদিক থেকে কথাটা আর ব্যক্তি, পরিবার ইত্যাদির মতো রাষ্ট্রের প্রাথমিক উপাদানগুলি নিয়ে নয়, নাগরিকদের নিয়ে। রূপ হিশেবে রাষ্ট্রের সংজ্ঞা নির্ভর করছে কাকে নাগরিক বলে গণ্য করা হবে তার ওপর, অর্থাৎ নাগরিক কথাটার মানের ওপর। আরিস্টটল মনে করেন, সেই নাগরিক যে নির্দিষ্ট রাষ্ট্রটির বিধান-উপদেশক ও বিচারক্ষমতায় অংশ নিতে পারে। আর রাষ্ট্র হল স্বয়ংভর অস্তিত্বের জন্য নাগরিকদের যথোচিত একটা সামূহিকতা।

সব ধরনের রাষ্ট্রই নাগরিক বলতে সেখানে যা বোঝা হয়, তারই অনুরূপ, নাগরিক অধিকারসমূহে ভূষিত জনমণ্ডলীকে বাছাই করার ভিত্তির অনুরূপ। নাগরিক কথাটার অর্থ, সুতরাং রাষ্ট্রের রূপ পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে খোদ রাষ্ট্রটাই বদলে যায়।

রাষ্ট্রের রূপ বলতে আরিস্টটল সেই রাজনৈতিক ব্যবস্থাকে বুঝিয়েছেন যাতে মূর্তিমান হয় রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ ক্ষমতা। এই দিক থেকে রাষ্ট্রের রূপ নির্ধারিত হয় ক্ষমতাধরদের সংখ্যায় (একজন, অল্পসংখ্যক, অধিকাংশ)। তাছাড়া, রাষ্ট্রের সঠিক ও বেঠিক রূপের মধ্যেও তফাৎ করা হয়েছে: সঠিক রূপে শাসকেরা সাধারণ কল্যাণের কথা মনে রাখে, বেঠিক রূপে দেখে শুধু নিজেদের স্বার্থ। রাষ্ট্রের তিনটি সঠিক রূপ হল রাজশাসন (রাজার ক্ষমতা), অভিজাততন্ত্র ও পলিটিয়া এবং তা থেকে যথাক্রমে তাদের ভুল বিচ্যুতি হল স্বৈরশাসন, গোষ্ঠীতন্ত্র ও গণতন্ত্র ('রাজনীতি', তিন, ৫, ১-৪, ১২৭৯এ ২৬)।

প্রতিটি রূপের আবার কয়েকটা করে প্রকারভেদ আছে, রূপগঠক উপাদানগুলির বিভিন্ন সমন্বয়ে সেটা যতখানি সম্ভব, ততটা।

রাজক্ষমতার প্রকারভেদ হল: ১) রণনীতিকদের যাবজ্জীবন ক্ষমতা (আরিস্টটলের সমকালীন স্পার্টায়); ২) কিছু বর্বর উপজাতির রাজক্ষমতা; তা প্রতিষ্ঠিত আইন অনুসারে এবং উত্তরাধিকারের ভিত্তিতে, তবে তা স্বেচ্ছাচারী, স্বৈরশাসনের চরিত্র নেয়; ৩) প্রাচীন গ্রীকদের এসিমনেটিয়া (নির্বাচনমূলক স্বৈরশাসন); ৪) মহাবীর রাজা; ৫) সকলের ওপর একজনের নিরঙ্কুশ ক্ষমতা।

আরিস্টটলের মতে, সাধারণ রাজতন্ত্র রাষ্ট্রের শ্রেষ্ঠ রূপ নয়। প্লেটোর বিরোধিতা করে তিনি মনে করেন শ্রেষ্ঠ স্বামীর ক্ষমতার চেয়ে শ্রেষ্ঠ আইনাদির ক্ষমতা বেশি কাম্য। আইনে উন্মত্ততার উপাদান নেই, যা থেকে

কোনো মানবাত্মাই মুক্ত নয়। তাছাড়া, বহুজনে বিচার করতে পারে একজনের চেয়ে ভালো, তা তিনি যেই হোন না কেন।

অবিশ্যি এই একটা ব্যতিরেক করা হয়েছে যে, এমন কোনো অসামান্য লোক যদি দেখা দেয় যে তার সদাচারে দেবতার মতো বাকি সবাইকে ছাড়িয়ে যাচ্ছে, তাহলে তার পরম কর্তৃত্ব মেনে নেওয়া যুক্তিসঙ্গত। রাজতন্ত্র যদি একটা ফাঁকা কথা না হয়, যদি তা বাস্তবে বিদ্যমান থাকে, তাহলে তার ভিত্তি হল রাজার সমুচ্চ শ্রেষ্ঠতায় এবং সমস্ত রূপের মধ্যে তাই হল সর্বাধিক ঐশ্বরিক। তবে এটা খুবই বিরল ঘটনা।

অভিজাততন্ত্র হল, আরিস্টটলের মতে, নৈতিক দিক থেকে সেরা লোকেদের শাসন। রাষ্ট্রের পক্ষে এটা রাজতন্ত্রের চেয়ে বেশি কাম্য। শুধু অভিজাততন্ত্রেই 'উত্তম স্বামী' ও 'উত্তম নাগরিক' কথাদুটির অর্থ অভিন্ন, যেক্ষেত্রে অন্যান্য রাষ্ট্ররূপে কথাদুটির অর্থ আপেক্ষিক। অভিজাততন্ত্রের সম্পূর্ণ রূপের উল্লেখ ছাড়াও আরিস্টটল তার প্রকারভেদের মধ্যে ধরেছেন কার্থেজ, স্পার্টা এবং সেই ধরনের রাষ্ট্রকে যা পলিটিয়া থেকে গোষ্ঠীতন্ত্রের দিকে বিচ্যুতি।

সবচেয়ে সঠিক ধরনের রাষ্ট্রকে আরিস্টটল বলেছেন পলিটিয়া যে শব্দটায় বোঝায় সাধারণভাবেই রাষ্ট্র ব্যবস্থা। পলিটিয়ায় সাধারণ কল্যাণের জন্য শাসন চালায় অধিকাংশ।

অন্য সমস্ত ধরনের রাষ্ট্রই হল পলিটিয়া থেকে কোনো না কোনো বিচ্যুতি। অন্য দিকে পলিটিয়া নিজেই হল, আরিস্টটলের মতে, গোষ্ঠীতন্ত্র ও গণতন্ত্রের কেমন একটা মিশ্রণ। পলিটিয়ার এই ব্যাপারটা (ধনী ও নিঃস্বের স্বার্থ, ঐশ্বর্য ও স্বাধীনতার মিলন) বেশির ভাগ রাষ্ট্রেই বর্তমান, অর্থাৎ রাজনৈতিক সমাজ হিশেবে সাধারণভাবেই তা রাষ্ট্রের বৈশিষ্ট্য।

রাষ্ট্রের বেঠিক রূপগুলির মধ্যে সর্বনিকৃষ্ট হল স্বৈরশাসন। দুই ধরনের স্বৈরশাসন (বর্বরদের রাজক্ষমতা এবং প্রাচীন কালের গ্রীকদের এসিমনেটিয়া) রাজতন্ত্রের সদৃশ, কেননা তা আইনের ওপর এবং প্রজাদের পক্ষ থেকে তার স্বেচ্ছামূলক স্বীকৃতির ওপর প্রতিষ্ঠিত। কিন্তু ক্ষমতা এখানে প্রযুক্ত হয় স্বেচ্ছাচারীর মতো, স্বৈরশাসকের মর্জি অনুসারে, রাজনৈতিকভাবে নয়। তৃতীয় ধরনের স্বৈরশাসন — সেটা নিরঙ্কুশ রাজতন্ত্রের অনুরূপ; স্বৈরশাসকের ক্ষমতা এখানে চূড়ান্ত, সেটা প্রযুক্ত হয় তার নিজস্ব ব্যক্তিগত স্বার্থে, প্রজাপুঞ্জের স্বেচ্ছামূলক সম্মতিক্রমে নয়।

গোষ্ঠীতন্ত্র ও গণতন্ত্রের বৈশিষ্ট্য বর্ণনায় অনেক মন দিয়েছেন

আরিস্টটল। এই দুই ধরনের বৈঠিক রাষ্ট্র বহুক্ষেত্রে একেবারে পরস্পর বিপরীত, সেই কারণে তাদের মিশ্রণ এবং পলিটিয়া হিশেবে তাদের 'মাঝামাঝিটাকে' ব্যাখ্যা করা সম্ভব।

আপাতিক একটা লক্ষণ হিশেবে শাসকদের সংখ্যাটা নয়, গোষ্ঠীতন্ত্র ও গণতন্ত্রের মধ্যে পার্থক্যের মূলকথা হল ধন ও দারিদ্র্যের বৈপরীত্য। শাসকদের সংখ্যাকে পার্থক্যের একটা আপাতিক দিক বলে গণ্য করে আরিস্টটল ক্ষেত্র তৈরি করেছেন ঠিক পলিটিয়াকেই অধিকাংশের ক্ষমতা বলে ব্যাখ্যা করার জন্য যেখানে ধন ও দারিদ্র্যের বৈপরীত্য আর মূলগত নয়।

গণতন্ত্রের বিশ্লেষণ প্রসঙ্গে আরিস্টটল সমাজের সামাজিক গঠনের ওপর বিশদে আলোকপাত করেছেন। সমাজের শ্রেণী ও সামাজিক স্তরগুলিকে তিনি রাষ্ট্রের (শুধু গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রেরই নয়) পক্ষে আবশ্যক অঙ্গ-উপাদান বলে ধরেছেন।

বিশেষ করে নিম্নোক্ত শ্রেণী ও সম্প্রদায়কে তফাৎ করা হয়েছে: কর্ষক, কারুজীবী, বণিক, ভাড়াটে শ্রমিক, সম্পন্ন মানুষ, সামরিক লোক, বিচারক, কর্তৃপদাধিকারী। স্বাভাবিক চাহিদা পূরণের জন্য যে শ্রেণীরা শ্রমে লিপ্ত তারা হল রাষ্ট্রের 'দেহ' (প্লেটোনিক পরিভাষা অনুসারে 'প্রথম' রাষ্ট্র) আর রাষ্ট্রের 'আত্মা' হল সামরিক, বিচারক ও বিধান-মন্ত্রণায় ব্যাপৃত সম্প্রদায়েরা। আরিস্টটলের মতে, রাজনৈতিক প্রজ্ঞা প্রকাশ পায় এই শেষ সম্প্রদায়ের মধ্যে। যেমন এক-একজন লোকের ক্ষেত্রে, তেমনি সমাজের ক্ষেত্রেও 'আত্মা' তার 'দেহের' চেয়ে অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ।

এই অবস্থান থেকে আরিস্টটল এমনকি প্লেটোকে ভর্ৎসনাই করেছেন এইজন্য যে তাঁর মতে নাকি রাষ্ট্র গড়ে ওঠে জরুরি প্রয়োজন মেটাবার জন্য, সুন্দর অস্তিত্বের অনেক বেশি সমুচ্চ লক্ষ্যের জন্য নয় ('রাজনীতি', চার, ৩, ১২, ১২৯১এ ৬)। আরিস্টটল যদিও রাষ্ট্রের সামাজিক গঠনের প্রশ্ন নিয়ে বিচারবিবেচনা করেছেন প্লেটোর চেয়ে বেশি, তাহলেও নীতিগতভাবে তাঁর এ ভর্ৎসনা ভিত্তিহীন, কেননা প্লেটোর নির্মিতিতেও চাহিদা মেটানোর জন্য ক্রিয়াকলাপ রাষ্ট্রের আদর্শ প্রেরণার অধীন।

আসলে প্লেটোনিক 'রাষ্ট্র'এর 'প্রথম' রাষ্ট্র আর আরিস্টটলীয় 'রাজনীতি'র রাষ্ট্রের 'দেহ' চাহিদা মেটানোর জন্য শ্রমের সেই আবশ্যক ক্ষেত্রটার কথাই বলেছে যাকে রাজনৈতিক মতবাদের পরবর্তী ইতিহাসে (আঠারো-উনিশ শতকে) রাজনৈতিক রাষ্ট্র থেকে তফাৎ করে বলা হয়েছে 'নাগরিক সমাজ'। তবে এইটে মনে রাখা দরকার যে প্লেটো ও আরিস্টটল

জোর দিয়েছেন শ্রমের ওপর নয় (উৎপাদনশীল শ্রম তো দূরের কথা), সে শ্রমের বাহক — সামাজিক স্তর ও শ্রেণীর ওপর।

রাষ্ট্রের মৌল উপাদান হল ধনী ও দরিদ্ররা এবং 'এই উপাদানগুলির মধ্যে কোনো একটার ভারাধিক্য দ্বারা প্রতিষ্ঠিত হয় রাষ্ট্র ব্যবস্থার তদনুযায়ী রূপ' ('রাজনীতি', চার, ৩, ১৫, ১২৯১বি ৮)।

জনগণের কোনো কোনো স্তরকে নাগরিক অধিকার ও রাজনৈতিক ক্ষমতায় প্রবেশ দানের নিরিখ অনুসারে ক্ষমতার ক্ষেত্রে দরিদ্রদের ভারাধিক্যরূপ গণতন্ত্রেরও আবার কয়েকটি প্রকারভেদ আছে। পাঁচ ধরনের গণতন্ত্রের উল্লেখ করেছেন আরিস্টটল। প্রথম ধরনের গণতন্ত্রের বৈশিষ্ট্যসূচক পার্থক্য হল উচ্চতন ক্ষমতার ক্ষেত্রে ধনী ও দরিদ্রের সমতা। সবাই অবশ্য-অবশ্যই অংশ নেয় শাসনক্ষমতার ক্রিয়াকর্মে। দ্বিতীয় ধরনের গণতন্ত্রে শাসকপদের জন্য সামান্য সম্পত্তির শর্ত থাকে, অর্থাৎ, আরিস্টটলের মতে, সমস্ত স্বাধীন সাবালকই পূর্ণাধিকারী নাগরিক নয়। তৃতীয় ও চতুর্থ ধরনের গণতন্ত্র প্রসঙ্গে আরিস্টটল সেখানে আইন ও বিচারক-শাসনকর্তার আধিপত্যের কথা বলেছেন, কিন্তু এক-একজন ব্যক্তিকে নাগরিক অধিকার অর্পণের কোনো শর্তের উল্লেখ করেন নি।

পঞ্চম ধরনের গণতন্ত্রে উচ্চতন ক্ষমতা ধরে আইন নয়, ডেমোস বা গণমানব। আরিস্টটল এরূপ চরম গণতন্ত্রের প্রচণ্ড সমালোচক। এক্ষেত্রে নির্ধারক তাৎপর্য ধরে বাক্‌প্রাধান্য ('শ্রেষ্ঠ লোকেদের' পরিবর্তে) এবং গণসিদ্ধান্ত (আইনের স্থলে)।

ডেমোস হয়ে দাঁড়ায় স্বেচ্ছাচারী, আচরণ করে স্বৈরশাসকের মতো। ক্ষমতা থাকছে অনেকের হাতে, কিন্তু তা ভোগ করছে সবাই একত্রে, আলাদা আলাদা ভাবে প্রত্যেকে নয়। ডেমোসের সংকল্প চালিত করে বাক্‌প্রধানেরা। বিচারক-শাসকের ভূমিকা দাঁড়ায় শূন্যে। এই ধরনের গণতন্ত্রে স্বৈরশাসনের কথা মনে হয়, এই কথা বলে আরিস্টটল লিখেছেন: 'মনে হয় এরূপ গণতন্ত্রকে পুরোপুরি ন্যায়সঙ্গত ভর্ৎসনা করা সম্ভব এবং সোজাসুজি ঘোষণা করা চলে যে এটা রাষ্ট্র ব্যবস্থার কোনো রূপই নয়; যেখানে আইনের ক্ষমতা অবিদ্যমান, সেখানে কোনো ধরনের রাষ্ট্র ব্যবস্থার স্থানই নেই' ('রাজনীতি', চার, ৪, ৭, ১২৯২ এ ৩৯)।

'এথেন্সের পলিটিয়া' থেকে যা দেখা যায় (দশ, ২৭; পনর, ৪১), চূড়ান্ত গণতন্ত্র বলতে আরিস্টটল ধরেন, দৃষ্টান্তস্বরূপ পেরিকলাস ও তাঁর পরবর্তী গণতন্ত্রকে। স্বয়ং পেরিকলাসকে তিনি বলেছেন বাক্‌প্রধান।

গণতন্ত্রের সকল রূপের মধ্যে আরিস্টটল অনুমোদন করেন নরমপন্থী, সম্পত্তিনির্ভর গণতন্ত্র, যা ধনী ও দরিদ্রের মধ্যে আপোস ও বিধির আধিপত্যের ওপর প্রতিষ্ঠিত। এই থেকে তিনি সলোনের সংস্কারগুলির উচ্চ মূল্যায়ন করেছেন, এথেন্সে যিনি গণতন্ত্রের সূত্রপাত করেন। গণতন্ত্রের পরবর্তী প্রসারকে আরিস্টটল মনে করেন রাষ্ট্রের অবনতি ও নৈতিক দূষণ। সলোন এবং অতীত কালের শাসকদের ছাড়া তিনি সেরা রাজনৈতিক কর্মকর্তা হিশেবে নাম করেছেন নিকিয়াস, ফুকিডিডাস এবং ফেরামেনের ('এথেন্সের পলিটিয়া', চার-পাঁচ; আট, ২৮; পনর, ৪১)।

গোষ্ঠীতন্ত্রে ক্ষমতা ধরে ধনীরা। প্রথম দিককার গোষ্ঠীতন্ত্রে বিচারক-শাসকের পদপ্রাপ্তি এত উঁচু সম্পত্তিস্বত্বে শর্তবদ্ধ যে গরিব সংখ্যাগরিষ্ঠরা তা থেকে বঞ্চিত। অন্য ধরনের গোষ্ঠীতন্ত্রেও সম্পত্তি শর্ত খুব উঁচু, তদুপরি কর্তৃপদে নিয়োগ চলে অধিগ্রহণ মারফত। তৃতীয় ধরনে পিতার পদে উত্তরাধিকার থাকে পুত্রের। চতুর্থ ধরনে এ ছাড়াও আধিপত্য করে আইন নয়, শাসক-বিচারকেরা। আরিস্টটলের মতে, এই ধরনের গোষ্ঠীতন্ত্র স্বৈরশাসন ও চরম গণতন্ত্রের সদৃশ ('রাজনীতি', চার, ৫, ১, ১২৯২ এ ৩৯)।

রাষ্ট্রের সেরা রূপ হিশেবে পলিটিয়ায় গোষ্ঠীতন্ত্র ও গণতন্ত্রের সেরা দিকগুলি মিলিত, তবে তাদের ত্রুটি ও চূড়ান্তপনা থেকে তা মুক্ত। এই অর্থে সেটা এই দুইয়ের 'মধ্যবর্তী' এবং মিশ্রণ।

কার্যক্ষেত্রে পলিটিয়া একটা দুরর্জনীয় রাষ্ট্ররূপ, কেননা অধিকাংশ ক্ষেত্রে রাষ্ট্রে মাঝামাঝি ধরনের লোকেদের স্থান নগণ্য। সাধারণত প্রাধান্য লাভ করে হয় বড়ো সম্পত্তিমালিক, নয় সাধারণ লোকে, সুতরাং রাষ্ট্র ব্যবস্থাও প্রতিষ্ঠিত হয় বিজয়ী পক্ষের স্বার্থে — গোষ্ঠীতান্ত্রিক অথবা গণতান্ত্রিক। পলিটিয়া প্রতিষ্ঠার দুরূহতা বাড়ে, আরিস্টটলের মতে, আরো এইজন্য যে গ্রীসে দুটি রাষ্ট্র (এথেন্স ও স্পার্টা) নেতৃস্থানীয় হওয়ায় অন্যান্য পরাধীন গ্রীক রাষ্ট্রে তারা প্রচলন করে নিজেদের স্বার্থে হয় গোষ্ঠীতন্ত্র, নয় গণতন্ত্র। আরিস্টটল লিখেছেন: 'উল্লিখিত কারণগুলির জন্য 'মধ্যবর্তী' রাষ্ট্র হয় কখনোই দেখা যায় না, নয় দেখা গেলেও তা বিরল এবং অল্প কয়েকটি রাষ্ট্রেই। যারা কখনো শাসনের কর্ণধার ছিল, তাদের মধ্যে কেবল একজন স্বামীই 'মধ্যবর্তী' ব্যবস্থা প্রবর্তনের সাহস করেছে' ('রাজনীতি', চার, ৯, ১২, ১২৯৬ এ ১৬)।*

আরিস্টটলের পলিটিয়া মূলত শুধুই বাস্তবক্ষেত্রে বিরল কোনো একটা বিশেষ ধরনের রাষ্ট্ররূপ নয়; সেই সঙ্গে তা সাধারণভাবেই শাসনের রাজনৈতিক রূপের একটা তাত্ত্বিক নির্মিতি। এই দিক থেকে তা পরীক্ষামূলকরূপে বিদ্যমান রাষ্ট্ররূপের একটা মাপকাঠি এবং তার রাজনৈতিকতা বা অরাজনৈতিকতা (স্বেচ্ছাচারিতা, রাজনৈতিক ন্যায্যতার মানদণ্ড থেকে তার বিচ্যুতি) পরিমাপের নিরিখ।

আরিস্টটল পলিটিয়ার প্রকল্প করেছেন তাঁর নান্দনিক ও রাজনৈতিক মতবাদের মূল নীতিগুলির কথা মনে রেখে। পলিটিয়া হল 'মধ্যবর্তী' রাষ্ট্ররূপ আর 'মাঝামাঝি' উপাদানের আধিপত্য সেখানে সবকিছুতে: আচার-ব্যবহারে নরমপন্থা, সম্পত্তিতে মধ্যবিত্ততা, ক্ষমতায় মধ্য শ্রেণী। ''মাঝামাঝি' লোকেদের নিয়ে গঠিত রাষ্ট্রের থাকে সর্বশ্রেষ্ঠ রাষ্ট্র ব্যবস্থা' ('রাজনীতি', চার ৯, ৬, ১২৯৫ বি ১৮)। নাগরিকদের মাঝামাঝি, কিন্তু সচ্ছল সম্পত্তি থাকলে সেটা রাষ্ট্রের পরম কল্যাণ বলে আরিস্টটল মনে করেন।

আরিস্টটল মনে করেন, মাঝামাঝি উপাদান সংখ্যাবহুল হলে অধিবাসীদের যুধ্যমান দলে ভাগ হয়ে যাওয়ার বিপদ কেটে যাবে, দলগত কলহ-দ্বন্দ্ব কমবে।

আরিস্টটলের মতে, পলিটিয়ায় মাঝারি উপাদানের প্রাধান্য থাকা উচিত চরম উপাদানগুলির উপর, অন্তত্পক্ষে আলাদা আলাদা ভাবে তাদের প্রত্যেকটির চেয়ে তাকে হতে হবে শক্তিশালী। উচ্চতন ক্ষমতা থাকা চাই অল্পাংশের নয়, অধিকাংশের হাতে। স্বাধীন অধিবাসীদের সাধারণ সমষ্টিতে নির্দিষ্ট ব্যবস্থাটির পক্ষপাতীদের সংখ্যা হওয়া উচিত তার প্রতিপক্ষদের চেয়ে বেশি।

শুধু পলিটিয়াতে নয়, এমনকি গোষ্ঠীতন্ত্র ও গণতন্ত্রেও রাষ্ট্র ব্যবস্থার নির্দিষ্ট রূপটির অভ্যন্তরস্থ 'মাঝারি' উপাদান হবে বিধানদাতার বিচার্য।

আরিস্টটলের মতে, আইনবিষয়ক মন্ত্রণা সংস্থা, শাসন দপ্তর আর বিচারালয় — রাষ্ট্রের এই তিনটি মূল উপাদানের চালনব্যবস্থার গঠন ও প্রণালীর বিভিন্ন শর্তের উপযুক্ত সংযুক্তির ওপর নির্ভর করে নির্দিষ্ট পরিস্থিতিতে রাষ্ট্র ব্যবস্থার যথাসম্ভব শ্রেষ্ঠ সংগঠন। সমগ্রভাবে আরিস্টটল আইনবিষয়ক মন্ত্রণা সংস্থা ও শাসন দপ্তরগুলির মধ্যে এমন ভারসাম্যের পক্ষপাতী যাতে আইন জারি সমেত বহু মূল ক্ষেত্রে শাসন দপ্তরের থাকবে নির্ধারক সিদ্ধান্তের অধিকার, লোকসভা হবে কেবল পরামর্শমূলক।

শাসন দপ্তর ও বিচারালয়ের কাছ থেকে আরিস্টটল নির্দিষ্ট রাষ্ট্রটির

সঙ্গে তাদের আনুরূপ্য দাবি করেন, সেটা সম্ভব হতে পারে এগুলির গঠন ও ক্রিয়াকলাপের বিভিন্ন দিকের সাযুজ্য ও ভারসাম্যে (কর্তৃপদে নিয়োগের শর্ত, নির্বাচন এবং লটারি, বেতন ইত্যাদি)।

শেষ বিচারে আরিস্টটলের সামাজিক-রাজনৈতিক ভাবনা স্বাধীন অধিবাসীদের মধ্যে আধিপত্যকারী স্তরদের একটা সর্বাধিক পাকাপোক্ত, নির্দিষ্ট পরিস্থিতিতে প্রযোজ্য রাজনৈতিক শাসন প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে চালিত।

আরিস্টটল অনেক মন দিয়েছেন রাষ্ট্রীয় উপপ্লবের মতবাদে, প্রতিটি রাষ্ট্ররূপের অন্তর্নিহিত ধ্বংসাত্মক উপাদানগুলি এবং তাদের বিকল করার উপায় নিয়ে গবেষণায়। আরিস্টটলের 'রাজনীতি'র পঞ্চম গ্রন্থ, যাতে এই প্রসঙ্গ আলোচিত হয়েছে, তা শুধু প্রসঙ্গের দিক থেকে নয়, তা ব্যাখ্যার মূলকথার দিক দিয়েও বহু ব্যাপারে প্লেটোর 'রাষ্ট্র'এর অষ্টম গ্রন্থের সদৃশ।

বিক্ষোভ ও বিপ্লবের মূল কারণ আরিস্টটল দেখেছেন সাম্যের অভাবে। সাম্য লাভ হল বিদ্রোহের লক্ষ্য, বিপ্লব হল সমতার আপেক্ষিক চরিত্রের লঙ্ঘন ও রাজনৈতিক ন্যায্যতা নীতির বিকৃতির পরিণাম। এ ন্যায্যতা একক্ষেত্রে পরিমাণগত সাম্য, অন্য ক্ষেত্রে যোগ্যতা অনুসারে সাম্য পালনের দাবি করে।

বিপ্লবের সঙ্গে সঙ্গে আসে রাষ্ট্ররূপের তদনুযায়ী নীতি পরিবর্তন। এইসব নীতির প্রত্যেকটিই আপেক্ষিক দিক থেকে সঙ্গত, কিন্তু তাদের পরম করে তোলা ভুল। যেমন, গণতন্ত্র এই নীতির ওপর প্রতিষ্ঠিত যে আপেক্ষিক সমতা থেকেই আসে পরম সমতা, আবার গোষ্ঠীতন্ত্র এই নীতি থেকে এগোয় যে আপেক্ষিক অসাম্য পরম অসাম্যের কারণ। রাষ্ট্ররূপের উৎসবিন্দুতে এইরূপ ভুল থেকেই দেখা দেয় পরবর্তী অন্তর্দ্বন্দ্ব ও বিদ্রোহ। 'ভুল আদি নীতি থেকে পৌঁছনো যাবে কেবল কোনো না কোনো একটা খারাপ পরিণামে' ('রাজনীতি', পাঁচ, ১, ৮, ১৩০২ এ ৯)।

ন্যায্য ও অন্যায্য বিদ্রোহের মধ্যে তফাৎ করেছেন আরিস্টটল: বিদ্রোহটা ন্যায্য যদি তা ঘটায় অন্যান্যদের সঙ্গে অধিকার সাম্যের উদ্দেশ্যে স্বল্পাধিকারভোগী লোকেরা; বিদ্রোহ অন্যায় যদি বেশি অধিকার পাবার জন্য তা চালায় সমাধিকারী লোকেরা। এছাড়াও, তিনি বলাত্মক এবং অ-বলাত্মক রাষ্ট্রীয় উপপ্লবের মধ্যে প্রভেদ করেছেন।

বিভিন্ন রাষ্ট্ররূপের ভেতরকার ধ্বংসাত্মক উপাদানগুলির বিচার করে আরিস্টটল নির্দিষ্ট ব্যবস্থার সুস্থায়িত্বের জন্য বিভিন্ন ক্ষেত্রে প্রযোজ্য এক-একটা ব্যবস্থাধারার প্রস্তাব দিয়েছেন।

আরিস্টটল এই কথায় জোর দিয়েছেন: নিজেদের চরম প্রবণতাগুলি

জয় করতে পারলে গোষ্ঠীতন্ত্র ও গণতন্ত্র উভয়েরই সংগঠন চলার মতো।

তদনুযায়ী রাজনৈতিক রূপের প্রেরণায় রাষ্ট্রীয় লালনপালনের মতো পদ্ধতি বিদ্যমান ব্যবস্থার স্থিতিশীলতার লক্ষ্যে প্রযোজ্য। নাগরিক গড়ে তোলা ব্যক্তিগত উদ্যোগের ব্যাপার নয়, সেটা সর্বরাষ্ট্রীয় প্রযত্নের বিষয়। এই বক্তব্য যুক্তিসিদ্ধ করতে গিয়ে আরিস্টটল বলেছেন যে কথাটা হচ্ছে সাধারণ স্বার্থ ও রাষ্ট্রের একক লক্ষ্য নিয়ে, কেননা প্রত্যেকটি নাগরিক হল 'রাষ্ট্রের কণিকা' আর 'সমস্ত নাগরিক রাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত' ('রাজনীতি', আট, ১, ২, ১৩৩৭ এ ৪১)।

সুখী ও আনন্দময় জীবনের জন্য লোকেদের প্রয়াস থেকে দেখা দেয় বিভিন্ন ধরনের রাজনৈতিক জীবন। বিদ্যমান রাষ্ট্রগুলিতে কোনো না কোনো মাত্রায় এই আদর্শ রূপায়িত হয়, কিন্তু তা সম্পূর্ণ বাস্তবায়িত হতে হলে দরকার সর্বশ্রেষ্ঠ রাষ্ট্র ব্যবস্থা, 'বাঞ্ছনীয় সংগঠনের' রাষ্ট্র ('রাজনীতি', সাত, ৪, ১, ১৩২৬ এ ১৩)। শ্রেষ্ঠ রাষ্ট্রের প্রকল্প দানে আরিস্টটল তাঁর পূর্বসূরীদের (প্লেটো, ফালেই, ইপ্পোডাম প্রভৃতির) প্রয়াসেরই অনুবর্তন করেছেন, যাঁদের দৃষ্টিভঙ্গি তিনি প্রথমত সমালোচনা করেছিলেন।

শ্রেষ্ঠ রাষ্ট্রের সংগঠনের জন্য আরিস্টটল কতকগুলি শর্ত বিবেচনা করেছেন। তার অধিবাসীসংখ্যা হওয়া উচিত যথেষ্ট, কিন্তু সহজে নিরীক্ষেয়। নাগরিকদের হওয়া উচিত পরস্পর পরিচিত। আরিস্টটল যে আদর্শ রাষ্ট্রের কথা ভাবছেন তার ভূখণ্ড হওয়া উচিত একই ভাবে স্থলভাগ ও সাগর অভিমুখী। তাছাড়া, সে ভূখণ্ডে অনুচ্চ চাহিদা মেটানোর মতো প্রতুলতা থাকা চাই। আরিস্টটলের মতে, গ্রীক চরিত্রের অনুরূপ এলাডার প্রাকৃতিক ও ভৌগোলিক বৈশিষ্ট্যগুলি শ্রেষ্ঠ রাষ্ট্র গঠনে সহায়তা করে।

আরিস্টটল মনে করেন, সত্যকার রাজনৈতিক জীবন সম্ভব কেবল হেলেনিক জাতিসত্তাগুলির মধ্যে ('রাজনীতি', সাত, ৬, ১, ১৩২৭ বি ১৬)।

শ্রেষ্ঠ রাষ্ট্রে দাসেদের সংখ্যাবহুলতার কথা বলেছেন আরিস্টটল। শারীরিক শ্রমে লিপ্ত কারুজীবীরাও, স্বাধীন হলেও তাদের কোনো নাগরিক অধিকার নেই। 'নাবিক জনতাও' নাগরিকদের অন্তর্ভুক্ত নয়, তাঁর মতে রাষ্ট্র জীবনে তাদের অংশগ্রহণ কেবল চরম গণতন্ত্রেরই বৈশিষ্ট্য ('রাজনীতি', সাত, ৫, ৭, ১৩২৭ বি ১৫)। বণিকেরাও নাগরিক অধিকার থেকে বঞ্চিত। শ্রেষ্ঠ রাষ্ট্রের নাগরিকেরা কেবল যুদ্ধকর্ম, আইন মন্ত্রণা ও বিচারাদিতে লিপ্ত। এসব কাজে নাগরিকদের ক্রমান্বয় যোগদান হওয়া উচিত তাদের বয়স ও বিজ্ঞতা অনুযায়ী।

শ্রেষ্ঠ রাষ্ট্রের যে নাগরিকেরা দাস ও কারিগরদের শ্রম ভোগ করে তারা হল 'সমৃদ্ধ শ্রেণী' ('রাজনীতি', সাত, ৭, ৫, ১৩২৮ বি ১৭)। এদের মধ্যে থেকেই আসে যোদ্ধা, পুরোহিত ও বিচারক, যারা আইন ও সাধারণ স্বার্থের রক্ষক।

এটা অর্থপূর্ণ যে সামরিক শক্তিকে আরিস্টটল বলেছেন রাষ্ট্রের অপরিহার্য ধর্ম। তাঁর মতে, অস্ত্র 'রাষ্ট্রীয় গোষ্ঠীর অংশীদের প্রয়োজন যেমন রাষ্ট্রের অভ্যন্তরে অবাধ্যদের বিরুদ্ধে শাসনক্ষমতার কর্তৃত্ব বজায় রাখার জন্য, তেমনি বাইরে থেকে অন্যায় দাবি প্রতিহত করার জন্যও' ('রাজনীতি', সাত, ৭, ৪, ১৩২৮ বি ১৭)।

জমি দুই ভাগে বিভক্ত। একটা ভাগ থাকবে সারা রাষ্ট্রের সাধারণ পরিভোগে (তার ফল যাবে সিস্‌সিটিয়া বা সাধারণ ভোজন, ধর্মীয় প্রয়োজন ইত্যাদিতে), অন্য ভাগটা থাকবে নাগরিকদের ব্যক্তিগত মালিকানায় (তার উৎপন্ন দ্রব্য যাবে অন্যান্য নাগরিকদের সাধারণ পরিভোগে)। জমিতে দুই ধরনের সম্পত্তি অনুসারে রাষ্ট্রীয় ও ব্যক্তিগত দাসেদের মধ্যেও তফাৎ করা হয়েছে। শ্রমের পুরস্কার হিশেবে সমস্ত দাসকেই দেওয়া হচ্ছে ভবিষ্যতে মুক্তির গ্যারান্টি।

শ্রেষ্ঠ রাষ্ট্রের বিধানদাতার উচিত নাগরিকদের জন্য বিশ্রাম ও শান্তির ব্যবস্থা করা, কেননা 'যুদ্ধের পরম লক্ষ্য শান্তি, কর্মের পরম লক্ষ্য বিশ্রাম' ('রাজনীতি', সাত, ১৩, ১৬, ১৩৩৪ এ ১৯)।

এই অবস্থান থেকে আরিস্টটল স্পার্টা ও ক্রীটের ব্যবস্থার সমালোচনা করেছেন, সেখানে সবকিছুই বৈদেশিক প্রতাপ ও সামরিক সাফল্য অর্জনের লক্ষ্যে চালিত। তাঁর মতে, যুদ্ধকর্ম প্রয়োজন অন্য জাতিকে দাস করার জন্য নয়, সর্বাগ্রে নিজে দাসত্বে পতিত না হবার জন্য। যদিও সর্বত্রই দাস সংগৃহীত হয় যুদ্ধের মাধ্যমে, তাহলেও দাসপ্রথার উৎস থাকছে যুদ্ধের নীতিতে নয়, প্রকৃতির নিয়মে। 'প্রকৃতি প্রসূত দাসপ্রথাকে' সমর্থন করতে গিয়ে তিনি ঘটনার সুস্পষ্ট বিপরীতে লিখেছেন: 'অনিবার্যভাবেই স্বীকার করতে হয় যে একদল লোক সর্বত্রই দাস, অন্যদল কোথাও সেরূপ হয় না' ('রাজনীতি', এক ২, ১৮, ১২৫৫ এ ১৯)।

তাই যুদ্ধেও 'স্বেচ্ছাচারী ক্ষমতা' স্থাপনের চেষ্টা করা উচিত কেবল সেই লোকেদের ওপর যারা দাস হবার যোগ্য ('রাজনীতি', সাত, ১৩, ১৪, ১৩৩৪ এ ১৯)। যুদ্ধ, এইভাবে, দাসত্বের নতুন কোনো আইনী ভিত্তি না জুগিয়ে যারা আগে থেকেই দাস তাদের সংগ্রহ করার একটা উপায় মাত্র।

যুদ্ধ হল প্রকৃতিগতভাবে দাসেদের জন্য 'মৃগয়া' ('রাজনীতি', এক, ২, ২২, ১২৫৫ বি ২২)।

যারা হেলেনীয় জাতিভুক্ত নয়, তাদের অবজ্ঞা করেন আরিস্টটল, প্রকৃতিগতভাবে তারা দাস, রাজনৈতিক জীবন যাপনে অক্ষম। হেলেনীয় জাতিসত্তাকে মহিমান্বিত করে তিনি বলেন, এ জাতি 'সবার ওপর আধিপত্য করতে পারত যদি কেবল তারা ঐক্যবদ্ধ হত একটি রাষ্ট্র ব্যবস্থায়' ('রাজনীতি', সাত, ৬, ১, ১৩২৭ বি ১৬)। অবশ্য তাঁর নিজের আদর্শ রাষ্ট্রের প্রকল্পে সমস্ত হেলেনীয়দের এইরূপ ঐক্য, অথবা দাস করার উদ্দেশ্যে অন্য জাতিদের বিরুদ্ধে এই রাষ্ট্রের আগ্রাসনী রাজনীতির কোনো কথা নেই।

শান্তির কল্যাণময়তায় তিনি উচ্চ মূল্য দেন। যুদ্ধের লক্ষ্য শান্তি আরিস্টটলের আগে এ যুক্তি দেখা গেছে প্লেটোর মধ্যে এবং পরে হেগেল সমেত বহু লেখকই তা গ্রহণ করেছেন। 'যুদ্ধের নীতিটাকেই আইনের ধারণার বিরোধী বলে গণ্য করা চলে' ('রাজনীতি', এক, ২, ১৮, ১২৫৫ এ ১৯) — আরিস্টটলের এই বক্তব্য অতি প্রগতিশীল। পরবর্তী কালে যুদ্ধের সমালোচক ও 'চিরস্থায়ী শান্তির' পক্ষপাতীদের মধ্যে, বিশেষ করে কাণ্ট ও ফিখ্‌টের মধ্যে এ থিসিস বহুল প্রচার লাভ করে।

আরিস্টটলের মতে, আইন হল লোকেদের রাজনৈতিক আদানপ্রদানের নিরিখ। রাজনৈতিক সংগঠনরূপ রাষ্ট্রে বাস করার অর্থ আইন মেনে চলা। আইনে মূর্তিমান হয় রাজনৈতিক ন্যায় এবং তা লোকেদের মধ্যে রাজনৈতিক সম্পর্কের নিরিখের কাজ করে। 'ন্যায়ের ধারণাটা রাষ্ট্র বিষয়ক ধারণার সঙ্গে জড়িত, কেননা আইন ন্যায়ের নিরিখ হওয়ায় তা রাজনৈতিক আদানপ্রদান নিয়ামনের মাপকাঠি' ('রাজনীতি', এক, ১, ১২, ১২৫৩ এ ১৬)।

ন্যায়সঙ্গত আর আইনসঙ্গত অভিন্ন। সক্রেটিস ও প্লেটো থেকে আসা এই প্রস্তাবে একমত হয়ে আরিস্টটল ন্যায্যতা সম্পর্কে তাঁর নিজের বোধ অনুসারে তাকে মূর্তনির্দিষ্ট করেছেন। আইন নাগরিকদের সাধারণ উপকারে লাগে এবং এই দিক থেকে তা হল রাষ্ট্রীয় কল্যাণ। রাজনৈতিক ন্যায় হিশেবে আইন নিয়মিত করে কেবল স্বাধীন ও সমাধিকারী লোকেদের আদানপ্রদান এবং ক্ষমতাধর ও অধীনস্থদের রাজনৈতিক সম্পর্ক, প্রভু-দাসের স্বেচ্ছাচারী সম্পর্ক নয়।

আইনকে আরিস্টটল সাম্যের মতোই চিত্রিত করেছেন। কিন্তু ন্যায়নীতি

সম্পর্কে তাঁর ব্যাখ্যা অনুসারে এ সাম্য পরম নয়, আপেক্ষিক, কেননা লোকেরা যোগ্যতায় সমান নয়। যোগ্যতায় সেরা লোকেদের রাজনৈতিক সুবিধার দাবি তাই নির্ভর করছে আধিকারিক সুবিধার ওপরেও। 'আসলে, উচ্চ বংশের লোকে নিম্ন বংশের লোকের চেয়ে বেশি নাগরিক অধিকার রাখে' ('রাজনীতি', তিন, ৭, ৭, ১২৮৩ বি ৪)।

অসমানদের ক্ষেত্রে সাম্য, সমানদের ক্ষেত্রে অসাম্যের মতোই প্রকৃতিবিরুদ্ধ, তাতে রাজনৈতিক ন্যায় ও আইন নাকচ হয়।

রাজনৈতিক আইন হল অংশত স্বাভাবিক, অংশত আপেক্ষিক ('নীতিশাস্ত্র', পাঁচ, §১০)। আরিস্টটল তাকেই স্বাভাবিক বিধি বলেছেন যার তাৎপর্য সর্বত্র একই, কোনো একটা রাষ্ট্রের আইন ব্যবস্থায় তার স্বীকৃতি বা অস্বীকৃতির ওপর তা নির্ভর করে না। আপেক্ষিক আইনের মধ্যে পড়ে লোকেদের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত আইন ও সর্বজনীন সম্মতি।

এ ছাড়া, তিনি লিখিত আইন ও অলিখিত আইন (প্রথার) মধ্যে তফাৎ করেছেন।

আরিস্টটলের ধারণায় যেমন স্বাভাবিক, তেমনি আপেক্ষিক (মানবিক) আইন ন্যায্যতায় চিহ্নিত। এই ক্ষেত্রে সফিস্টদের বিরুদ্ধে সক্রেটিস ও প্লেটোর পুরনো বিতর্ক চালিয়ে গিয়ে তিনি মন্তব্য করেছেন যে ন্যায়ের ধারণাটা পরিবর্তনশীল হলেও তা পরিবর্তিত হয় কেবল নির্দিষ্ট একটা মাত্রায়। স্বাভাবিক বিধি হল আপেক্ষিক আইনের আদর্শ। 'যে আইন তৎরূপে প্রকৃতি থেকে আসছে না, যা কেবল মানবিক আইন, তা সর্বত্র একরূপ নয়, ঠিক যেমন রাষ্ট্র ব্যবস্থাও সর্বত্র একরূপ নয়, যদিও প্রকৃতি থেকে সেরা হয় কেবল একটাই' ('নীতিশাস্ত্র', পাঁচ, §১০)।

অধিকার ও আইনের মধ্যে তফাৎ করে আরিস্টটল মন্তব্য করেছেন যে 'প্রতিটি আইনই মূলত এক ধরনের অধিকার' ('রাজনীতি', এক, ২, ১৮, ১২৫৫ এ ১৯)। এতে কেবল সেই আইনের ন্যায্যতা সূচিত হয় যা তদুপযোগী অধিকারের উপর প্রতিষ্ঠিত। 'বলপূর্বক অধীনস্থ করার প্রয়াস অবশ্যই অধিকার কথাটার অর্থেরই বিরোধী' ('রাজনীতি', সাত, ২. ৭, ১৩২৪ বি ১১)।

আরিস্টটল জোর দিয়ে বলেছেন, মানুষের মধ্যে নয়, আইনেই রূপ লাভ করে রাষ্ট্রের উচ্চতন ক্ষমতা। মানুষের সাময়িক উন্মত্ততা থেকে আইন মুক্ত, তা হল 'সুষম প্রজ্ঞা' ('রাজনীতি', তিন, ১১, ৪, ১২৮৭ বি ৫)।

আইনপ্রণয়ন হল রাজনীতির অংশ, বিধানদাতার নৈপুণ্য হল এমন

আইন জারি করায় যা নির্দিষ্ট রাষ্ট্র ব্যবস্থাটার সঙ্গে খাপ খায়, রাষ্ট্র ব্যবস্থাকেই আইনের কবলিত কবায় নয়। এই দিক থেকে লোকের নয়, আইনের শাসনেই সূচিত হয় বিদ্যমান রাষ্ট্রের রূপ ও তার রাজনৈতিক শৃঙ্খলার স্থিতিশীলতা, 'কেননা শৃঙ্খলাই হল স্বকীয় ধরনের আইন' ('রাজনীতি', তিন, ১১, ৩, ১২৮৭ এ ৬)।

এ ক্ষেত্রে রাষ্ট্র ব্যবস্থার সঠিক রূপের সঙ্গে সঙ্গতিশীল আইনগুলি ন্যায়ের ওপর প্রতিষ্ঠিত; রাষ্ট্রের বেঠিক রূপের সঙ্গে যে আইন খাপ খায় তা অন্যায্য।

যেমন রাষ্ট্রের বেঠিক রূপ, তেমনি অন্যায্য আইনের সমালোচনা করলেও আরিস্টটল স্বীকার করেন তাদের আইনসঙ্গত শক্তি। 'সমস্ত রূপের রাষ্ট্র ব্যবস্থার যা ধর্ম, অধিকাংশের সিদ্ধান্তও উচ্চতন ক্ষমতা ধরে: রাষ্ট্রশাসনে — তা সে গোষ্ঠীতান্ত্রিক, অভিজাততান্ত্রিক, গণতান্ত্রিক যাই হোক না কেন — যারা অংশ নিচ্ছে, তাদের অধিকাংশ যে সিদ্ধান্ত নিচ্ছে, তা আইনসঙ্গত শক্তি ধরে বলে শ্রদ্ধেয়' ('রাজনীতি', চার, ৬, ৪, ১২৯৩ বি ৪০ — ১২৯৪ এ ৩১)। আইনের মাধ্যমে শাসন, সমস্ত ধরনের আইনের (তা সে অন্যায় হলেও) ব্যবহার হল সমস্ত রাষ্ট্ররূপের ক্ষেত্রে আদানপ্রদানের সাধারণ রাজনৈতিক উপাদান।

আইন একটা সাধারণ পরিমাপক, তবে এক-একজন লোকের মতো তাও জীবনের সম্ভবপর সমস্ত মূর্ত পরিস্থিতির হিসাব করে উঠতে পারে না, কিন্তু সাধারণ চরিত্রের এই অনির্দিষ্টতা সত্ত্বেও আইন হল রাজনৈতিক সম্পর্কের অপরিহার্য নিয়ন্ত্রক। আংশিক কোনো ঘটনার ক্ষেত্রে যখন আইনের সাধারণ ধারা খাটছে না, তখন ত্রুটির সংশোধন করা, বিধানদাতা যে ফাঁকটা রেখে গেছে তা পূরণ করে নেওয়া প্রয়োজন।

আইনের সাধারণ চরিত্রের নেতিবাচক দিকগুলির এইরূপ অপনোদনকে আরিস্টটল বলেছেন সত্য। 'সত্যের চরিত্র এইরূপ: নিজের সমাজধর্মিতার ফলে আইন যেসব ক্ষেত্রে অসন্তোষজনক, সেসব ক্ষেত্রে তা সংশোধনই এই সত্যের কাজ' ('নীতিশাস্ত্র', পাঁচ, §১৪)। সত্যও ন্যায়পরায়ণ, তবে আইনের আক্ষরিক অর্থে নয়, খোদ বিধানদাতার দিক থেকে। নিজের পক্ষেই আইনসঙ্গত অধিকার থাকলেও সত্যনিষ্ঠ লোক প্রতিবেশীর ক্ষতি করে আইনের অক্ষরগুলোকে আঁকড়ে থাকে না, আইন সে প্রয়োগ করে স্বাধীনভাবে, এ ঘটনাটা জানা থাকলে স্বয়ং বিধানদাতা যেভাবে চলত।

আইন সমস্ত কিছুকে আলিঙ্গন করতে পারে না, কেননা এমন জিনিস

আছে যেখানে আইন খাটে না (তাদের স্বাতন্ত্র্য, আপাতিকতা, পরিবর্তনশীলতা, বিরলতা ইত্যাদির দরুন), যার জন্য পৃথক নির্দেশ প্রয়োজন, এই ব্যতিরেক করেও আরিস্টটল লোকেদের সামাজিক, রাজনৈতিক ও ব্যক্তিগত জীবনের সমস্ত মূল দিকগুলির আইনানুগ নিয়ন্ত্রণের পক্ষপাতী। এদিক দিয়ে তিনি 'আইনপন্থী'। তিনি মন্তব্য করেছেন: 'আইন যে নির্দেশ দেয় না, তা সে নিষিদ্ধ করে' ('নীতিশাস্ত্র', পাঁচ, §১৫)। নীতির বৈপরীত্যের আলোয় ('যা নিষিদ্ধ নয়, তা সবই অনুমোদনীয়') আরিস্টটল হয়ে দাঁড়ান আইনের মর্মার্থের ব্যাপক ব্যাখ্যার পক্ষপাতী (যা অনুমোদিত নয়, তা সবই নিষিদ্ধ)।

আরিস্টটলের কাছে ক্ষমতাধর দলিল হিশেবে আইনের পার্থক্যসূচক বৈশিষ্ট্য হল তার বাধ্যকরণ শক্তি ('নীতিশাস্ত্র', দশ, §১০)। তবে তিনি এই কথায় জোর দেন যে সবচেয়ে হিতকর আইনেও কোনো উপকার হবে না যদি তদুপযোগী রাষ্ট্র ব্যবস্থা ও বিধানের প্রেরণায় শিক্ষিত না করা হয় অধিবাসীদের।

*

পরবর্তী সমস্ত দার্শনিক ও রাজনৈতিক-আইনী ভাবনাচিন্তার ওপর আরিস্টটলের প্রভাব বিপুল। পুরাকাল, মধ্যযুগ এবং আধুনিক সময়ের রাজনৈতিক মতবাদের ইতিহাসে এমন কোনো বড়ো দরের মনীষী নেই যিনি আরিস্টটলের সৃজনশীল উত্তরাধিকার থেকে দূরে থেকেছেন, কেউই তাঁর সঙ্গে নিজের প্রত্যক্ষ অথবা পরোক্ষ সম্পর্ক সুনির্ধারিত না করে পারেন নি। প্লেটোর প্রভাব সম্পর্কে আগে যা বলা হয়েছে তার বহু কিছুই আরিস্টটলের বিশ্ব-ঐতিহাসিক প্রভাব সম্পর্কেও প্রযোজ্য।

গুরু ও শিষ্যের মধ্যে বিতর্ক থাকলেও, যা অবশ্য সর্বদা খুব নীতিগত ও প্রত্যয়জনক নয়, তাঁদের রাজনৈতিক-আইনী দৃষ্টিভঙ্গি বহু মৌলিক দিক থেকে অভিন্ন বা বস্তুত কাছাকাছি। অন্তত‌পক্ষে দার্শনিক-আইনী ও রাজনৈতিক সমস্যা নিয়ে পরবর্তী গবেষকদের কাছে প্লেটো-আরিস্টটল মতভেদটা সামান্য বলে মনে হয়েছে, যদিও আরিস্টটল নিজে তা মনে করেন নি। তাঁদের দৃষ্টিভঙ্গিকে এ'রা ধরেছেন একই তাত্ত্বিক সমষ্টি হিশেবে, যাতে প্রকাশ পেয়েছে গ্রীক রাজনৈতিক ধ্যানধারণার চিরায়ত শিখর।*

আরিস্টটলের প্রভাব অনুভূত হয় তাঁর জীবদ্দশাতেই, বিশেষ করে সেটা প্লেটোর আকাদেমি এবং নিজের লিকেইতে তাঁর অধ্যাপনা, মেসিডোনিয়ার রাজদরবার, দিগ্বিজয়ী আলেকজান্ডার এবং এথেন্সে তাঁর শাসন-প্রতিভূ আণ্টিপাটরের সঙ্গে যোগাযোগের কল্যাণে। আরিস্টটলের বহু প্রকাশনারও একটা ভূমিকা ছিল, যার মূল অংশটা উত্তরপুরুষদের কাছে পোঁছয় নি।

আরিস্টটলের মৃত্যুর কিছু পরেই এথেন্সে তাঁর শিষ্য ফালেরের দিমিত্রি শাসনের সময় নরমপন্থী রাজনৈতিক শাসন বিষয়ে আরিস্টটলীয় মতবাদের কতকগুলি প্রস্তাব কার্যকৃত হয়।

আরিস্টটলের রাজনৈতিক মতবাদ তাত্ত্বিক দিক দিয়ে বিকশিত করেন তাঁর প্রতিষ্ঠিত আশ্রমের ডিকেয়ার্কাস এবং থিয়োফ্রাস্টাসের মতো প্রভাবশীল পেরিপাথেটিকরা (ভ্রাম্যমাণেরা)। তাঁরা বিশেষ মন দিয়েছিলেন নির্দিষ্ট পরিস্থিতিতে শ্রেষ্ঠ রাষ্ট্র ব্যবস্থা (থিয়োফ্রাস্টাস) এবং মিশ্র শাসনের (ডিকেয়ার্কাস) সমস্যায়।

আরিস্টটলের রাজনৈতিক মতবাদের প্রভাব পড়ে পোলিবিয়াস ও সিসেরোর ওপর, পরবর্তী কালে তাঁরাও আবার আরিস্টটলের কতকগুলি প্রস্তাবনার প্রচারে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা নেন। রাষ্ট্ররূপ এবং তাদের পালা বদল বিষয়ে পোলিবিয়াসের মতবাদ প্লেটো ও আরিস্টটলের তদনুরূপ দৃষ্টিভঙ্গির জনপ্রিয়তায় সহায়তা করে, তিনি নিজেও ছিলেন সে দৃষ্টিভঙ্গির অনুগামী।

আরিস্টটলের রচনাবলিতে উচ্চ মূল্য আরোপ করে, রাষ্ট্রের মিশ্র রূপের ন্যায্যতা, প্রাজ্ঞ মূলনীতি ও স্বাভাবিক বিধির সঙ্গে আইনের সামঞ্জস্য, আইনসঙ্গত ও ন্যায়সঙ্গতের অভিন্নতা এবং অবস্থার সঙ্গে তাদের সাধারণ সঙ্গতি বিষয়ে আরিস্টটলের অনেক প্রতিপাদ্যের সঙ্গেই সিসেরো একমত ছিলেন। রাজনৈতিক অন্তর্যুদ্ধের বিরুদ্ধে প্লেটো ও আরিস্টটলের আক্রমণও সিসেরোর কাছে অপ্রীতিকর নয়।

স্বাভাবিক বিধি ও বলবৎ করা আইনের সহসম্পর্ক, রাজনৈতিক জীবনে আইনের ভূমিকা, রাষ্ট্রে শ্রেষ্ঠ নৈতিক লক্ষ্য রূপায়ণ সম্পর্কে আরিস্টটলের ধারণা বহুলাংশে গ্রহণ করে স্টোইক (সুখেদুঃখে ঔদাসীন্য) মতবাদের বহু

প্রতিনিধি, যদিও তাদের বিশ্বজাগতিক ভাবাদর্শ অনুযায়ী কিছুটা রূপান্তরিত আকারে।

আরিস্টটলের মতবাদের বহু প্রস্তাব অংশত স্টোইকদের মারফত, অংশত সরাসরি অভিযোজিত হয়েছে খ্রিস্টীয় রাজনৈতিক মতবাদে। প্লেটো ও আরিস্টটল অনুসরণে রাজতন্ত্র ও স্বৈরশাসনের মধ্যে পার্থক্য করেছেন অগাস্টিন, আইনে সীমাবদ্ধ সত্যকার শাসনের কথা তিনি বলেছেন।

ত্রয়োদশ শতকে ভিলহেলম ফন মেরবেকে কর্তৃক লাতিন ভাষায় আরিস্টটলের 'রাজনীতি' অনূদিত হওয়ার পর বইটি বহু টীকাভাষ্য (টমাস আকুইনাস, মহান আলবার্ট ইত্যাদির) লেখা হয়। চতুর্দশ শতকে ফরাসি ভাষায় তা অনুবাদ করে টীকা লেখেন নিকোলাস দ্য ওরেজম আর পঞ্চদশ শতকে ইতালিতে গ্রীক থেকে লাতিনে 'রাজনীতি'র প্রথম অনুবাদ করেন লিওনার্দো ওরেতিনো। ১৪৯৮ সালে বইটির ভেনিসীয় সংস্করণ বেরয় ছাপা হরফে।

টমাস আকুইনাস এবং তৎকালীন অন্যান্য ভাষ্যকাররা আরিস্টটলকে বলেছেন 'দার্শনিক'। সে হিশেবে তাঁর প্রতিষ্ঠা ছিল অত্যন্ত উঁচু।

রাষ্ট্ররূপ সম্পর্কে আরিস্টটলীয় মতবাদ, বিশেষ করে আইন সম্পর্কে তাঁর বক্তব্য, রাজতন্ত্র ও স্বৈরশাসনের বৈপরীত্য ইত্যাদি বিষয়ে তাঁর থিসিসের সঙ্গে টমাস আকুইনাস ছিলেন একমত। 'রাজতন্ত্র প্রসঙ্গে' গ্রন্থে নিজের বিশ্বরাজতান্ত্রিক আদর্শ প্রতিপাদনের জন্য দান্তে আরিস্টটলের অনেক প্রস্তাব ব্যবহার করেছেন। দৃষ্টান্তস্বরূপ, সত্যকার ও ভুয়া রাজতন্ত্রের (স্বৈরশাসনের) মধ্যে পার্থক্য, সত্যকার শাসনে সাঁচ্চা স্বাধীনতার রূপায়ণের কথা বলতে গিয়ে তিনি 'দার্শনিকের' প্রামাণিকতার নজির দিয়েছেন।

যেমন রাষ্ট্রের উপাদানগুলি (পরিবার, বসতি, নগর), তেমনি সমগ্রভাবে গোটা রাষ্ট্রপাটই, দান্তের মতে, স্বাভাবিকভাবে প্রাকৃতিক কারণপ্রসূত। কিন্তু এ ছাড়াও সমগ্র মানবজাতিকে প্রকৃতি দিয়েছে আরো বড়ো একটা ঐক্য, যা, তাঁর মতে, বিশ্ব রাজতন্ত্রের প্রাকৃতিক (স্বাভাবিক আইনী) ভিত্তি। রাজার ক্ষমতাধীনে সঠিকভাবে সংগঠিত রাষ্ট্রিক ঐক্য সমূচ্চ মানবিক সমাজের ('humana civilitas') স্বাভাবিক মূলনীতি রূপায়ণের লক্ষ্যে চালিত, যা আরিস্টটলের পলিটিয়াতে প্রভাবিত*।

আরিস্টটলীয় মতবাদের একাধিক প্রস্তাব (রাষ্ট্রের সামাজিক গঠন, রাজনৈতিক জীবনে অধিবাসীদের বিভিন্ন স্তরের স্থান ও ভূমিকা, আইনের ভূমিকা ইত্যাদি) গ্রহণ করে তাকে বিশেষ ধরণে পরিবর্তিত করেছেন পাদুয়ার মার্সিলিয়াস*। আরিস্টটলকে উদ্ধৃত করে তিনি বিধানিক ক্ষমতায় লোকেদের অধিকারকে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। এ. বার্কের বলেছেন, জনগণের প্রাথমিক সার্বভৌমত্বের মতবাদ পাদুয়ার মার্সিলিয়াস সূত্রবদ্ধ করেছেন 'রাজনীতি' গ্রন্থের যুক্তি দিয়ে; এতে করে আরিস্টটলের যুক্তি কাজে লেগেছে রুসো ভাবধারার পূর্ববর্তী সিদ্ধান্তগুলিতে, অবশ্য নতুন এক পরিবেশে এবং ভিন্ন এক কাঠামোয়।**

'রাজনীতি' গ্রন্থের পুরনো বিষয়বস্তুকে নতুন যে মোড় দেবার প্রয়াসে দান্তে ও পাদুয়ার মার্সিলিয়াস চিহ্নিত, নিকোলো মাকিয়াভেলি তাকে সূত্রবদ্ধ করেছেন সে সময়ের পক্ষে বৈশিষ্ট্যসূচক, রাজনৈতিক মতবাদকে নৈতিকতা থেকে মুক্ত করায়। রাজনীতি, রাষ্ট্র ও আইন সম্পর্কে নতুন কথা বলতে গিয়ে মাকিয়াভেলি তাঁর বিবেচ্য সমস্যাগুলির ওপর আলোকপাতে সৃজনশীলভাবে কাজে লাগিয়ে গেছেন তাঁর পূর্বসূরীদের (বিশেষ করে আরিস্টটলের) ঐতিহ্য।

আরিস্টটলের 'রাজনীতি' যদিও তাঁর 'নীতিশাস্ত্র' থেকে আলাদা একটা রচনা বলে গণ্য, তাহলেও, আরিস্টটলের মতে, নৈতিকতা হল রাজনীতির একটা অংশ, এ রাজনীতিকে তিনি এক-একটা নৈতিকভিত্তির ওপর নির্মিত বলে দেখেছেন। আরিস্টটলকে রাজনীতিবিদ্যার প্রতিষ্ঠাতা, 'জনক' বলে অভিহিত করা হয়ে থাকে সেটা এই অর্থে সত্য যে তিনি প্লেটোর রাজনৈতিক দর্শনের ওপর দাঁড়িয়ে প্রথম সম্পর্কাদির এই নির্দিষ্ট ক্ষেত্রটার বিশেষ বৈজ্ঞানিক গবেষণাকে আলাদা করে তোলেন রাজনীতির একটা স্বাধীন বিজ্ঞান হিশেবে। তবে আরিস্টটল যেটাকে রাজনীতির বিজ্ঞান ভেবেছিলেন, সেটা আসলে একটা অনেক প্রশস্ত, অঙ্গপ্রত্যঙ্গে অবিভক্ত একটা জটিল

সমাহার, রাজনীতি ছাড়াও যার অন্তর্গত ছিল অন্ততপক্ষে নীতিশাস্ত্র ও অর্থনীতি।

আগেকার সামূহিক বৈজ্ঞানিক রচনাগুলির ভেদাভেদ নির্ণয়ের যে প্রবণতা আধুনিক কালের বৈশিষ্ট্য, সে প্রসঙ্গে, দৃষ্টান্তস্বরূপ, পূর্বোল্লিখিত নিকোলাস ওরেজমের অর্থনীতিবিষয়ক রচনাটি উল্লেখযোগ্য। তাতে তিনি আরিস্টটলের 'রাজনীতি' গ্রন্থের নিছক অর্থনৈতিক অংশটায় মনোনিবেশ করেছেন। অন্য দিকে মাকিয়াভেলি আবার আরিস্টটলীয় মতবাদের বিশেষরূপে রাজনৈতিক দিকটাতেই মন দিয়েছিলেন এবং তাঁর আগ্রহের কেন্দ্রবিন্দু যে ছিল রাষ্ট্রে উপপ্লব, অন্তর্যুদ্ধের রূপ, উদ্দেশ্য ও উপলক্ষের পরিবর্তন, অর্থাৎ রাজনৈতিক জীবনের গতিরুদ্ধতা বিষয়ে আরিস্টটলীয় ব্যাখ্যা, সেটা অকারণে নয়।

রাজনৈতিক সম্পর্কের অভ্যন্তরীণ কার্যকারণ ধরার চেষ্টায় আরিস্টটল ও অন্যান্য প্রাচীন লেখকদের অনুসরণে মাকিয়াভেলি লোকেদের রীতিনীতি এবং তদুপযোগী তাদের আদানপ্রদানের রূপ নির্ধারণে প্রাকৃতিক-আবহিক ব্যাপারগুলির ভূমিকা, সম্পত্তি, ঐশ্বর্য ও দারিদ্র্যের সামাজিক-রাজনৈতিক তাৎপর্য, রাষ্ট্রপাট গড়ে ওঠার স্বাভাবিক প্রকৃতি ইত্যাদিতে মন দিয়েছেন। রাজনীতি নিয়ে আরিস্টটলীয় মতবাদের ঐহিক, 'প্রাকৃতিক-মানবিক' ধারাটি গ্রহণ করে তাকে ধর্মতত্ত্ববিরোধিতার প্রেরণায় আরো এগিয়ে নিয়ে যান।

ব্যবহারিক রাজনীতিতে আগ্রহ ছিল আরিস্টটলের রাজনৈতিক বিজ্ঞানের প্রকৃতিগত। একে তিনি মনে করতেন ব্যবহারিক বিদ্যা। কিন্তু রাজনীতির ব্যবহারটাকেই তিনি দেখতেন আদর্শান্বিত রূপে, নৈতিক দিক থেকে সীমিত কাঠামোর মধ্যে। তাঁর অভিজ্ঞতাবাদ ও বাস্তববাদ ছিল অখণ্ড একটা আদর্শ-নৈতিক মডেলের বিভিন্ন দিকের সঙ্গে জড়িত ও তার অধীন, যার সাহায্যে তিনি মানবিক সম্পর্কের জগৎটাকে উপলব্ধি ও নির্মাণ করতেন। ব্যবহারিক-রাজনৈতিক ব্যাপারস্যাপার সম্পর্কে মাকিয়াভেলির দৃষ্টিভঙ্গি ছিল এই ধরনের আদর্শ-নৈতিক 'বাধা' ও 'কুসংস্কার' থেকে মুক্ত। এইটেই হল আরিস্টটল থেকে তাঁর রাজনীতি সম্পর্কে মতবাদের নীতিগত (তাত্ত্বিক, জ্ঞানতাত্ত্বিক দিক থেকে) পার্থক্য।

জান বদেনও রাজনীতি সম্পর্কে আরিস্টটলীয় মতবাদের 'ঐহিক' দিকটা গ্রহণ করে তাকে বিকশিত করেন। প্রাকৃতিক-ভৌগোলিক কারিকা, রাষ্ট্রীয় উপপ্লবে সম্পত্তিগত অসাম্যের ভূমিকা, অন্যান্য ধরনের ক্ষমতার তুলনায় রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার বৈশিষ্ট্য, স্বৈরশাসন থেকে রাজতন্ত্রের পার্থক্য ইত্যাদির

বিশ্লেষণে তিনি বহু দিক থেকে আরিস্টটলকে অনুসরণ করেছেন। প্রসঙ্গত, এই শেষ ব্যাপারটায় মনার্কোমাখদের (১৬ শতক) ওপরও আরিস্টটলের প্রভাব লক্ষণীয়।

আরিস্টটলীয় মতবাদের কতকগুলি প্রস্তাব (বিশেষত, ভৌগোলিক ও আবহমূলক কারিকার ভূমিকা, রাষ্ট্রের রূপ, তাদের নীতি ও পরিবর্তন, নির্দিষ্ট রাষ্ট্রটির আইন প্রণয়ন ও প্রতিষ্ঠানাদির মধ্যে সঙ্গতি ইত্যাদি) বিকশিত করেছেন শ. ল. মঁতেস্ক্যও।

আরিস্টটলের এবং সাধারণভাবে প্রাচীন রাজনৈতিক ধ্যানধারণার প্রতি মূলত নতুন একটি দৃষ্টিভঙ্গি রুসো ও হেগেলের নামের সঙ্গে জড়িত।

রাজনীতিবিদ্যা সম্পর্কে আরিস্টটলের সমস্ত ধারণা যেমন শাসন ও ক্ষমতা চালানোর রাজনৈতিক ও স্বৈরতান্ত্রিক নীতির পার্থক্য ও বৈপরীত্যের ওপর গড়ে উঠেছে, রুসোর ক্ষেত্রেও তেমনি সামাজিক চুক্তির ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত রাষ্ট্র হল একটা রাজনৈতিক, নাগরিক সত্তা, যা তার বিপরীত মেরু ও বিকল্প — স্বৈরতান্ত্রিক শাসন থেকে একেবারে পৃথক। আরিস্টটলের রাজনৈতিক গোষ্ঠীর মতো রুসোর সামাজিক চুক্তির ভিত্তিতে রাষ্ট্রও হয়ে দাঁড়ায় একটা আদর্শ নির্মাণ আর স্বৈরতান্ত্রিক রূপের শাসন, উভয় লেখকই যার একইরকম তীব্র সমালোচনা করেছেন, তা হল একটা অরাষ্ট্রিক, অরাজনৈতিক অবস্থা।

প্লেটো-আরিস্টটলীয় ধারণার আদলেই রুসো সামগ্রিক রাষ্ট্র (রাজনৈতিক দেহসত্তা) এবং তার অঙ্গ-উপাদানের (এক-একজন সদস্য, নাগরিক) মধ্যে সহসম্পর্কের প্রশ্নটি বিচার করেছেন। তদুপরি, গোটা দেহসত্তা তার আলাদা আলাদা অঙ্গের চেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ, দেহসত্তা তার অঙ্গ-উপাদানের ক্ষতি করবে না, ইত্যাদি ধরনের যুক্তিরও পুনরাবৃত্তি করা হয়েছে। সামগ্রিক রাজনৈতিক সত্তার এই ব্যক্তি-উর্ধ্ব বোধকে রুসো নিবদ্ধ করেছেন এই চিরায়ত সূত্রে যে সকলের ইচ্ছা আর সামগ্রিক ইচ্ছা এক নয়। সামাজিক চুক্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত রাষ্ট্রে সামগ্রিক ইচ্ছা সেই লক্ষ্য সাধনে চালিত যা প্লেটো ও আরিস্টটল সঠিক রূপের রাষ্ট্রের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য বলে মনে করেছেন, অর্থাৎ সাধারণ কল্যাণ। লক্ষণীয়, যেমন রাজনীতির প্লেটো-আরিস্টটলীয় ভাষ্যে সাধারণ কল্যাণ লাভ, তেমনি রুসোর সামগ্রিক ইচ্ছা গঠন ও চালনার মাধ্যমে সমরূপ লক্ষ্যার্জন — দুইয়েরই ঐকান্তিক দাবি জনগণের মধ্যে দলাদলির উৎসাদন, অন্তর্দ্বন্দ্ব ও দ্বন্দ্বের অবসান।

প্রাচীন রাজনৈতিক ধ্যানধারণার প্রতি (সর্বাগ্রে প্লেটো-আরিস্টটলীয়)

হেগেলের মনোভাব গড়ে উঠেছে একটা মৌলিক দিক থেকে রুসোর মধ্যস্থতায়: সবার ইচ্ছা থেকে সামগ্রিক ইচ্ছার পার্থক্যটা তিনি নিয়েছেন রুসোর কাছ থেকে। হেগেলের ব্যাখ্যায় সামগ্রিক ইচ্ছা হল আধুনিক রাষ্ট্রের নীতি। প্লেটো ও আরিস্টটলের মতো হেগেলের কাছেও রাষ্ট্র হল একটা স্বয়ংসম্পূর্ণ পরম উদ্দেশ্য, জনগণের রাজনৈতিকভাবে সংগঠিত জীবনের নৈতিক অখণ্ডতা। রাষ্ট্রকে একটা নৈতিক সমগ্র হিশেবে দেখার হেগেলীয় বোধ রাজনৈতিক সমগ্রের নীতিশাস্ত্রীয় ভিত্তি, নগর-রাষ্ট্রের জীবন ও আদানপ্রদানের নৈতিক চরিত্র সম্পর্কে প্লেটো-আরিস্টটলীয় বক্তব্যের সমতুল্য।

সমগ্র রাষ্ট্র এবং তার অংশের মধ্যে সহসম্পর্কের বর্ণনাতেও হেগেল প্লেটো ও আরিস্টটলের আঙ্গিক ধারণা কাজে লাগিয়েছেন এবং সমগ্রের অঙ্গগুলির তুলনায় 'রাষ্ট্র সত্যিই বলতে কি প্রথম', — আরিস্টটলের এই ধারণারই উপযুক্ত রূপান্তর সহ পুনরাবৃত্তি করেছেন।*

প্লেটো ও আরিস্টটলের রাজনৈতিক-আইনী ধারণার ঐতিহাসিকভাবে শর্তসাপেক্ষ সীমাবদ্ধতার উল্লেখ করে হেগেল এই কথায় জোর দিয়েছেন যে তাঁদের নৈতিকতার নির্মিতিতে নিজেদের আত্মমুখী অধিকার ও স্বাধীনতায় ব্যক্তি নৈতিকভাবে স্বায়ত্তশাসিত সত্তা বলে স্বীকৃত নয়। আত্মমুখী স্বাধীনতার এই নীতিটির উদ্ভব পরে, হেগেলের মতে, তা চূড়ান্তরূপে প্রবর্তিত হয় খ্রিস্টীয় ধর্মের কল্যাণে, যা মানুষের আত্মমূল্য ও সমস্ত লোকের সমতার কথা বলেছে। ওদিকে গ্রীকরা ছিল, হেগেল মনে করেন, আচারনিষ্ঠ লোক, কিন্তু নৈতিক নয়। ব্যক্তির নৈতিক স্বাধীনতা সম্পর্কে কোনো বিকশিত ধারণা তাদের ছিল না।

রুসো ও হেগেল এইভাবে নিজের নিজের ধরনে ও বিভিন্ন ধারায় প্লেটো-আরিস্টটলীয় রাজনীতিবিদ্যার নীতিশাস্ত্রীয় দিকটার পুনরুদ্ধার করে তাকে বিকশিত করেন যা বর্জন করেছিলেন মাকিয়াভেলি। তিনি তাঁর বাস্তব-রাজনৈতিক প্রস্তাবনা ও দৃষ্টিভঙ্গিতে ঝুঁকেছিলেন সফিস্টদের দিকে এবং রাজনীতিতে প্রতিষ্ঠিত করেন অনৈতিকতা।

রাজনীতি বিষয়ে আরিস্টটলীয় মতবাদের সঙ্গে কাণ্টের যোগসূত্রটা চিত্তাকর্ষক। কাণ্ট এগিয়েছেন তত্ত্ব ও প্রয়োগ, এবং তদনুযায়ী নৈতিকতা ও রাজনীতির মধ্যে কার্যত বিদ্যমান ছেদ থেকে। তবে, কাণ্টের মতে, এই

দুই বিপরীত ক্ষেত্রের মধ্যে টান-টান সম্পর্ক আছে। নীতিগতভাবে তিনি স্বীকার করেন যে রাজনীতিতে নৈতিকতার প্রেরণা কার্যকরী করা সম্ভব আর এই কার্যকরণের দাবিকে তিনি তুলে দেন পরম অনুজ্ঞার কোঠায়। ব্যবহারিক-রাজনীতিকের বিরুদ্ধে নৈতিক-রাজনীতিকের অবস্থানে দাঁড়িয়ে কাণ্ট যে যুক্তি দেন তা সফিস্টদের বিরুদ্ধে প্লেটো-আরিস্টটলীয় যুক্তির সমরূপ।

বুর্জোয়া লেখকেরা (রেম, পেলমান প্রভৃতি) আরিস্টটলের রাজনৈতিক মতবাদকে স্বকালের জরুরি সমস্যাদির কাছাকাছি আনার উদ্দেশ্যে তাঁর কতকগুলি প্রস্তাবকে আধুনিক করে তুলতে গিয়ে এ মতবাদকে প্রায়ই তার প্রাচীন পট থেকে ছিন্ন করে ফেলেন এবং তার মধ্যে সাংবিধানিকতা, আইনসিদ্ধ রাষ্ট্র, ক্ষমতার বাঁটোয়ারা ইত্যাদির যুক্তি দেখতে পান।

ভেরনের ইয়াগের বিশ শতকের গোড়ায় বর্তমানের রাষ্ট্রপাট পুনর্গঠনের নিদর্শন হিশেবে প্লেটো ও আরিস্টটলের রাজনৈতিক আদর্শকে তুলে ধরার অনেক চেষ্টা করেছেন। এবং তা করতে গিয়ে হেগেলপন্থী না হয়েও তিনি গ্রীক রাজনৈতিক চিন্তা থেকে শিক্ষা নিতে বলেছেন হেগেলের প্রেরণায়। এই রূপ মনোভঙ্গি তাঁর কাছে সঙ্গত মনে হয়েছিল রাষ্ট্রীয় পরাক্রম ও রাষ্ট্রীয় আদর্শের (এতোস) মধ্যে আনুরূপ্য প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে। ইয়াগের বলতে চান, কেবল এই ধরনের রাষ্ট্রই বহিরাগত ও অভ্যন্তরীণ স্বেচ্ছাচার রুখতে সমর্থ, কেবল তাই নিজের আদর্শ মর্মবস্তুর অনুরূপ এবং নৈতিক স্বাস্থ্য ও জনগণের ঐক্যের প্রতিসাম্যের ওপর প্রতিষ্ঠিত*।

জার্মান আইনী দর্শনের ঐতিহাসিক ই. রিটার প্রাচীন ক্লাসিকাল তত্ত্বে (বিশেষ করে আরিস্টটলের মতবাদে) দেখেছেন সমস্ত সমাজ আর রাষ্ট্রের পক্ষে প্রযোজ্য চিরন্তন পরিসর**। এই চিরন্তনতা এবং আরিস্টটলীয় মতবাদের তাৎক্ষণিক তাৎপর্যের মূল তাঁর কাছে এইখানে প্রোথিত যে ঠিক মানব প্রকৃতিকেই আরিস্টটল রাষ্ট্র, আইন, রাজনৈতিক শৃঙ্খলা ও নৈতিকতার মর্মবস্তু বলে ধরেছেন। স্বাভাবিক বিধিতে নবপ্রবর্তনের যে সমস্যাটা আইনী তত্ত্বে খুবই বিবেচ্য তাকে এই দৃষ্টিকোণ থেকে দেখে তিনি তার আরিস্টটলীয় সমাধানের সুপারিশ করেছেন, অর্থাৎ এগুতে হবে মানব প্রকৃতি থেকে, তাতেই আধুনিক আইনের প্রজ্ঞা ও সত্য। আরিস্টটলবাদের এই নবপ্রবর্তন

তিনি শুধরে নিয়েছেন হেগেলীয় প্রেরণায়, বলেছেন যে বলবৎ আইনের ভিত্তি তুরীয় ধ্যানে নয়, বাস্তবতার প্রজ্ঞায়।*।

আইন এবং ন্যায় সম্পর্কে আরিস্টটলের মতবাদ, তাঁর ব্যক্তিগত মালিকানার সমর্থন এবং সম্পত্তির সাধারণীকরণের (প্লেটোনিক 'কমিউনিজম') সমালোচনা গ্রহণ করেন ড. জিগফ্রিডের মতো পশ্চিমে আরিস্টটলের রাজনৈতিক-আইনী মতবাদ নিয়ে গবেষক সুপণ্ডিত। তাছাড়া আরিস্টটলের রাজনৈতিক নির্মিতিতে তিনি দেখেন 'আইনভিত্তিক রাষ্ট্র' এবং একধরনের 'সামাজিক চুক্তি'**।

স্বেচ্ছাচার ও স্বৈরশাসনের আরিস্টটলকৃত সমালোচনাকে যেক্ষেত্রে জিগফ্রিড এক করে দেখেন সর্বগ্রাসী রাষ্ট্রের সমালোচনা বলে***, ক. পপার সেক্ষেত্রে আরিস্টটলকে বলেছেন 'মুক্ত সমাজের' শত্রু, তাঁর মতবাদকে ঘোষণা করেছেন মধ্যযুগীয় ও আধুনিক সর্বগ্রাসিতার প্রাচীন উৎস (হেরাক্লিটাস ও প্লেটোর সঙ্গে একত্রে)****। প্রাচীন রাজনৈতিক তত্ত্বের সঙ্গে আধুনিক সর্বগ্রাসবাদের যোগাযোগ পপার ঘটিয়েছেন হেগেলের মাধ্যমে 'হেগেলবাদের আরিস্টটলীয় শিকড়ের' উল্লেখ করে*****।

আরিস্টটলীয় মতবাদকে সর্বগ্রাসবাদ বলে চিহ্নিত করে পপার সুদূর অতীতের ধ্যানধারণার মূল্যায়নে মূর্তনির্দিষ্ট-ঐতিহাসিক বিচারই শুধু উপেক্ষা করেন নি, আরিস্টটলের রাজনৈতিক তত্ত্বের সেই দিকগুলি স্পষ্টতই এড়িয়ে গেছেন (যেমন, বিচক্ষণ অহংবাদের আরিস্টটলীয় প্রতিপাদন, স্বেচ্ছাচার, স্বৈরশাসন এবং অন্য যেসব শাসন বলাত্মক, অধিকার ও আইন থেকে বিচ্যুত, তাদের সমালোচনা), যা সর্বগ্রাসবাদের ধারণার সঙ্গে মেলানো কঠিন।

ক. পপারের মতোই একই দৃষ্টবাদী অবস্থান থেকে আরিস্টটল ও প্লেটোর দৃষ্টিভঙ্গির তীব্র সমালোচনা করেছেন ই. টোপিচ। তাঁদের মতবাদের প্রজ্ঞানমূলক তাৎপর্য তিনি আদপেই মানেন না আর সেটা এই বলে প্রমাণের চেষ্টা করেন যে রাজনৈতিক-আইনী প্রসঙ্গ নিয়ে তাঁদের ব্যাখ্যাগুলো দাঁড়িয়েছে

ম্ল্যবোধাশ্রিত (প্রকৌশলী আকার, সামাজিক আকার ইত্যাদি) মডেলের ওপর, যেখানে দৃষ্টবাদী অবস্থানে কথাটা হওয়া উচিত ছিল ম্ল্যবোধবর্জিত প্রজ্ঞান।

প্লেটো-আরিস্টটলের তাত্ত্বিকতাকে টোপিচ দেখেছেন আদিম শামানিজমের (ওঝাবৃত্তি) দার্শনিক যুক্তিদান রূপে, তাঁর মতে, এর প্রচ্ছন্ন উদ্দেশ্য হল 'বাস্তবতার পীড়ন' থেকে মুক্তির প্রয়াস*। টোপিচের মতে, প্লেটো ও আরিস্টটল ব্যক্তিমানুষ ও তার আত্মাকে প্রথমে করেছেন সোপানতান্ত্রিক ছকভুক্ত (প্রাজ্ঞ অংশের নিকট অপ্রাজ্ঞ অংশের অধীনতা, ইত্যাদি), আগেই সামাজিক শৃঙ্খলার প্রভুত্ব হিশেবে রাষ্ট্রের আদর্শটা ধরে নিয়ে পরে ফের আবার এই আদর্শটা নির্মাণ করেছেন আত্মার সোপানতান্ত্রিক গঠনের সাদৃশ্য দিয়ে। টোপিচ মনে করেন, এই ধরনের কথিতকথন পদ্ধতির পরিণাম দাঁড়ায় 'কর্তৃত্বমূলক রাষ্ট্ররূপের' প্রতিষ্ঠা**।

আমরা মনে করি, আরিস্টটল ও প্লেটোর ধারণাদির অপব্যাখ্যার কারণ টোপিচের ভ্রান্ত যাত্রাবিন্দু, সেগুলিও কিন্তু ম্ল্যবোধমুখিতা থেকে মুক্ত নয়; নইলে কর্তৃত্বমূলক রাষ্ট্রের সমালোচনা এবং উদারনৈতিক-গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র সমর্থনের যুক্তিই বা আসে কোত্থেকে?!

রাজনৈতিক-আইনী সমস্যাদির প্রজ্ঞান কোনো-না-কোনো ভাবে ম্ল্যবোধমুখিতার সঙ্গে জড়িত (সামাজিক ও নৈতিক পটে), কোনো-না-কোনো একটা ম্ল্যবোধ নির্বাচনের সঙ্গে জড়িত, যদিও বিদ্যমান ম্ল্যবোধগুলির কোনো একটাকে বেছে নিলেই সামাজিক-রাজনৈতিক প্রজ্ঞান এগিয়ে যায় না। এরূপ প্রজ্ঞানের সত্যকার প্রতিটি প্রগাঢ়তাতেই আবিষ্কৃত হয় নতুন নতুন আত্মিক ও সামাজিক-রাজনৈতিক ম্ল্যবোধ, সমৃদ্ধ হয় মানবিক সংস্কৃতি। আরিস্টটল ঠিক সেই উচ্চকোটির লোক যিনি মানবিক প্রজ্ঞানকে প্রসারিত ও গভীর করেছেন, রাজনীতিও তার অন্তর্গত।

§৬। প্রাচীন রোমে রাজনৈতিক ও আইনী মতবাদ

প্রাচীন রোমের রাজনৈতিক ও আইনী চিন্তার ইতিহাস পুরো সহস্র বৎসর নিয়ে, নিজের বিবর্তনে তাতে প্রতিফলিত হয়েছে দীর্ঘ সময় ধরে প্রাচীন রোমের সামাজিক-অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক-আইনী জীবনের গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন। প্রাচীন রোমের ইতিহাস সাধারণত তিন পর্বে ভাগ করা হয়: রাজকীয় (খিঃ পূঃ ৭৫৪-৫১০), প্রজাতান্ত্রিক (খিঃ পূঃ ৫০৯-২৮), সম্রাটীয় (খিঃ পূঃ ২৭ থেকে ৪৭৬ খিস্টাব্দ)। তবে ঐক্যবদ্ধ রোমক সাম্রাজ্য চূড়ান্তরূপে বিভক্ত হয়ে যায় ৩৯৫ খিস্টাব্দে প্রতীচ্য (রাজধানী রোম) ও প্রাচ্য অংশে (রাজধানী কনস্তান্তিনোপল)। শেষোক্ত সাম্রাজ্য (প্রাচ্য-রোমক, বাইজেন্টাইন) টিকে থাকে ১৪৫৩ সাল অবধি।

প্রাচীন রোমের রাজনৈতিক-আইনী প্রতিষ্ঠানাদি ও দৃষ্টিভঙ্গি গড়ে ওঠে জনগণের বিভিন্ন স্তরের মধ্যে, প্যাট্রিশিয়ান আর প্লিবিয়ান, নোবিলিটেট (প্যাট্রিশিয়ান আর ধনী প্লিবিয়ানদের মধ্য থেকে) আর নিঃস্ব, অপটিমাট (সমাজের উচ্চাংশের অনুগামী) আর পপুলার (স্বাধীন নিচুতলার পক্ষপাতী), স্বাধীন ও দাসেদের মধ্যে তীব্র সংগ্রামের পরিস্থিতিতে দীর্ঘকালব্যাপী এক ইতিহাস ধরে।

প্রাচীন রোমের ইতিহাসে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছিল প্যাট্রিশিয়ানদের সঙ্গে, অর্থাৎ তথাকথিত 'রোমক প্রজা', যাদের হাতে ছিল রাজনৈতিক ও নাগরিক অধিকারের একাধিপত্য তাদের সঙ্গে নিজেদের অবস্থা সমান করে নেবার জন্য প্লিবিয়ানদের সংগ্রাম। এঙ্গেলসের মূল্যায়নে* এ সংগ্রামই হল সেই কারণ, খিঃ পূঃ ৬ষ্ঠ শতকের মাঝামাঝি যা ষষ্ঠ রোমক রাজা সেবিয়াস তুল্লিয়াসের সংস্কার ঘটায়, অন্তঃসারের দিক থেকে যা ছিল বৈপ্লবিক। এই সংস্কারে প্লিবিয়ানরা 'রোমক প্রজার' অন্তর্গত হয়, যা সম্পত্তি অনুসারে পাঁচটি ভাগে বিভক্ত ছিল। রাষ্ট্র চালনায় ধনীদের

ভারাধিক্য নিশ্চিত করা হয়েছিল সংস্কারে। প্লিবিয়ানরা জনসভায় অংশ নেয়া ও সামাজিক সম্পত্তির (ভূমি সম্পত্তি সমেত) একটা ভাগ পাবার অধিকার পায়। কিন্তু প্যাট্রিশিয়ানদের সঙ্গে অধিকারের ব্যাপারে পুরোপুরি সমান করা হয় নি তাদের। দীর্ঘকাল ধরে তারা প্যাট্রিশিয়ানদের বিশেষ সুবিধার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করেছে। খ্রিঃ পূঃ ৪৯৪ সালে যখন নিজেদের অবস্থায় অসন্তুষ্ট প্লিবিয়ানরা রোম ত্যাগ করে যায়, তখন প্যাট্রিশিয়ান কনসাল মেনেনি আগ্রিপ্পা তাদের এই বুঝিয়ে ফেরায় যে রোমক নাগরিক সমাজ একই দেহসত্তার সঙ্গে তুলনীয় যার বিভিন্ন অঙ্গ বিভিন্ন কাজ করে গেলেও সেটা সমগ্র দেহসত্তার জন্য প্রয়োজনীয়।

এই সময় ব্যাপক অধিকার নিয়ে স্থাপিত হয় প্লিবিয়ান (জনগণের) ট্রিবিউন (মুখপাত্র), তাতে অন্যান্য ম্যাজিস্ট্রেটদের প্লিবিয়ানবিরোধী ক্রিয়াকর্ম পঙ্গু করে দেয়া সম্ভব হয়। পরে (খ্রিঃ পূঃ ৩৬৭) জনসভা কর্তৃক প্রতি বছরে নির্বাচিত দু'জন কনসালের (রোমক প্রজাতন্ত্রের সর্বোচ্চ শাসক) একজনকে প্লিবিয়ান হতেই হবে, এই আইন পাশ হয়।

প্লিবিয়ানদের প্রমুখ ভাবাদর্শী ছিলেন টিবেরিয়াস ও গাইয়াস গ্রাখাস ভ্রাতৃদ্বয়। যথাক্রমে খ্রিঃ পূঃ ১৩৩ ও ১২৩ সালে জন ট্রিবিউন নির্বাচিত হয়ে তাঁরা বৃহৎ ভূমিমালিকানা সীমাবদ্ধ করা এবং উদ্বৃত্ত জমি বাজেয়াপ্ত করে ভূমিহীনদের মধ্যে তা বিলি করার পক্ষে দৃঢ়ভাবে দাঁড়ান। শহুরে প্লিবিয়ান ও লুম্পেন-প্রলেতারিয়ানদের স্বার্থে গাইয়াস গ্রাখাস রুটির মূল্য হ্রাস, রাস্তা নির্মাণ ইত্যাদি ব্যবস্থার প্রস্তাব দেন।

এইসব ব্যবস্থা কার্যকরী করার প্রয়াসে তীব্র বাধা দেয় রোমক সমাজের উঁচুতলা এবং পরিণামে সশস্ত্র সংঘর্ষ বাধে যাতে গ্রাখাস ভ্রাতৃদ্বয় নিহত হন (খ্রিঃ পূঃ ১৩৩ সালে টিবেরিয়াস, খ্রিঃ পূঃ ১২২ সালে গাইয়াস)।

রাজনৈতিক দিক থেকে গ্রাখাস ভ্রাতাদের লক্ষ্য ছিল সিনেট এবং রক্ষণশীল মনোভাবাপন্ন সিনেট-নির্বাচক সম্প্রদায়ের ক্ষমতা হ্রাস এবং রাষ্ট্রের ব্যাপারে জনগণের (সর্বাগ্রে শহুরে ও গ্রামীণ প্লিবিয়ান, তথা অশ্বারোহী সম্প্রদায়ের) ভূমিকা নির্ধারকরূপে বর্ধন। গাইয়াস গ্রাখাস যে বিচারালয় সংক্রান্ত আইন চালু করেন তাতে যে বিচারালয় আগে ছিল সিনেট-নির্বাচক সম্প্রদায়ের পরিচালনায় তা তুলে দেয়া হয় অশ্বারোহী সম্প্রদায়ের হাতে। রোমক সামাজিক-রাজনৈতিক ব্যবস্থার গণতন্ত্রীকরণের জন্য গ্রাখাসদের সংগ্রামের ওপর নির্দিষ্ট একটা প্রভাব ফেলেছিল প্রাচীন গ্রীক গণতন্ত্রের আদর্শ ও প্রথা-প্রতিষ্ঠানাদি।

দাসব্যবস্থাধীন সমাজে যেখানে রাজনৈতিক ও আইনী জীবনে দাসেরা স্বাধীন বিষয়ী ছিল না, ছিল শুধু পরের মালিকানার বিষয়, সেখানে রাজনৈতিক ক্ষমতার জন্য সংগ্রাম চলেছিল সুবিধাভোগী সংখ্যাল্প মহলের অভ্যন্তরে, স্বাধীন প্রজাদের বিভিন্ন স্তরের মধ্যে (প্যাট্রিশিয়ান ও প্লিবিয়ান, বৃহৎ ও ক্ষুদ্র ভূস্বামী, অভিজাত ও গণতান্ত্রিক মহল, উচ্চ ও নিম্ন, ধনী ও গরিব, অপটিমাটেস ও পপুলার, শাসনের বিভিন্ন ধারার অনুগামীদের মধ্যে)। মার্কসের কথায়, এ সংগ্রামে দাসেরা ছিল 'নিষ্ক্রিয় পাদপীঠ'*।

দাসব্যবস্থার বিকাশ, দাসেদের সংখ্যাবৃদ্ধি, তাদের শোষণ ও পীড়ন বেড়ে ওঠার সাথে সাথে নিপীড়কদের বিরুদ্ধে দাসেদের অনেক অভ্যুত্থান ঘটে। তবে সেগুলি নির্মমভাবে দমিত হয়। শেষ বিচারে যে ভাবাদর্শীয় ও সাংগঠনিক দুর্বলতার জন্য দাসেদের মুক্তি আন্দোলন ব্যর্থ হয়, তার বর্ণনা প্রসঙ্গে লেনিন লিখেছেন: 'আমরা যা জানি, দাসেদের অভ্যুত্থান হয়, দাঙ্গাহাঙ্গামা করে তারা, গৃহযুদ্ধ শুরু করে, কিন্তু কখনো সচেতন বৃহদংশের, সংগ্রামের পরিচালক একটা পার্টি গড়তে পারে নি, পরিষ্কার বোঝে নি কী উদ্দেশ্যে তারা যাচ্ছে, এমনকি ইতিহাসের সবচেয়ে বৈপ্লবিক মুহূর্তগুলিতেও তারা থেকে গিয়েছিল অধিপতি শ্রেণীগুলির হাতের বোড়ে'।**

দাসেদের আন্দোলন খানিকটা সুস্পষ্ট ও স্বাধীন রাজনৈতিক-আইনী ধারণা ও কর্মসূচি উপস্থিত না করলেও দাসব্যবস্থার উৎসমূলে প্রচণ্ড আঘাত হেনে তা নিঃসন্দেহেই সে সময়কার রাজনৈতিক ও আইনী ভাবাদর্শের বিকাশে প্রভাব ফেলেছিল। প্রাচীন রোমের প্রমুখ তত্ত্বগুলির ক্ষেত্রে, সিসেরো, স্টোইক, ব্যবহারশাস্ত্রীরা, আদি খ্রিস্টধর্মের মতাদর্শীদের মতবাদে 'দাস সমস্যায়' যে মনোযোগ দেয়া হয়েছে, তাতে এ প্রভাব চোখে পড়ে।

সাধারণ তাত্ত্বিক দিক থেকে প্রাচীন রোমের রাজনৈতিক-আইনী ভাবনা ছিল তৎকালীন গ্রীক ধ্যানধারণার লক্ষণীয় প্রভাবাধীনে। বিশেষ উল্লেখযোগ্য যে খ্রিঃ পূঃ ৫ শতকের মাঝামাঝি যখন প্লিবিয়ানরা লিখিত আইন প্রণয়নের দাবি করে, তখন গ্রীসে রোমের দূত পাঠানো হয় গ্রীসের আইনব্যবস্থা, বিশেষ করে সলোনের আইনের সঙ্গে পরিচয় লাভের উদ্দেশ্যে। এই পরিচয় কাজে লেগেছে প্রাচীন রোমের আইনের গুরুত্বপূর্ণ আকরগ্রন্থ

'দ্বাদশ ধারার বোধ' রচনায় (প্রথম দশটি ধারা গৃহীত হয় খিঃ পূঃ ৪৫১ সালে, শেষ ধারাদুটি রচিত ও গৃহীত হয় খিঃ পূঃ ৪৫০-৪৪৯ সালে)।

এ ছাড়াও প্রাচীন রোমের গ্রন্থকারদের ওপর বেশ প্রভাব ফেলেছেন সক্রেটিস, প্লেটো, আরিস্টটল, এপিকিউরিয়ানরা, স্টোইক, পোলিবিয়াস প্রভৃতি বহু গ্রীক মনীষী।

এইভাবে ডেমোক্রিটাস ও এপিকিউরাসের বস্তুবাদী দৃষ্টিভঙ্গি, আদি স্বাভাবিক অবস্থা থেকে লোকেদের অগ্রগতিশীল বিকাশের মাধ্যমে শৃঙ্খলাবদ্ধ রাজনৈতিক জীবন, রাষ্ট্র, আইনাদির সৃষ্টি বিষয়ে ডেমোক্রিটাসের ধারণা, রাষ্ট্র ও আইনের চুক্তিমূলক চরিত্র বিষয়ে এপিকিউরাসের ভাবনাকে গ্রহণ করে টিট লুক্রেটিয়াস কার (খিঃ পূঃ ৯৯-৫৫) তাদের বিকশিত করেছেন তাঁর বিখ্যাত 'ব্যাপার-স্যাপারের প্রকৃতি' কবিতায়।

নিজেদের তাত্ত্বিক নির্মিতিতে রোমক লেখকেরা গ্রীক মনীষীদের স্বাভাবিক-আইনী ধারণা, রাজনীতি ও রাজনৈতিক ন্যায়, রাষ্ট্রের রূপ, 'মিশ্র' ধরনের শাসন ইত্যাদি বিষয়ে তাঁদের মতবাদকে কাজে লাগিয়েছেন।

তবে মনে রাখা দরকার যে রোমক লেখকেরা পূর্বসূরীদের বক্তব্য ধার করাতেই সীমাবদ্ধ থাকেন নি, সৃজনশীলভাবে তা প্রয়োগ করেছেন, রোমক বাস্তবতার বিশিষ্ট সামাজিক-রাজনৈতিক পরিস্থিতি ও কর্তব্যের কথা মনে রেখে তাকে আরো বিকশিত করেছেন। যেমন, রাজনীতি ও আইনের পারস্পরিক সম্পর্কের যে ধারণা প্রাচীন গ্রীক চিন্তার বৈশিষ্ট্য, সেটা আরো বিকশিত হয়েছে ও নতুন অভিব্যক্তি লাভ করেছে রাষ্ট্রকে সাধারণী-আইনী জনগোষ্ঠী বলে সিসেরোর ব্যাখ্যায়। স্বাধীন ব্যক্তিসত্তা সম্পর্কে গ্রীক স্টোইকদের ধারণাকে রোমক লেখকেরা (সিসেরো, ব্যবহারশাস্ত্রীরা) কাজে লাগিয়েছেন মূলত সম্পূর্ণ একটি নতুন ধারণা সৃষ্টিতে, যথা ব্যক্তিসত্তার ব্যবহারশাস্ত্রীয় বোধ (আইনবিধৃত ব্যক্তি, পার্সন)।

প্রাচীন রোমক ধারণার একটা বড়ো কীর্তি হল স্বাধীন একটা বিজ্ঞান সৃষ্টি — ব্যবহারশাস্ত্র। রোমের ব্যবহারশাস্ত্রজ্ঞরা, যেমন রাষ্ট্র ও আইন বিষয়ে সাধারণ তত্ত্বের ক্ষেত্রে, তেমনি আলাদা আলাদা ব্যবহারশাস্ত্রীয় বিষয় নিয়েও (নাগরিক আইন, রাষ্ট্রিক ও প্রশাসনিক আইন, ফৌজদারি আইন, আন্তর্জাতিক আইন) বিস্তারিতভাবে রাজনৈতিক-আইনী সমস্যাবলি আলোচনা করেছেন।

প্রাচীন গ্রীকদের থেকে রোমক লেখকদের একটা পার্থক্য হল নিজেদের নির্মিতিগুলোয় তাত্ত্বিক দিক থেকে সেই নতুন ঐতিহাসিক এবং সামাজিক-

রাজনৈতিক বাস্তবতাকে তাঁরা প্রতিফলিত করেছেন, যার মধ্যে তাঁরা থেকেছেন ও সক্রিয় ছিলেন (দাসব্যবস্থা এবং পণ্যোৎপাদন সম্পর্কের উচ্চ বিকাশ, নগর-রাষ্ট্রিক ব্যবস্থা ও পুরনো নগর-রাষ্ট্রিক ভাবাদর্শের সংকট, রোমের বিশ্ব শক্তিতে পরিণতি, প্রজাতন্ত্র থেকে সাম্রাজ্যে, চিরাচরিত ধরনের শাসন থেকে নতুন একেশ্বর ক্ষমতায় — প্রিনসিপাটাস ও ডোমিনাটাসে উত্তরণ, দাস শ্রমের সংকট এবং কলোনাটাসের [জমির খণ্ডীভবন] উদ্ভব ইত্যাদি)। বিদ্যমান ব্যবস্থার যা ভিত্তি সেটার ভাবাদর্শীয় রক্ষক হয়ে থাকলেও সেই সঙ্গে তাঁরা তত্ত্বের দিক থেকে নিজেদের সৃজন দ্বারা রাষ্ট্র ও আইন বিষয়ে মতবাদের ইতিহাসে লক্ষণীয় অবদান যোগ করেছেন এবং তাতে করে মধ্য ও আধুনিক যুগে রাজনৈতিক-আইনী মতবাদের পরবর্তী বিকাশকে বেশ প্রভাবিত করেছেন।

রোম সাম্রাজ্যের পরিসীমায় আমাদের সংবতের প্রারম্ভে দেখা দেয় খ্রিস্টধর্ম, এঙ্গেলসের মতে তা 'দেখা দিয়েছিল উৎপীড়িতদের আন্দোলন হিশেবে: প্রথমে তা এগিয়ে আসে দাস ও মুক্তিপ্রাপ্তদের, গরিব ও অধিকারহীনদের, রোম কর্তৃক বশীভূত অথবা ছত্রভঙ্গ জনগোষ্ঠীর ধর্ম হিশেবে'*। আদি খ্রিস্টধর্ম সমস্ত লোকের সমতার ধারণা প্রচার করে এবং তার চরিত্র ছিল গণতান্ত্রিক।

আদি খ্রিস্টানরা সমস্ত ধণী ও ক্ষমতাধরদের সমালোচনা করে অভিশাপ দেয়, ধিক্কৃত করে রোম সাম্রাজ্যকে, ব্যক্তিগত মালিকানায় আপত্তি করে, নিজেদের সম্পত্তি দিয়ে দেয় নিজেদের সম্প্রদায় ও গোষ্ঠীর (গির্জা) হাতে, এবং দিন কাটাতে থাকে খ্রিস্টের 'দ্বিতীয় আবির্ভাব' এবং 'সহস্র বৎসরের রাজত্ব' প্রতিষ্ঠার আশায়, যেখানে তাড়িত নিপীড়িত কেউ থাকবে না।

৬৮-৬৯ খ্রিস্টাব্দে লিখিত 'জোয়ান ঈশ্বরতাত্ত্বিকের রহস্যোদ্ঘাটন'এ ('অ্যাপোক্যালিপ্‌স্‌') 'বিপুল ব্যাভিচারিণী' রোমের ধ্বংসের ভবিষ্যদ্বাণী করা হয়েছে, 'নিজের ব্যাভিচারের ক্ষিপ্ত সুরা সে জনসাধারণের সবাইকে খাইয়েছে, এবং পার্থিব রাজা তার সঙ্গে প্রেমলীলা করেছে আর পার্থিব বণিকেরা তার বিলাসব্যসন থেকে ধনী হয়ে উঠেছে'। গরিবদের সমর্থন ও ধনীদের সমালোচনা আরো তীক্ষ্ন হয়েছে 'লুকা কথিত সুসমাচার'এ: 'সুখাবিষ্ট লোলুপ এখন, কেননা পেট ভরাচ্ছ... উল্টে, দুর্ভাগ্য তোমাদের, ধনীরা! কেননা নিজেদের সান্ত্বনা তোমরা পেয়ে গেছ'। 'প্রচারক জেকভের

ক্যাথিড্রাল বাণী'তে তীব্র আক্রমণ আছে ধনীদের বিরুদ্ধে।

তবে দ্বিতীয় শতকেই খ্রিস্টান সম্প্রদায়গুলিতে গড়ে উঠতে থাকে নতুন ব্যবস্থা। সম্প্রদায়ের নেতাদের ক্ষমতা বেড়ে উঠতে থাকে, তাদের মধ্যে স্থায়ী যোগাযোগ প্রতিষ্ঠিত হয়, দানা বাঁধে গির্জার আমলাতন্ত্র (যাজকতন্ত্র)। একই সময়ে চলতে থাকে সরকারি ডগমার রূপলাভ, খ্রিস্টীয় শাস্ত্রে মাহাত্ম্যারোপ। খ্রিস্টধর্ম থেকে অন্তর্ধান করে তার সমালোচনামূলক প্রেরণা ও প্রাধান্যকারী ব্যবস্থার প্রতি বিরোধিতার মনোভাব। সমস্ত ক্ষমতার ঐশ্বরিক চরিত্রে জোর দিতে থাকে গির্জা, রাষ্ট্রক্ষমতার নিকট বশ্যতার প্রচার চালায়, বলপ্রয়োগ প্রতিরোধের নিন্দা করে।

প্রচারক পল তাঁর 'রোমবাসীদের নিকট বাণী'তে বলেছেন: 'প্রতিটি আত্মা অবশ্যই হবে সর্বোচ্চ ক্ষমতার বাধ্য; কেননা ঈশ্বর থেকে পৃথক কোনো ক্ষমতা নেই, ক্ষমতা যে এসেছে ঈশ্বর থেকে সেটা প্রতিপন্ন হয়েছে। ক্ষমতার যে বিরোধিতা করে সে ঈশ্বরের বিরোধিতা করে — এটা প্রতিপন্ন হয়েছে; আর বিরোধীরা নিজেরাই নিজেদের নিন্দা ডেকে আনে'। পরে পল লিখছেন: 'অধিকর্তা হল ঈশ্বরের চাকর', তাই 'বশ্যতা মেনে নিতে হবে শুধু শাস্তির ভয়ে নয়, বিবেক থেকে'। বাধ্যতার এই প্রচারের লক্ষ্য ছিল বিদ্যমান ব্যবস্থাকে মানিয়ে নেয়া, তাদের আত্মিক সমর্থন দান।

গির্জার সোপানতন্ত্র, বিশপ কর্তৃত্ব ও একক গির্জার উদ্ভব, খ্রিস্টধর্মকে মাহাত্ম্যদানের প্রক্রিয়ার সঙ্গে সঙ্গে চলে 'সত্য' ধর্ম থেকে বিচ্যুত বিভিন্ন ধরনের সম্প্রদায় ও ধর্মদ্রোহের বিরুদ্ধে তীব্র সংগ্রাম। দ্বিতীয় শতকে এইসব সম্প্রদায় ও ধর্মদ্রোহের অনুগামীরা (বিশেষ করে ছোটো এশিয়ায় 'মণ্টানিস্টরা' এবং উত্তর আফ্রিকায় 'আগোনিস্টিকরা') আঁচরে আদি খ্রিস্টধর্মের আদর্শগুলির রূপায়ণ, দাসপ্রথা, ব্যক্তিগত সম্পত্তি ও লোকেদের মধ্যে অসাম্য উচ্ছেদের দাবি করত।

ধর্মদ্রোহের বিরুদ্ধে সংগ্রামে নিজেদের অবস্থানকে রূপ দেয়া ও সংহত করায় খ্রিস্টীয় গির্জা প্রায়ই তার সহযোগী পেয়েছে সরকারি রাজক্ষমতায়। একথা ঠিক ২-৩য় শতকে গির্জা নিজেই ছিল আধাবৈধ অবস্থায় এবং খ্রিস্টানদের প্রায়ই তাড়না সইতে হত। কিন্তু ৩১১ সালেই খ্রিস্টধর্ম রোমক সাম্রাজ্যের অন্যতম সমাধিকারী ধর্ম বলে সরকারিভাবে স্বীকৃত হয় এবং ৩২৪ সালে তা ঘোষিত হয় রাষ্ট্রধর্ম।

এইসময় সরকারি খ্রিস্টীয় মতবাদ ও খ্রিস্টধর্মের রাজনৈতিক ভাবাদর্শের প্রবক্তা হিশেবে এগিয়ে আসেন অরেলিয়াস অগাস্টিন।

মার্ক তুল্লি সিসেরো
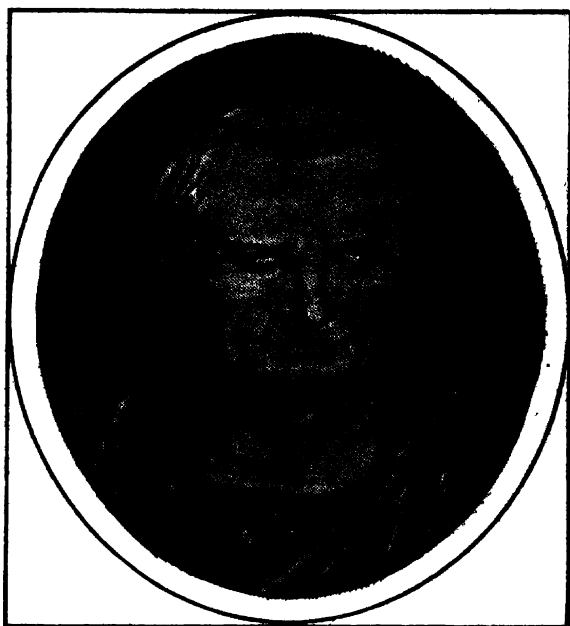
(খিঃ পূঃ ১০৬-৪৩) ছিলেন বিখ্যাত রোমক বাগ্মী, রাষ্ট্রীয় কর্মকর্তা ও মনীষী। তাঁর সৃষ্টিকর্মে বিশেষ মন দেয়া হয়েছে রাষ্ট্র ও আইন বিষয়ক সমস্যাদিতে। এইসব সমস্যার উপর বিশেষভাবে আলোকপাত করা হয়েছে তাঁর 'রাষ্ট্র বিষয়ে', 'আইন বিষয়ে' গ্রন্থে। পুরো একসারি রাজনৈতিক-আইনী সমস্যা আলোচিত হয়েছে তাঁর অন্যান্য রচনায় (যেমন, 'কর্তব্য বিষয়ে'), তেমনি তাঁর বহু রাজনৈতিক ও বিচারবিভাগীয় বক্তৃতায়।

রাষ্ট্র ও আইনের ক্ষেত্রে সিসেরোর তাত্ত্বিক দৃষ্টিভঙ্গিকে লক্ষণীয়ভাবে প্রভাবিত করেছে প্রাচীন গ্রীক ভাবনা, সর্বাগ্রে প্লেটো, আরিস্টটল, পোলিবিয়াস ও স্টোইকদের মতবাদ। সেইসঙ্গে

রোমের দেশভক্ত ও ব্যবহারিক রাজনীতিক হিশেবে সিসেরো এই 'বৈদেশিক' প্রভাবকে সংযুক্ত করতে ও মেলাতে চেয়েছেন রাষ্ট্রিক-আইনী আচরণ ও রাজনৈতিক-আইনী ভাবনার ক্ষেত্রে রোমের নিজস্ব ঐতিহ্যের সঙ্গে, রোমক রাষ্ট্র ও আইনের স্বকীয় ধরনের ইতিহাসের সঙ্গে, সমকালীন বাস্তব পরিস্থিতি ও তাঁর সামাজিক ও রাজনৈতিক বাস্তবতার গুরুত্বপূর্ণ কর্তব্যের সঙ্গে। সমগ্রভাবে সিসেরোর রাজনৈতিক-আইনী মতবাদে পূর্বসূরীদের ভাবনার তাত্ত্বিক প্রয়োগ মিলেছে রাষ্ট্র ও আইন বিষয়ক তত্ত্বের ক্ষেত্রে তাঁর দ্বারা বিকশিত একসারি মৌলিক ও নতুন প্রতিপাদ্যের সঙ্গে।

রাষ্ট্রকে (respublica) সিসেরো নির্ধারিত করেছেন জনগণের (res populi) ব্যাপার, তাদের সম্পত্তি বলে। তবে তিনি এই কথাটা তুলে ধরেছেন যে 'জনগণ যেকোনো উপায়ে জুটে পড়া লোকেদের সংযুক্তি নয়, আইনের প্রশ্নে ও সাধারণ স্বার্থে নিজেদের মধ্যে সম্মতিবদ্ধ বহু লোকেদের সংযুক্তি'। এতে করে সিসেরোর ভাষ্যে রাষ্ট্র শুধু তার সমস্ত স্বাধীন সদস্যদের স্বার্থের অভিব্যক্তি নয়, প্রাচীন গ্রীক ধারণারও যেটা ছিল বৈশিষ্ট্য, সেইসঙ্গে তা এইসব সদস্যের আইনী গোষ্ঠী হিশেবে, নির্দিষ্ট একটা আইনী গঠন হিশেবে, 'সাধারণ আইনের শৃঙ্খলাও'। এইভাবে সিসেরোর অবস্থান রাষ্ট্রের সেই ব্যবহারশাস্ত্রীয় ধারণার উৎসমুখে যা পরে 'আইনী রাষ্ট্রের' আধুনিক পক্ষপাতী অবধি বহু অনুরাগীকে আকৃষ্ট করেছে।

রাষ্ট্রের উদ্ভবের মূল কারণ, সিসেরোর মতে, লোকেদের দুর্বলতা ও ভীতি ততটা নয় (যা পোলিবিয়াসের মত), যতটা একত্রে বাস করার জন্য তাদের জন্মগত প্রবৃত্তি। এই প্রশ্নে আরিস্টটলের মতে সায় দিয়ে সিসেরো রাষ্ট্র উদ্ভবের চুক্তিভিত্তিক চরিত্র বিষয়ে সেসময় বহুল প্রচলিত এপিকিউরিয়ান দৃষ্টিভঙ্গিও অগ্রাহ্য করেন।

পরিবার সমাজের আদি কোষ, যা থেকে ক্রমশ এবং স্বাভাবিক পথেই রাষ্ট্র গড়ে উঠেছে, সিসেরোর এই ভাষ্যেও আরিস্টটলের প্রভাব সুস্পষ্ট। সম্পত্তির সঙ্গে রাষ্ট্রের প্রাথমিক সম্পর্ক তিনি লক্ষ করেছেন এবং স্টোইক পানেটির এই মত গ্রহণ করেছেন যে রাষ্ট্র গড়ে ওঠার কারণ সম্পত্তি রক্ষা। ব্যক্তিগত ও রাষ্ট্রীয় মালিকানার অলঙ্ঘনীয়তার লঙ্ঘনকে সিসেরো ন্যায় ও অধিকারের অপবিত্রকরণ ও লঙ্ঘন বলে অভিহিত করেছেন।

লোকেদের নিজেদের ইচ্ছানুসারে নয়, প্রকৃতির সাধারণ দাবি অনুসারে, মানুষের প্রকৃতিগত দাবিও তার অন্তর্গত, রাষ্ট্র (আইনও) যে উদ্ভূত হয়েছে, সিসেরোর ব্যাখ্যায় তার অর্থ এগুলির (রাষ্ট্র ও আইন) চরিত্র প্রকৃতিগতভাবে

ও মূলতই ঐশ্বরিক এবং সাধারণ বিচারবুদ্ধি ও ন্যায়বোধের ওপর প্রতিষ্ঠিত। তিনি উল্লেখ করেছেন যে প্রকৃতির অনুধাবন থেকে বোঝা যায় যে 'এই গোটা বিশ্বকে চালাচ্ছে বিচারবুদ্ধি'। ইতিপূর্বেই আনাক্সাগরাস কৃত এই প্রতিপাদ্যটা সিসেরো কাজে লাগিয়েছেন তাঁর এই ধারণা প্রতিপাদনের জন্য যে ঐশ্বরিক ইচ্ছায় নির্ধারিত ও সমাচ্ছন্ন 'প্রকৃতি' হল লোকেদের বিচারবুদ্ধিপ্রণোদিত ন্যায়পরায়ণ বিধান ও কর্মের সার্বিক উৎস। প্রকৃতিগতভাবেই লোকেদের মধ্যে বিচারবুদ্ধি ও ন্যায়পরতার 'বীজ' আছে, সুতরাং ঐশ্বরিক প্রেরণা তাদের আয়ত্তাধীন, এবং ঠিক এরই কল্যাণে দেখা দিতে পেরেছে সুশৃঙ্খল মানবিক জনগোষ্ঠী, সুনীতি, রাষ্ট্র ও আইন।

বিচারবুদ্ধি হল মানবাত্মার সর্বোচ্চ ও শ্রেষ্ঠ অংশ, যা দমন করে মানুষের সবকিছু নিম্ন প্রবৃত্তি ও রিপু (লোলুপতা, ক্ষমতা ও যশের আকাঙ্ক্ষা ইত্যাদি), 'আত্মার বিদ্রোহ', তাই 'প্রজ্ঞার প্রভুত্বে রিপুর, ক্রোধের, হঠকারী আচরণের স্থান নেই'।

প্রাচীন গ্রীক চিন্তার ঐতিহ্য অনুসরণে সিসেরো খুবই মন দিয়েছেন বিভিন্ন রূপের রাষ্ট্রব্যবস্থার বিশ্লেষণে, অন্যান্য রূপ থেকে আরেকটা রূপের উদ্ভবে, এইসব রূপের 'চক্রাবর্তনে,' 'সেরা' রূপের সন্ধান ইত্যাদিতে। এক-একটা রূপের রাষ্ট্রব্যবস্থাকে পৃথক করার নিরিখ সিসেরো দেখেছেন যারা রাষ্ট্র চালাচ্ছে তাদের 'চরিত্র ও ইচ্ছা' কী তাই থেকে। শাসকদের সংখ্যা অনুসারে তিনি সহজ ধরনের তিনটি শাসনকে আলাদা করেছেন: রাজার ক্ষমতা (রাজতন্ত্র), অপটিমাটেসদের ক্ষমতা (অভিজাততন্ত্র) এবং জনগণের ক্ষমতা (গণতন্ত্র)। 'যখন সর্বোচ্চ ক্ষমতা থাকে একজন লোকের হাতে, আমরা তখন এই একজনকে বলি রাজা আর এইরূপ রাষ্ট্রব্যবস্থাকে বলি রাজক্ষমতা। যখন সে ক্ষমতা থাকে নির্বাচিতদের হাতে, তখন বলা হয় যে এই নাগরিক জনগোষ্ঠী চালিত হচ্ছে অপটিমাটেসদের ইচ্ছায়। জনগণের ক্ষমতা (তাকে এই বলা হয়) এমন একটা জনগোষ্ঠী যেখানে সবই থাকে জনগণের হাতে।' সহজ ধরনের এইসব রাষ্ট্র রূপ সুসম্পূর্ণ ও শ্রেষ্ঠ নয়, কিন্তু তাহলেও এগুলি, সিসেরোর মতে, সহনীয় ও স্থিতিশীল হতে পারে, শুধু যদি রাষ্ট্র গঠনে লোকেদের সাধারণ অংশগ্রহণের বলে তাদেরকে প্রথম উত্তমরূপে যা ঐক্যবদ্ধ করেছিল, সেই বনিয়াদ ও যোগসম্পর্ক (আইনী সমেত) বজায় রাখা হয়। এই রূপগুলির প্রত্যেকটির নিজ নিজ যোগ্যতা ও ত্রুটি আছে, যদি তাদের মধ্যে বাছাই করতে হয় তাহলে রাজশাসনই কাম্য, গণতন্ত্রের স্থান সর্বশেষে। সিসেরো লিখেছেন: 'দয়ালুতার দিক থেকে আমাদের আকৃষ্ট

করে রাজারা, বিজ্ঞতার দিক থেকে অপটিমাটেসরা, স্বাধীনতার দিক থেকে জনগণ'। তাঁর মতে, শাসনব্যবস্থার গুণের তিনি যে তালিকা দিয়েছেন তা তাদের সামগ্রিকতা, পারস্পরিক সম্পর্ক ও ঐক্যের দিক থেকে মিশ্র (সুতরাং সর্বশ্রেষ্ঠ) ধরনের রাষ্ট্রে থাকতে পারে ও থাকা উচিত, তবে সহজ ধরনের রাষ্ট্রে এই গুণগুলি একপেশে, সহজ ধরনগুলির ত্রুটি সেইখানেই নিহিত, যাতে পরিণামে দেখা দেয় ক্ষমতার জন্য অধিবাসীদের বিভিন্ন স্তরের সংগ্রাম, ক্ষমতার রূপ পরিবর্তন, 'বেঠিক' রূপে তাদের অধঃপতন।

তাঁর ব্যাখ্যায়, রাজশাসনে অন্য সমস্ত লোক সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও আইন প্রণয়ন থেকে বঞ্চিত; অপটিমাটেসদের প্রভুত্বে জনগণ স্বাধীনতা ভোগ করে না এবং ক্ষমতা থেকে বঞ্চিত। আর গণতন্ত্রে কিন্তু, 'যখন সবকিছু সম্পাদিত হয় জনগণের ইচ্ছাক্রমে, তখন যতই ন্যায্য ও নরমপন্থী তা হোক না কেন, তাহলেও এই সমতাটাই অন্যায়, কেননা তাতে সামাজিক প্রতিষ্ঠায় ওঠার সোপান নেই'।

সহজ ধরনের রাষ্ট্রের প্রধান দোষ হল এই যে, সিসেরোর মতে, সবাই তারা অনিবার্যতই, তাদের একপেশেমি ও অদৃঢ়তার ফলে 'উচ্চাবচ ও পিচ্ছিল পথে' চলে, যার পরিণাম দুর্ভাগ্য। রাজশাসনে একেশ্বর শাসকের স্বেচ্ছাচার নিহিত, যা স্বৈরতন্ত্রে অধঃপতিত হতে পারে, আর সেরা শাসনের অন্তগর্ত (প্রজ্ঞা ও শৌর্যের দিক থেকে) অপটিমাটেসদের ক্ষমতা পরিণত হয় ধনী ও সম্ভ্রান্তদের একটা ক্ষুদ্র গোষ্ঠীর প্রভুত্বে। সে ক্ষমতাকে ভুল করে অপটিমাটেসদের শাসন বলে নাম দেয়া হতে থাকলেও, সিসেরোর মতে, আসলে 'যে শাসনে সবচেয়ে ধনী লোকেরা সবচেয়ে সেরা বলে গণ্য হয়, তার চেয়ে কদর্য শাসন আর নেই'। তদনুসারে জনগণের সর্বশক্তিমত্তাও, সিসেরোর মতে, পেঁছিয় ধ্বংসাত্মক পরিণামে, 'জনতার উন্মত্ততা ও সেচ্ছাচারে', তাদের স্বৈরাচারী ক্ষমতায়।

শাসনক্ষমতার এই কদর্য ধরনগুলি (একচ্ছত্র মালিক বা জনতার অত্যাচার, ক্ষুদ্র গোষ্ঠীর প্রভুত্ব) আর রাষ্ট্ররূপ নয়, কেননা সেসব ক্ষেত্রে অন্তর্ধান করে খোদ রাষ্ট্রই, যাকে বুঝতে হবে সাধারণ ব্যাপার ও জনগণের সম্পত্তি বলে, অন্তর্ধান করে সাধারণ স্বার্থ ও সকলের পক্ষে বাধ্যতামূলক আইন।

রাষ্ট্রপাটের এরূপ অধঃপতন রোধ করা যায় কেবল, সিসেরোর মতে, সর্বশ্রেষ্ঠ, মিশ্র ধরনের রাষ্ট্রব্যবস্থায়, যা গড়ে ওঠে সহজ ধরনের তিনটি শাসনের ইতিবাচক দিকগুলির সমান মিশ্রণে। তিনি লিখেছেন: 'কেননা এটাই বাঞ্ছনীয় যে রাষ্ট্রে যেন থাকে কিছু একটা সমুন্নত ও রাজকীয়,

ক্ষমতার একটা অংশ যেন অর্পিত হয় প্রথম শ্রেণীর লোকেদের কর্তৃত্বে আর কতকগুলি ব্যাপার যেন ছেড়ে দেয়া হয় জনগণের বিচারবিবেচনা ও ইচ্ছার ওপর'। তিনি মনে করেন এরূপ রাষ্ট্রের প্রধান গুণ হল রাষ্ট্রের দৃঢ় স্থায়িত্ব ও তার নাগরিকদের আইনী সমতা।

মিশ্র রূপের শাসনব্যবস্থা সমর্থনের প্রেরণায় সিসেরো পোলিবিয়াস অনুসরণে আদি রাজক্ষমতা থেকে সিনেটভিত্তিক প্রজাতন্ত্রে রোমক রাষ্ট্রের বিবর্তকেও ব্যাখ্যা করেছেন। এই ব্যাপারে রাজক্ষমতার সূচনার তুলনা তিনি দেখেছেন ম্যাজিস্ট্রেট (সর্বাগ্রে কনসালদের) পূর্ণাধিকারে, অপটিমাটেসদের ক্ষমতা — সিনেটের পূর্ণাধিকারে, জনগণের ক্ষমতা — জনসভা ও জন ট্রিবিউন (মুখপাত্রদের) পূর্ণাধিকারে। এই প্রসঙ্গে তিনি 'পূর্বপুরুষদের' দূরদর্শিতা ও প্রজ্ঞার উচ্চ প্রশংসা করেছেন যাঁরা এমন বিচক্ষণ ধরনের রাষ্ট্ররূপ গড়েছেন এবং ডাক দিয়েছেন তাঁদের অনুজ্ঞা দৃঢ়ভাবে মেনে চলতে। মিশ্র রাষ্ট্রের কোনো একটা দিকে ঢলে পড়ার বিপজ্জনকতায় অঙ্গুলি নির্দেশ করে এবং তাদের পারস্পরিক ভারসাম্যের পক্ষ নিয়ে তিনি 'অধিকার, কর্তব্য ও ক্ষমতার এমন সমান সমান বণ্টনের' প্রয়োজনীয়তায় জোর দিয়েছেন 'যাতে যথেষ্ট ক্ষমতা থাকে ম্যাজিস্ট্রেটদের, যথেষ্ট প্রভাব থাকে প্রথম শ্রেণীর লোকেদের পরিষদের, যথেষ্ট স্বাধীনতা থাকে জনগণের'।

রোমের রাষ্ট্রব্যবস্থার যা গুণ, সিসেরোর মতে, সেটা সমগ্র রোমক জনগণের বহু যুগের অভিজ্ঞতার ফল, কোনো একজন গুণবান ব্যক্তির কীর্তি নয়, কিছু না কিছু তার কাছ থেকে ফসকে যেতে বাধ্য। রোম থেকে অন্যান্য রাষ্ট্রের তফাৎ এই যে সেখানে নিজেদের নিয়মকানুন, অনুজ্ঞার ভিত্তিতে শাসনের রূপ গড়ে দিয়েছেন এক-একজন ব্যক্তি (যেমন, ক্রীটে মিনোস; স্পার্টায় লিকুর্গ; এথেন্সে টেসেই, ড্রাকন্ট, সলোন, ক্লিসফেনাস, ফালেরের দিমিত্রি ইত্যাদি)।

সিসেরোর মতে, রোমের রীতিমতো প্রাধান্য নির্ধারিত হয়েছে স্থলভাগে তার ভৌগোলিক অবস্থান থেকে, সমুদ্রের সঙ্গে সহজে যোগাযোগ করা যায় (টেভেরের কল্যাণে), কিন্তু একেবারে তা সমুদ্রতীরে নয়। তাঁর মতে, সামুদ্রিক নগর-রাষ্ট্রগুলির ভাগ্যে সাধারণত যা ঘটেছে, শত্রুর সেরকম আকস্মিক আক্রমণের হাত থেকে এটা রক্ষাকবচ। তাছাড়া, উল্লিখিত ভৌগোলিক অবস্থাটা নৈতিক-সদাচারের পক্ষেও অনুকূল। তিনি লিখেছেন: 'দূষণ ও রীতি পরিবর্তন বলা যেতে পারে সমুদ্রতীরবর্তী নগরগুলির প্রকৃতিগত, কেননা

তারা অপরের ভাষা ও অপরের রীতিনীতির সংস্পর্শে আসে, সেখানে শুধু বৈদেশিক পণ্যই আসে না, বিজাতীয় আচারেরও আমদানি হয়, ফলে দীর্ঘকালক্রমে তাদের স্বদেশীয় প্রতিষ্ঠানাদির কিছুই অপরিবর্তিত থাকতে পারে না'। নগর-রাষ্ট্রের সামুদ্রিক সামীপ্যের রাজনৈতিক পরিণাম হল এইসব রাষ্ট্রের অস্থায়িত্ব, ক্ষমতার ঘন ঘন পরিবর্তন। গ্রীসের সমস্ত দুর্ভাগ্য ও উপপ্লবগুলির কারণ সিসেরো দেখেছেন হেলেনীয় নগর-রাষ্ট্রগুলির সমুদ্রতীরবর্তিতা সম্পর্কিত ভৌগোলিক ত্রুটিতে।

প্লেটোর আদর্শ রাষ্ট্রের প্রকল্প থেকে সিসেরোর 'সর্বশ্রেষ্ঠ' (অর্থাৎ মিশ্র) রাষ্ট্রের পার্থক্য এই যে সিসেরো মনে করেন যে তা বাস্তবে রূপায়ণযোগ্য, রোমের প্রজাতান্ত্রিক রাষ্ট্রপাটের অস্তিত্বের সেরা সময়ে ('পূর্বপুরুষদের আমলে') তার ক্রিয়াকলাপের কথা মনে রেখেই। প্লেটোনিক রাষ্ট্র বলতে গেলে বাস্তব নয়, মাত্র একটা কামনা; সেটা 'এমন নয়, যা বিদ্যমান থাকতে পারে, কেবল এমন যাতে নাগরিকত্বের বিচক্ষণ বনিয়াদকে লক্ষ করা সম্ভব'।

একথা ঠিক যে সিসেরো সজ্ঞান ছিলেন যে তাঁর প্রশংসিত মিশ্র রোমক রাষ্ট্রব্যবস্থা বর্তমানের চেয়ে বরং অতীতের ব্যাপার। এই থেকেই সেই অতীতের কাছে তাঁর বহুসংখ্যক আবেদন। সিসেরোর কালে রোম প্রজাতন্ত্র ঘোর সংকটের মধ্য দিয়ে যাচ্ছিল, অপেক্ষা করছিল তার শেষ দিনগুলোর। রোমের রাজনৈতিক ব্যবস্থা এগিয়ে যাচ্ছিল একেশ্বর ক্ষমতা, প্রিন্সিপাটাস ও রাজতন্ত্রের দিকে। মিশ্র শাসন সম্পর্কে সিসেরোর ধারণা এবং সাধারণভাবেই রাষ্ট্র জনগণের ব্যাপার বলে তাঁর বিচার স্পষ্টতই তাঁর সমকালীন সামাজিক-রাজনৈতিক অবস্থা এবং রোমক রাষ্ট্রপাটের বিকাশের বাস্তব প্রবণতা থেকে পৃথক। ক্ষমতার জন্য তখনকার সংগ্রামের গভীরে অবস্থিত তত্ত্বকার ও ব্যবহারিক রাজনীতিক হিশেবে সিসেরোর পক্ষে শক্তি ও ক্ষমতার নতুন দলবদ্ধতা, আগেকার প্রজাতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানাদির বাস্তব অধিকারে ভাটা এবং এক-একজন ব্যক্তির হাতে, বিশেষ করে যারা সৈন্যবাহিনীর ওপর নির্ভর করছিল, তাদের হাতে সে ক্ষমতার কেন্দ্রীভবন না দেখাটা সম্ভব ছিল না। সেটা সুস্পষ্ট দেখা যাচ্ছিল সুল্লা, পম্পেইয়াস, সিজার, আণ্টনিয়াস, অক্টাভিয়ান প্রভৃতির সমুন্নয়নে। নিজের রচনায় এবং ব্যবহারিক রাজনৈতিক ক্রিয়াকর্মের গোটা সময়টায় সিসেরো সিনেটভিত্তিক প্রজাতান্ত্রিক ব্যবস্থার পক্ষ নিয়েছিলেন, বিরোধিতা করেছেন ব্যক্তিগত সামরিক একনায়কত্ব সমেত এক-একজন ব্যক্তির পূর্ণক্ষমতাধিকারে।

সিসেরোর রাজনৈতিক অবস্থানের 'মধ্য' চরিত্রের অর্থ ছিল এই যে বিভিন্ন গ্রুপ ও শক্তির (ফৌজ, নোবিলিটি, প্লিবিয়ান ইত্যাদি) সম্ভাব্য অতিমাত্রিক ভূমিকার ওপর প্রজাতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানাদির বৈধভাবে বিদ্যমান ব্যবস্থার পূর্ণক্ষমতার অগ্রাধিকারের ঐতিহ্যকে সমর্থন করে 'সাধারণ আইন-শৃঙ্খলার' কাঠামোর মধ্যে রোমক নাগরিকদের সমস্ত সামাজিক স্তরের 'সাধারণ সম্মতির' ধ্বনি দেন। এই 'মধ্য' পন্থা চমৎকার দেখা গেছে 'অপটিমাটেস' ও 'পপুলারদের' মধ্যে, সাধারণভাবে বললে, সমাজের ওপর ও নিচু তলা অনুযায়ী দুই রাজনৈতিক ধারার অনুগামীদের মধ্যে সিসেরোর রাজনৈতিক মহড়া নেওয়ায়। অপটিমাটেস ও পপুলারদের মধ্যে লক্ষ্যের পার্থক্য আছে এটা মানলেও সিসেরো সেইসঙ্গে এই ধারণাটা বিকশিত করেন যে উভয়ের সত্যকার স্বার্থ পুরোপুরি মিলিত ও ধর্তব্য হতে পারে 'সাধারণ সম্মতির' আওতার ভেতরে। এরূপ ব্যাখ্যা অনুসারে ঐ দুই ধারার চরমপন্থীরা হল ভুয়া-অপটিমাটেস বা ভুয়া-পপুলার, ধনী ও সম্ভ্রান্ত অথবা জনতার নিজ নিজ লাভের জন্য একপেশে ক্রিয়াকলাপে, সিসেরোর মতে, সাধারণ কল্যাণ ও রাষ্ট্রের ক্ষতি করেছে। জনসভা কর্তৃক কনসাল নির্বাচিত হবার পর কিন্তু সিসেরো নিজেকে জাহির করেছেন (বিনা বাগাড়ম্বরে নয়) জনগণের সত্যকার রক্ষক, কনসাল-পপুলার বলে।

'সত্যকার পপুলার' এবং 'সাধারণ সম্মতির' ও রাষ্ট্রের কল্যাণের জন্য সংগ্রামীর এই অবস্থান থেকে সিসেরো তাঁর রাজনৈতিক প্রতিপক্ষদের আক্রমণ করেছেন, বিশেষ করে রুল, কাটিলিনা, ক্লডিয়াসের মতো, তাঁর মতে, ভুয়া-পপুলারদের। 'কাটিলিনার ষড়যন্ত্র' দমনে তাঁর প্রধান ভূমিকার জন্য সিসেরো জনসভা থেকে ধন্যবাদ এবং 'পিতৃভূমির পিতা' উপাধি লাভ করেন। এটা খ্রিঃ পূঃ ৬৩ সালের ঘটনা আর খ্রিঃ পূঃ ৫৮ সালে ক্লডিয়াসের ট্রিবিউনাটেসের সময় সিসেরো রোম পরিত্যাগ করে যেতে বাধ্য হন, সেখানে তিনি ফেরেন কেবল ১৭ মাস পরে যখন ক্লডিয়াস প্রভাবচ্যুত হন। ৫০-এর দশকের শেষে সিসেরো ট্রায়ামভিরদের (পম্পেইয়াস, সিজার ও ক্রাসাস) সর্বশক্তিমত্তার এবং সম্ভবপর সামরিক একনায়কত্বের বিরোধিতা করেন, অননুকূল শক্তিসম্পর্ক এবং নিজের নিরাপত্তার দিকে চোখ রেখেই অবশ্য। ৪০-এর দশকে সিজারের ব্যক্তিগত ক্ষমতা প্রতিষ্ঠার মূল্যায়ন তিনি করেন 'প্রজাতন্ত্রের রাত্রি', 'রাষ্ট্রে স্বাধীনতা লোপ' ও স্বৈরাচার বলে। সিজারকে হত্যায় (খ্রিঃ পূঃ ৪৪) তিনি উল্লসিত হন। চক্রান্তকারীদের মধ্যে তিনি না থাকলেও তারা তাঁকে নিজেদের লোক বলে মনে করত, সিজারকে

হত্যার পর মুক্তি পুনঃপ্রতিষ্ঠা উপলক্ষে সিনেটে 'সিসেরো!' বলে চিৎকার উঠেছিল।

সিসেরোর জীবন ও ক্রিয়াকলাপের শেষটা (খিঃ পূঃ ৪৪-৪৩) কাটে সামরিক একনায়কত্বের নতুন বিপদ ও নতুন ট্রায়ামভিরদের (আণ্টনিয়াস, অক্টাভিয়ান ও লেপিড) বিরুদ্ধে সংগ্রামের মধ্য দিয়ে। এই সংগ্রামে সিসেরো 'সমগ্র ইতালি' ও প্রজাতন্ত্রের সমস্ত পক্ষপাতীদের নাম নেয়ায়, আপ্পিয়ানের মতে, 'একচ্ছত্র ডেমাগগের' (জননেতার) ভূমিকা পালন করেন। ট্রায়ামভিরদের বিজয়ের পর সিসেরোর নাম বিনা বিচারে মৃত্যুদণ্ডনীয় ব্যক্তিদের তালিকাভুক্ত হয়। খিঃ পূঃ ৪৩ সালের ৭ ডিসেম্বর ট্রায়ামভিরদের পক্ষপাতীরা মুণ্ডচ্ছেদ করে সিসেরোর।

ব্যবহারিক রাজনীতি ও তার স্বতন্ত্র যুক্তির বৈশিষ্ট্যের কথা মনে রাখলে মানতেই হয় যে রাষ্ট্রের তাত্ত্বিক ধারণার মূল আদর্শ ও নীতিকে তিনি বিকশিত করেছিলেন নিজের রাজনৈতিক মতবাদে, তার প্রতি মোটের ওপর বিশ্বস্ত ছিলেন। আমরা আগে যা দেখেছি, এখানে-সেখানে মূলে গুরুত্ব দেয়া হয়েছে 'সাধারণ কল্যাণ', 'স্বার্থের মিল', 'সাধারণ আইন-শৃঙ্খলা' ইত্যাদি ধারণায়। বলাই বাহুল্য, এতে রোম প্রজাতন্ত্রের স্বাধীন সম্প্রদায় ও নাগরিকদের স্বার্থের কথাই মনে রাখা হয়েছিল, দাসেদের স্বার্থ নয়, সাধারণভাবেই তারা থেকে গেছে রাষ্ট্রের সিসেরীয় ছকের বাইরে, অধিকার ও ক্ষমতার বিষয়ী নয়, বিষয়। সম্পত্তিগত সমতা অস্বীকার করেন সিসেরো, সামাজিক স্তরভেদ এবং সামাজিক-রাজনৈতিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে অসাম্যকে ন্যায্য মনে করতেন। এমনকি গণতান্ত্রিক সমতাও (অর্থাৎ, সমস্ত স্বাধীন প্রজাদের সমতা) লোকেদের সামাজিক অবস্থান ও যোগ্যতা উপেক্ষা করেছে বলে তাঁর কাছে ন্যায়সঙ্গত নয়।

আর দাসপ্রথার কথা যদি ধরি, তাহলে, সিসেরোর মতে, সেটা 'ন্যায্য, কারণ এই ধরনের লোকেদের পক্ষে দাসের অবস্থা হিতকর এবং বিচারবুদ্ধির সঙ্গে তা চালালে তাদের উপকার হয়'। দাসপ্রথা নির্ধারিত হচ্ছে প্রকৃতি থেকেই যা দুর্বলদের ওপর তাদেরই উপকারের জন্য শ্রেষ্ঠদের প্রভুত্ব দান করে। এই হল সিসেরোর যুক্তিধারা, সেটা তিনি জোরদার করতে চান আত্মার বিভিন্ন অংশের মধ্যে সম্পর্কের তুলনা দিয়ে: প্রভু দাসকে সেইভাবেই শাসন করে, যেভাবে আত্মার সেরা অংশ (বিচারবুদ্ধি, প্রজ্ঞা) শাসন খাটায় আত্মার দুর্বল ও কলুষিত অংশের (রিপু, ক্রোধ ইত্যাদি) ওপর। অতএব দাসের অধিকার হল এই যে প্রকৃতি (অর্থাৎ স্বাভাবিক বিধি) অনুসারে ন্যায়পরতার

সঙ্গে তাদের ওপর অধিকার খাটানো মানায়। এই ন্যায়পরতার অর্থকে নির্দিষ্ট করে তিনি বলেছেন যে দাসদের সঙ্গে ব্যবহার করতে হবে ভাড়াটে মজুরের মতো: তার কাছ থেকে তদনুসারী কাজ দাবি করতে হবে এবং তাকে দিতে হবে যা দেওয়ার কথা।

দাসকে 'কথা-কওয়া হাতিয়ার' বলে ধরার যে রীতি তখন প্রচলিত ছিল তা থেকে দাসকে 'ভাড়াটে মজুর' বলায় একটা শুভ পার্থক্য সূচিত হলেও সর্বাগ্রে তাঁর যা সাধারণ ধারণা: প্রকৃতি অনুসারে 'সবাই আমরা পরস্পরের সদৃশ ও সমান', 'লোকেদের মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই', মানুষ 'একক নগররূপ সারা বিশ্বের নাগরিক' ইত্যাদি উক্তি থেকে এ ব্যাপারে সিসেরোর যুক্তি লক্ষণীয়ভাবে সরে গেছে।

সিসেরোর রচনায় অনেক মন দেয়া হয়েছে সত্যকার রাষ্ট্রীয় কর্মকর্তা ও আদর্শ নাগরিকদের সদ্‌গুণের ওপর। এই প্রসঙ্গে তিনি এপিকিউরিয়ান ও বহু স্টোইকের এই মতের সমালোচনা করেছেন যে শাসনভার হাতে নেয়া এবং সাধারণভাবেই সামাজিক ও রাজনৈতিক জীবনে সক্রিয় অংশগ্রহণ প্রাজ্ঞ ব্যক্তিদের উচিত নয়। বিজ্ঞান ও শিল্পের সঙ্গে মিলে রাষ্ট্র চালনা দাবি করে কেবল জ্ঞান ও সদ্‌গুণ নয়, সাধারণ কল্যাণের স্বার্থে ব্যবহারিকভাবে তা প্রয়োগের নৈপুণ্যও, এই মত পোষণ করে সিসেরো উল্লেখ করেছেন যে 'লোকেদের জীবন আরো নিরাপদ ও আরো সমৃদ্ধ করার জন্য' 'স্বয়ং প্রকৃতিই' শ্রেষ্ঠ লোকেদের আকর্ষণ করে থাকে। রাষ্ট্র ও আইন বিষয়ে বিজ্ঞানকে তিনি 'এমন বিদ্যা' হিশেবে অধ্যয়ন করার সুপারিশ করেছেন 'যা আমাদেরকে রাষ্ট্রের কাছে মূল্যবান করে তুলবে', রাষ্ট্রের এই সেবায় তিনি দেখেছেন 'প্রজ্ঞার সবচেয়ে গৌরবজনক কর্তব্য এবং শৌর্যের মহত্তম প্রকাশ ও তার দায়িত্ব'।

সিসেরোর মতে, প্রাজ্ঞ রাষ্ট্রীয় কর্মকর্তাকে রাষ্ট্রের ব্যাপারে পথ ও বাঁকগুলোকে দেখতে ও আগে থেকে অনুমান করতে হবে যাতে ঘটনার অশুভ গতিকে (সর্বনাশের দিকে শাসন রূপের পরিবর্তন, সাধারণ কল্যাণ ও বাগ্মী। তাছাড়া তাদের হতে হবে রাষ্ট্রবিষয়ক মতবাদে ওয়াকিবহাল রাষ্ট্রের দৃঢ়তা ও দীর্ঘস্থায়িত্বে সর্বোপায়ে সহায়তা করতে হবে তাকে।

রাষ্ট্রীয় ব্যাপারের পরিচালকদের হতে হবে প্রাজ্ঞ, ন্যায়পরায়ণ, সংযত ও বাগ্মী। তাছাড়া তাদের হতে হবে রাষ্ট্রবিষয়ক মতবাদে ওয়াকিবহাল এবং 'আইনের মূলকথাগুলির ওপর দখল রাখতে হবে, তার জ্ঞান না থাকলে কেউ ন্যায়পরায়ণ হতে পারে না'। এই প্রসঙ্গে সিসেরো বিশেষ

গুরুত্ব দিয়েছেন বলবৎ আইনগুলির সরকারি রেকর্ড ও সংরক্ষণে, তাঁর মতে, এটা সেন্সরদের (রাজস্ব-শুল্ক অধ্যক্ষ) অবশ্যকর্তব্য।

যে চরম অবস্থায় জনগণের সাধারণ ব্যাপার, রাষ্ট্রের নিরাপত্তাই বিপন্ন হয়ে পড়ে, তখন, সিসেরোর মতে, জনগণের সম্মতি নিয়ে সত্যকার রাষ্ট্রীয় কর্মকর্তার উচিত 'একনায়কের মতো রাষ্ট্রীয় শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠা করা'। রাজনীতিক এখানে নিজের স্বার্থপর লক্ষ্যে নয়, প্রজাতন্ত্রের পরিত্রাতা হিশেবে সাধারণ স্বার্থে কাজ করছে। প্লেটো অনুসরণে সিসেরো উল্লেখ করেছেন যে তাদের কাজকর্মের পুরস্কার হিশেবে সত্যকার শাসকদের জন্য 'স্বর্গে স্থান নির্দিষ্ট থাকে যাতে তারা চিরকাল সেখানে থাকে ও স্বর্গসুখ ভোগ করে'।

সিসেরোর মতে, আদর্শ নাগরিকের কর্তব্য নির্ধারিত হয় সত্যের প্রজ্ঞান, ন্যায়পরতা, প্রাণের মহিমা ও শোভনতার মতো সদ্‌গুণ অনুসরণের প্রয়োজনীয়তা দিয়ে। নাগরিক শুধু যে অন্যের ক্ষতি করবে না, পরের সম্পত্তি হরণ অথবা অন্যান্য অন্যায় থেকে বিরত থাকবে তাই নয়, তাছাড়া অন্যায়ে পতিতকে সাহায্য করতে, সাধারণ কল্যাণের জন্য খাটতেও সে বাধ্য। নাগরিকদের রাজনৈতিক সক্রিয়তার যৎপরোনাস্তি প্রশংসা করে সিসেরো এই কথায় জোর দিয়েছেন যে 'নাগরিকদের স্বাধীনতা রক্ষায় স্বতন্ত্র ব্যক্তি বলে কেউ নেই'।

এ ছাড়া নাগরিকের গুরুত্বপূর্ণ কর্তব্যের মধ্যে সিসেরো রাষ্ট্রের নিকট তার দায়িত্ব, যোদ্ধা হিশেবে পিতৃভূমি রক্ষার ঔচিত্যের কথা বলেছেন।

প্রকৃতির নিকট, তার বোধি ও নিয়মের নিকট সিসেরোর আবেদনে শুধু রাষ্ট্র ও সমাজ বিষয়ে (বিভিন্ন সম্প্রদায় ও স্তরের অবস্থান সম্পর্কে) তাঁর মতবাদই নয়, তাঁর আইনী তত্ত্বও নিষিক্ত।

সিসেরোর মতে, আইনের মূলে আছে প্রকৃতির অন্তর্নিহিত ন্যায়। তবে এ ন্যায়কে বোঝা হয়েছে যেমন সমগ্রভাবে প্রকৃতি, তেমনি মানবপ্রকৃতির একটা চিরন্তন, অপরিবর্তনীয়, অচ্ছেদ্য ধর্ম বলে। সুতরাং ন্যায় ও আইনের (প্রকৃতিগত আইন, স্বাভাবিক বিধি) উৎস হিশেবে 'প্রকৃতি' বলতে বোঝা হচ্ছে সমগ্র বিশ্বব্রহ্মাণ্ড, মানুষের পরিপার্শ্বের সমস্ত স্থাবর-জঙ্গম ও সামাজিক জগৎ, মানবিক আদান-প্রদান ও সহবসতির রূপ, তথা মানুষের দেহ ও আত্মা, বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীণ জীবন নিয়ে খোদ মানবিক অস্তিত্বও। গোটা এই 'প্রকৃতির' অন্তর্নিহিত হল (তার ঐশ্বরিক প্রেরণা হেতু) বিচারবুদ্ধি ও নিয়মবোধ, নির্দিষ্ট একটা শৃঙ্খলা। প্রকৃতির এই আত্মিক গুণটাই

(প্রজ্ঞা-আত্মিক দিক), তার বস্তুগত ও দৈহিক-বৈষয়িক অঙ্গটা মোটেই নয়, তা পড়ে একটা অধীনস্থ ও গৌণ স্থানে (আত্মার তুলনায় যেমন দেহ, আত্মার বিচারবুদ্ধিগত অংশের তুলনায় যেমন তার ইন্দ্রিয়গত অংশ) — এই আত্মিক গুণটাই হল স্বাভাবিক বিধির সত্যকার উৎস ও বাহক।

স্বাভাবিক বিধির একটা বিস্তৃত সংজ্ঞা দিয়েছেন সিসেরো: 'সত্যকার নিয়ম হল প্রকৃতি অনুযায়ী একটা প্রাজ্ঞ বিধি, সমস্ত লোক তার অন্তর্গত, তা নিরন্তর, চিরন্তন, কর্তব্য পালনে ডাকে আদেশ দিয়ে; অপরাধ নিষেধ করে তা ভয় দেখায়; কিন্তু যদি তার প্রয়োজন না থাকে, তাহলে সৎ লোকেদের তা কোনো আদেশ দেয় না, নিষেধ করে না, আদেশ দিয়ে বা নিষেধ করে তা অসৎ লোকেদের ওপর প্রভাব ফেলে না। এরূপ নিয়মের সম্পূর্ণ বা আংশিক নাকচের প্রস্তাব হল ধৃষ্টোক্তি; তার ক্রিয়া কোনোরকম সীমিত করা অননুমোদনীয়; তাকে পুরোপুরি বাতিল করা সম্ভব নয় এবং সিনেটের কোনো নির্দেশ, জনগণের কোনো নির্দেশ থেকে আমরা এই নিয়ম থেকে মুক্তি পেতে পারি না।'

এই 'সত্যকার নিয়ম' সর্বদা ও সর্বকালে একই এবং 'যেকোনো কালে সমস্ত জনগণকে নিয়ে প্রচলিত হবে এক শাশ্বত ও অপরিবর্তনীয় বিধি, তদুপরি সমস্ত লোকের জন্য থাকবে একই সাধারণ উপদেষ্টা, আজ্ঞাদাতা — ঈশ্বর, স্রষ্টা, বিচারক, বিধানকর্তা'। মানবিক প্রকৃতিকে ঘৃণা করে নিজের খুশিমতো এই নিয়ম যারা মানবে না, তাদের সবাইকে সিসেরো বলেছেন নিজের কাছ থেকে পলাতক, মানুষের সাধারণ শাস্তি এড়াতে পারলেও মহত্তম (ঐশ্বরিক) অমোঘ দণ্ড তারা পাবেই।

আমরা যা দেখেছি, সিসেরোর স্বাভাবিক বিধি বিষয়ক মতবাদে প্লেটো, আরিস্টটল এবং একাধিক স্টোইকদের প্রভাব পড়েছে। যেখানে তিনি ন্যায়ের (সুতরাং স্বাভাবিক বিধির মূলনীতির) মর্মার্থ দেখেছেন এই কথায় যে 'তা প্রত্যেককে তার প্রাপ্য দেয় এবং তাদের মধ্যে সমতা রক্ষা করে', সেখানেও এই প্রভাব লক্ষণীয়। তবে সমতা এখানে শুধু এইটুকু যে সমস্ত লোকে — আনুষ্ঠানিকভাবে সমপরিমাণে, কিন্তু কার্যত বিভিন্ন পূর্বশর্ত ও পরিণাম সহ, প্রত্যেককে তার প্রাপ্য দেবার সাধারণ নীতির প্রভাবাধীন।

সিসেরোর মতে, ন্যায়ের দাবি হল অন্যের ক্ষতি না করা এবং পরের সম্পত্তিতে হাত না দেয়া। তিনি লিখেছেন: 'ন্যায়ের প্রথম দাবি হল এই যে কেবল অন্যায়ের দ্বারা প্ররোচিত না হলে কেউ যেন কারো ক্ষতি না করে, সবাই যেন সাধারণ সম্পত্তিটা সবাই মিলে আর ব্যক্তিগতটা নিজে ভোগ করে।'

এই অবস্থান থেকে তিনি রোমক পপ্‌লারদের পক্ষ থেকে ঋণ বাতিল, বৃহৎ ভূস্বামীদের ওপর হানা, বৈধ মালিকদের কাছ থেকে কেড়ে নেয়া টাকা ও সম্পত্তি নিজেদের অনুগামী ও প্লিবিয়ানদের মধ্যে বিলি করার মতো কাজকর্মে আপত্তি করেছেন।

স্বাভাবিক বিধি (উচ্চতম, সত্যকার নিয়ম), সিসেরোর মতে, দেখা দিয়েছে 'কোনো জারি করা আইন থাকার আগেই, সত্য বলতে কি, সাধারণভাবেই কোনো রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হবার আগেই'। রাষ্ট্র নিজেই ('সাধারণ আইন-শৃঙ্খলা' হিশেবে) তার বিধান ও আইন সহ হল প্রকৃতিতে যে ন্যায় ও অধিকার বিদ্যমান, তার মূর্তায়ন।

এটা থেকে এই দাবি আসে যে মানবিক নির্দেশাবলি (রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান ও বিধান, জারি করা আইন ইত্যাদি) যেন হয় ন্যায় ও অধিকার অনুসারী, কেননা শেষোক্তগুলি লোকেদের মতামত ও বিবেচনার ওপর নির্ভর করে না।

অধিকার প্রতিষ্ঠিত প্রকৃতি দ্বারা, মানবিক সিদ্ধান্ত ও নির্দেশ দিয়ে নয়। তিনি লিখেছেন: 'অধিকার যদি প্রতিষ্ঠিত হত লোকেদের আজ্ঞায়, প্রধানদের সিদ্ধান্তে, বিচারকের রায়ে, তাহলে থাকত দস্যুতার অধিকার, ব্যভিচারের অধিকার, জাল উইল পেশ করার অধিকার, — শুধু এ অধিকার ভোটে বা জনতার সিদ্ধান্তে অনুমোদন পেলেই হল।' লোকেদের জারি করা আইন প্রকৃতির শৃঙ্খলা লঙ্ঘন করতে এবং অধিকারহীনতা থেকে অধিকার, অথবা অকল্যাণ থেকে কল্যাণ, কলঙ্কজনকতা থেকে সাধুতা সৃষ্টি করতে অক্ষম।

প্রকৃতির (এবং স্বাভাবিক বিধির) সঙ্গে মানবিক আইনের সঙ্গতি বা অসঙ্গতি হল তাদের ন্যায্যতা বা অন্যায্যতার মাপকাঠি। ন্যায় ও অধিকারের বিরোধী আইন হিশেবে সিসেরো উল্লেখ করেছেন বিশেষ করে খ্রিঃ পূঃ ৪০৪-৪০৩ সালে এথেন্সের ত্রিশজন স্বৈরশাসকের আইন, তথা খ্রিঃ পূঃ ৮২ সালে রোমক আইনের কথা, এই শেষোক্ত আইন অনুসারে কনসাল এবং প্রোকনসাল হিশেবে সুল্লার সমস্ত ক্রিয়াকলাপ অনুমোদিত হয় এবং রোমক নাগরিকের জীবন ও মৃত্যুর ওপর অধিকার সমেত পূর্ণ কর্তৃত্ব অর্পিত হয় তাঁর ওপর।

যেমন এইরূপ অন্যায় আইন, তেমনি অন্যান্য বহু 'জনগণের সর্বনাশা সিদ্ধান্তকে', সিসেরোর কথায়, 'আইন আর বলা চলে না, ওটা সাধারণ সম্মতিক্রমে দস্যুদের গৃহীত সিদ্ধান্ত'।

কোনো একটা রাষ্ট্রে গ্রহণীয় আইনের হওয়া উচিত শুধু ন্যায়পরায়ণই

নয়, সেখানে প্রচলিত ব্যবস্থা, পূর্বপুরুষদের ঐতিহ্য ও রীতিনীতির সঙ্গেও সঙ্গতিপূর্ণ। আইনের ভূমিকায় (প্রস্তাবনায়) বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছেন সিসেরো (প্লেটোর প্রভাবে), কেননা 'আইনের প্রকৃতিই হল কাউকে কিছু বোঝানো, বলপ্রয়োগে বা ভয় দেখিয়ে সবাইকে বাধ্য করা নয়'। এরূপ প্রস্তাবনার উদ্দেশ্য হল আইনের ঐশ্বরিক প্রামাণিকতাকে দৃঢ় করা, এবং লোকের কর্তব্য পালন ও আইন-শৃঙ্খলাভঙ্গ নিবারণের স্বার্থে ঐশ্বরিক শাস্তির ভয়কে কাজে লাগানো।

ন্যায়পরায়ণ আইন সম্পর্কে নিজের সাধারণ ধারণাকে সিসেরো মূর্ত নির্দিষ্ট করেছেন ধর্ম আর ম্যাজিস্ট্রেট (শাসক) সম্পর্কিত তাঁর আইনের খসড়ায়। তাতে তিনি এই আইনগুলির বিশ্বজনীন চরিত্রে জোর দিয়ে লিখেছেন: 'আমরা আইন প্রণয়ন করি কেবল রোমক জনগণের জন্য নয়, সমস্ত সাধু ও দৃঢ় আত্মার জনগণের জন্যও'।

রাষ্ট্রীয় ক্রিয়াকলাপের আইনী নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কে একগুচ্ছ গুরুত্বপূর্ণ প্রস্তাব আছে ম্যাজিস্ট্রেট বিষয়ক আইনে। যেমন, সিসেরো বলেছেন যে পদাধিকারী ব্যক্তিদের ক্ষমতা হওয়া উচিত আইনসিদ্ধ। তিনি উল্লেখ করেছেন, নির্দিষ্ট করা উচিত 'শুধু ম্যাজিস্ট্রেটদের জন্য তাদের কর্তৃত্বের পরিমাণই নয়, নাগরিকদের জন্য তাদের বশ্যতার পরিমাণও। আজ যে বিচক্ষণতার সঙ্গে আদেশ দিচ্ছে, শীঘ্র অথবা পরে তাদের উচিত আদেশ মানা, আর যে বাধ্যের মতো বশ্যতা মানছে, শীঘ্র অথবা পরে সে আদেশ দিতে শুরু করার যোগ্য।'

সূত্রবদ্ধ করা হয়েছে গুরুত্বপূর্ণ একটি আইনী নীতি: 'আইনের ক্রিয়াধীন হতে হবে সবাইকে'।

আইন বিষয়ে সিসেরোর মতবাদে স্বাভাবিক বিধি ও জারি করা আইনের মধ্যে পার্থক্যের সঙ্গে সঙ্গে জারি করা আইনকেও ভাগ করা হয়েছে ব্যক্তিগত (নাগরিক) ও সর্বসাধারণীয় আইনে। তথাকথিত 'জনগণের আইনকে' তিনি ব্যাখ্যা করেছেন অংশত বিভিন্ন জনগোষ্ঠী প্রবর্তিত ইতিবাচক আইন হিশেবে, অংশত আন্তর্জাতিক আদানপ্রদানের স্বাভাবিক বিধি (অর্থাৎ আন্তর্জাতিক স্বাভাবিক বিধি) হিশেবে। আন্তর্জাতিক চুক্তিতে যেসব দায়দায়িত্ব অর্পিত হয় তা পালনকে তিনি আন্তর্জাতিক আইনের একটা মূল নীতি বলে সূত্রবদ্ধ করেছেন। ন্যায় ও অন্যায় যুদ্ধের মধ্যে পার্থক্য টেনে তিনি বলেছেন যে তেমন সমস্ত যুদ্ধই অন্যায় ও অসাধু যা 'ঘোষিত হয় নি'। যুদ্ধকে তিনি বলেছেন বাধ্য হয়ে করা একটা কাজ, তা

অনুমোদনীয় কেবল শান্তিপূর্ণ আলাপ-আলোচনা ব্যর্থ হলে। ন্যায় যুদ্ধের কারণ হিশেবে তিনি রাষ্ট্র রক্ষার প্রয়োজনীয়তা এবং লক্ষ্য হিশেবে শান্তি স্থাপনের উল্লেখ করেছেন। বন্দী ও পরাজিতদের প্রতি মানবিক আচরণের নির্দেশ দিয়েছেন তিনি।

আন্তর্জাতিক আইনের ক্ষেত্রে ঐতিহাসিক দিক দিয়ে প্রগতিশীল এইসব ভাবনায় মূল্য দিলেও কিন্তু মনে রাখা উচিত যে সিসেরো রোমের দিগ্বিজয়ী যুদ্ধ এবং তার বিশ্ব আধিপত্যের দাবির প্রতি অনুমোদনের মনোভাব নিয়েছেন।

রাষ্ট্র ও আইন সম্পর্কে সিসেরোর মতবাদ সমেত তাঁর সৃজনশীল উত্তরাধিকার পরবর্তী সমস্ত মানবিক সংস্কৃতির ওপর প্রভূত প্রভাব বিস্তার করেছে। তাঁর রচনাগুলি হয়ে উঠেছিল রোমক (স্টোইক, ব্যবহারশাস্ত্রী, ঐতিহাসিক) ও খ্রিস্টীয় (লাকটানটিয়াস, অগাস্টিন প্রভৃতি) লেখকদের মনোযোগের কেন্দ্র। রেনেসাঁস যুগের মনীষীরা এবং পরবর্তীকালে ফরাসি জ্ঞানপ্রচারকেরা ছিলেন তাঁর ধ্যানধারণার প্রতি নিবদ্ধদৃষ্টি। তাঁর মধ্যে তাঁরা দেখেছিলেন নিজেদের মহান পূর্বসূরী ও মানববাদীকে। মহান প্রজাতন্ত্রবাদী, মুক্তি ও ন্যায়ের জন্য যোদ্ধা হিশেবে সিসেরোর নাম ও ভাবধারার খুবই প্রতিষ্ঠা ছিল ফরাসি বিপ্লবের নায়কদের মধ্যে (মিরাবো, রোবেস্পিয়ার প্রভৃতি)।

রাজনৈতিক ও আইনী ভাবনার ইতিহাসে রাষ্ট্রের রূপ, মিশ্র শাসন, রাষ্ট্রকে জনগণের ব্যাপার ও আইনী সমাজ বলে দেখা, স্বাভাবিক বিধি, রাষ্ট্র ও অধিকারের বিষয়ী রূপে নাগরিকদের স্থান সম্পর্কে সিসেরোর বক্তব্যগুলি বহু লেখককে (টমাস আকুইনাস, হুগো গ্রটিয়াস, মঁতেস্ক্য প্রভৃতি) আকৃষ্ট করেছে। এই সমস্যাগুলি সম্পর্কে সিসেরোর বিচার নিয়ে আধুনিক বহু ভাষ্যকার মনোযোগী। তবে কিছু কিছু বুর্জোয়া লেখক তাঁর ভাবধারাকে আধুনিক রূপ দিয়ে মার্কসবাদ ও সমাজতন্ত্রের বিরুদ্ধে ভাবাদর্শীয় সংগ্রামে তা ব্যবহারের চেষ্টা করছে। যেমন, মার্কিন লেখক ফ. উইলকিন 'অমর আইনবিদ', আইন, আইনপালন ও মানবতার জন্য সংগ্রামী হিশেবে সিসেরোর প্রশংসা করে 'জনতার' আধিপত্য ও 'রাষ্ট্রীয় সমাজতন্ত্রের' প্রতি তাঁর বিরাগে উচ্ছ্বসিত হয়েছেন। আইনী রাষ্ট্রের বিভিন্ন বুর্জোয়া ধ্যানধারণাতেও ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হচ্ছে সিসেরোর তৎসংশ্লিষ্ট উক্তি।

রোমক স্টোইসিজমের প্রধান প্রতিনিধি হলেন লুসিয়াস অ্যানিয়াস সেনেকা (৩-৬৫), এপিক্টেটাস (৫০-১৩০) এবং মার্কাস অরিলিয়াস অ্যাণ্টনিনাস (১২১-১৮০)। তাঁদের সাধারণ তাত্ত্বিক ধ্যানধারণা ছিল প্রাচীন গ্রীক স্টোইকদের (জেনো, ক্লিসিপাস, পানেটি, পসিডোনিয়াস প্রভৃতি) দার্শনিক, নৈতিক ও রাজনৈতিক-আইনী ধারণার প্রভাবোদ্ভূত। রোমক স্টোইকদের রচনাবলি বিকশিত হয় আগেকার নগর-রাষ্ট্রিক ভাবাদর্শের মূল্যবোধে সংকট, প্রিন্সেপস্ (সেনেটপ্রধান) এবং সিজারবাদের ক্ষমতা বৃদ্ধি, রোম সাম্রাজ্যের বিশ্ব শক্তিতে পরিণতির পরিস্থিতিতে। এই অবস্থায় রোমক স্টোইকরা প্রাচীন গ্রীক স্টোইকদের চেয়ে বেশি পরিমাণে অদৃষ্টবাদ ও রাজনৈতিক নিষ্ক্রিয়তা, নির্জাতীয়তা আর নৈতিক আত্মোন্নতির ব্যক্তিগত আদর্শ প্রচারের দিকে ঝোঁকে।

সেনেকা ছিলেন সিনেটার, সম্রাট নেরোর শিক্ষক, জনৈক বিশিষ্ট রাষ্ট্রনায়ক, তাঁরই রাজনৈতিক চক্রান্তাদির পরিণাম হয় তাঁর নিষ্ঠুর, প্রতিশোধপরায়ণ শিষ্যের আদেশে আত্মহত্যায়।

অন্যান্য স্টোইকদের চেয়ে বেশি সঙ্গতিপরায়ণ সেনেকা লোকেদের সামাজিক অবস্থান নির্বিশেষে তাদের আত্মিক স্বাধীনতার পক্ষপাতী ছিলেন। তাঁর নির্দেশ অনুসারে দাসত্বের বিষয় (ও ক্রিয়াক্ষেত্র) হতে পারে কেবল লোকের দৈহিক ও ইন্দ্রিয়নির্ভর অংশ, তার আত্মিক ও বিচারবুদ্ধিগত অংশটা নয়। তিনি উল্লেখ করেছেন: 'যে লোক ভাবে যে দাসত্ব ব্যক্তির সর্বাঙ্গ জুড়ে সে ভুল করছে: তার সেরা অংশ দাসত্ব থেকে মুক্ত। কেবল দেহটা প্রভুর অধীন ও অধিকারে, আত্মা নিজেই নিজের প্রভু।'

সেনেকার কথায়, দাস স্বভাবতই অন্য লোকেদের সমান, বাকি সকলের মতোই একই আত্মিক গুণ তার প্রকৃতিগত। কেনা-বেচার সম্পর্ক শুধু তার দেহ নিয়ে, কিন্তু তার স্বাধীন আত্মা নিয়ে নয়, সেটা বাণিজ্যিক লেন-দেনের মধ্যে পড়ে না। সামাজিক-রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান হিশেবে দাসপ্রথাকে অগ্রাহ্য না করলেও সেনেকা নৈতিক দিক থেকে তাকে অসিদ্ধ মনে করেছেন, দাসের মানবিক গুণাবলির পক্ষ নিয়েছেন, আত্মিক দিক থেকে সমান বিষয়ীর মতো তার প্রতি মানবিক আচরণের ডাক দিয়েছেন।

সব লোকে সমান এই অর্থেও যে তারা 'দাসত্বে পরস্পর সাথি', কেননা একইভাবে তারা নিয়তির অধীনস্থ। তিনি বলেছেন: 'দেখান আমাকে কে

কোনো না কোনো অর্থে দাস নয়! এ-লোকটা লালসার দাস, ও-লোকটা স্বার্থপরতার দাস, সে-লোকটা আত্মগরিমার দাস... স্বেচ্ছায় দাসত্বের চেয়ে কলঙ্ককর দাসত্ব আর হয় না।'

গ্রীক স্টোইকদের মতো তাঁর দৃষ্টিতেও ভাগ্য (অথবা তাঁর কাছে যা একই — ঈশ্বর, ঐশ্বরিক আত্মা, বিধাতা, প্রকৃতি, সমগ্র বিশ্ব) হল সব কারণের কারণ। ঘটনাশৃঙ্খল ভাগ্যের অনন্ত আবর্তনের অধীন। 'নিজের অপ্রত্যাবর্তনীয় পথ' বেয়ে 'ভাগ্যের নিয়ম তার কর্তব্য সম্পন্ন করে'। লোকে বিশ্ব সম্পর্ক, যার একাংশ তাদের নিজেদের সম্পর্ক, বদলাতে পারে না, পারে কেবল নির্ভয়ে দৃঢ়ভাবে ভাগ্যের অবারিত পূর্বলিখন সহ্য করে যেতে, প্রকৃতির নিয়মের ইচ্ছায় আত্মসমর্পণ করতে।

ঐশ্বরিক ও মানবিক জগৎ একই, এই স্টোইক ভাবনা থেকে এগিয়ে সেনেকা সিদ্ধান্ত টেনেছেন যে লোকে 'পরস্পর আত্মীয়', 'একই দেহের অঙ্গ': কেননা প্রকৃতি সমস্ত লোককে গড়েছে একই বস্তু থেকে এবং একই উদ্দেশ্য নিয়ে। সর্বোচ্চ কল্যাণ হল প্রজ্ঞা, সেটা আর কিছু নয়, মানব দেহে স্থাপিত ঐশ্বরিক আত্মাই। প্রজ্ঞা মানুষকে করে তোলে ঈশ্বরতুল্য। প্রজ্ঞা ছাড়াও প্রকৃতি মানুষকে দান করেছে সঙ্গপ্রিয়তা, যা রয়েছে মানবজাতির ঐক্যের ভিত্তিতে। প্রজ্ঞা ও সঙ্গপ্রিয়তার কল্যাণে লোকে অস্তিত্বের সংগ্রামে পশুর ওপর প্রভুত্ব লাভ করেছে, জয় করেছে প্রাকৃতিক ভৌতশক্তি, বাস করছে ঘনিষ্ঠ সহবসতিতে।

সেনেকার স্বাভাবিক বিধির ধারণায় 'ভাগ্যের যে বিধান' চরিত্রের দিক থেকে অমোঘ ও ঐশ্বরিক, তা প্রকৃতির সেই নিয়ম পালন করে রাষ্ট্র ও আইন সমেত সমস্ত মানবিক সৃষ্টি যার অধীনস্থ। স্বাভাবিক বিধি এক্ষেত্রে দেখা দিচ্ছে প্রাকৃতিক ঘটনা (বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের শৃঙ্খলা এবং ঘটনাধারার হেতুশৃঙ্খল) এবং একই সময়ে প্রজ্ঞার প্রয়োজনীয় নির্দেশ হিশেবে। প্রাকৃতিক শৃঙ্খলার একটা ঘটনা ও আদর্শ হিশেবে প্রজ্ঞা বিশ্ব সমগ্রের অংশরূপ মানবিক সহবসতিতেও মূর্ত। ঐশ্বরিক নীতির সঙ্গে মানবিক সম্পর্কের যে সঙ্গতি, তার ভিত্তি হল প্রজ্ঞা: মানবিক প্রজ্ঞা ঐশ্বরিক আত্মার অংশ।

সেনেকার মতে, মহাবিশ্ব হল তার স্বাভাবিক বিধি সমেত এক প্রাকৃতিক রাষ্ট্র, তার স্বীকৃতি প্রয়োজন ও প্রাজ্ঞোচিত। প্রকৃতির নিয়ম অনুসারে সমস্ত লোকেই সে রাষ্ট্রের সদস্য, তা সে মানুক বা না মানুক। পৃথক পৃথক এক-একটা রাষ্ট্র সংগঠন হল আপাতিক, তার তাৎপর্য সমগ্র মানবজাতির জন্য নয়, কেবল সীমাবদ্ধ সংখ্যক লোকেদের জন্য। সেনেকা লিখেছেন: 'দুটি রাষ্ট্র আমাদের কল্পনায় থাকা উচিত: একটাতে আছে দেবতারা ও

মানুষেরা; সেখানে আমাদের দৃষ্টি পৃথিবীর কোনো একটা কোণে সীমাবদ্ধ নয়, আমাদের রাষ্ট্রের সীমান্ত আমরা মাপি সূর্যের গতি দিয়ে। দ্বিতীয় রাষ্ট্র সেইটে যা আমাদের ওপর চাপিয়ে দিয়েছে আপতিকতা। এই দ্বিতীয় রাষ্ট্র হতে পারে এথেন্স, অথবা কার্থেজ, কিংবা অন্য কোনো নগরের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট; তা সমস্ত লোকেদের নিয়ে নয়, তাদের নির্দিষ্ট একটা গোষ্ঠী নিয়ে। এমন লোক আছে যারা একই সময়ে বৃহৎ ও ক্ষুদ্র রাষ্ট্রটির সেবা করে, এমন লোক আছে যারা সেবা করে কেবল বৃহৎটির, আবার এমন লোকও আছে যারা কেবল ক্ষুদ্রটির সেবারত।' সেনেকার ধারণায়, নৈতিক দিক থেকে সবচেয়ে মূল্যবান ও অনপেক্ষ হল 'বৃহৎ রাষ্ট্র'। প্রজ্ঞা, সুতরাং 'ভাগ্যের নিয়মের' (স্বাভাবিক বিধি, ঐশ্বরিক আত্মা) উপলব্ধির অর্থই হল আপতিকতার (কোনো একটা 'ক্ষুদ্র রাষ্ট্রে' আপতিক অন্তর্ভুক্তি সমেত) প্রতিরোধ করা, বিশ্ব বিধানের আবশ্যিকতা স্বীকার করা ও তদ্দ্বারা চালিত হওয়া। এই নৈতিক সূত্র যেমন এক-একজন ব্যক্তির ক্ষেত্রে, তেমনি তাদের সহবসতির (রাষ্ট্রের) ক্ষেত্রেও সমভাবে প্রযোজ্য।

অনুরূপ চিন্তা বিকশিত করেছেন অন্যান্য রোমক স্টোইকরা — জন্মসূত্রে দাস এপিক্টেটাস এবং সম্রাট (১৬১-১৮০) মার্কাস অরিলিয়াস অ্যাণ্টনিনাস।

ব্যক্তিগত নৈতিক উৎকর্ষসাধন এবং প্রত্যেকের জন্য ভাগ্য যে ভূমিকা নির্ধারণ করে দিয়েছে তার যথাযোগ্য পালনের আহ্বান জানাবার সঙ্গে সঙ্গে এপিক্টেটাস ঐশ্বর্যের তীব্র সমালোচনা ও দাসত্বের নিন্দা করেছেন। দাসত্বের অনৈতিকতায় জোর দিয়েছেন তিনি। এপিক্টেটাস শিক্ষা দিয়েছেন: 'নিজের জন্য তুমি যেটা চাও না, সেটা অপরের জন্য চেয়ো না। দাস হতে তোমার যদি ভালো না লাগে, তাহলে অন্যদেরও দাসত্বে নিক্ষেপ করো না। দাসের কাজ ছাড়া তোমার যদি না চলে, তাহলে সর্বাগ্রে তুমি নিজেই দাস; পুণ্য আর কলুষ যেমন একসাথে থাকতে পারে না, তেমনি স্বাধীনতা আর দাসত্বও।'

'সমতা ও সমাধিকার অনুসারে চালিত, সকলের ক্ষেত্রে সমপ্রযোজ্য আইন সমেত রাষ্ট্র এবং সর্বোপরি প্রজাদের স্বাধীনতাকে মান্য করা রাজত্ব বিষয়ে ধারণাকে' বিকশিত করেন মার্কাস অরিলিয়াস অ্যাণ্টনিনাস। 'নিজের নিকট' রচনায় তিনি উল্লেখ করেছেন, সমস্ত লোকের পক্ষে সাধারণ যে আত্মিক নীতি, তা থেকে দাঁড়ায় যে আমরা সবাই চৈতন্যবান জীব। 'যদি তাই হয়', — লিখেছেন সম্রাট-স্টোইক, — 'তাহলে কর্তব্য অকর্তব্যের আদেশ দেয় যে চৈতন্য, তাও সাধারণ; যদি তাই হয়, তাহলে আইনও সাধারণ; যদি তাই হয়, তাহলে আমরা নাগরিক। সুতরাং আমরা কোনো একটা নাগরিক

ব্যবস্থার শরিক, আর বিশ্ব হল নগরের অনুরূপ। কেউ কি অন্য এমন কোনো ব্যবস্থা দেখাতে পারে সমগ্র মানবজাতিই যার শরিক? এখান থেকেই, এই নগরটা থেকেই আমরা পেয়েছি আত্মিক সূত্র, চৈতন্যও, আইনও।'

মার্কাস অরিলিয়াস বলেছেন, সমগ্রের আত্মা দাবি করে আদান-প্রদান, কিন্তু এলোমেলো নয়, বিশ্বের সুশৃঙ্খলার অনুরূপ। এই থেকেই আসে বিশ্বের সর্বত্র '(নিয়ম) পালন ও সমন্বয়' এবং লোকেদের মধ্যে ('সবচেয়ে উন্নত জীব') 'একচিন্তাশীলতা', স্টোইক দর্শন তার অর্জনে চেষ্টিত।

গ্রীক ও রোমক স্টোইকদের কিছু কিছু ভাবনা (বিশেষ করে, তাদের সমর্থিত ব্যক্তিস্বাধীনতা ও স্বাভাবিক-বিধিগত প্রস্তাব) প্রভাব ফেলেছিল রোমের ব্যবহারশাস্ত্রজ্ঞদের দৃষ্টিভঙ্গির ওপরেও।

*

প্রাচীন রোমে আইনের ব্যাপারটা ছিল পণ্টিফেক্সদের, যাজক মহাবিদ্যালয়ের আচার্যদের হাতে। প্রতি বছর তাদের একজন আইনের প্রশ্নে মহাবিদ্যালয়ের মত জানাত। খিঃ পূঃ ৩ শতক নাগাদ ব্যবহারশাস্ত্র পণ্টিফেক্সদের হাত থেকে মুক্ত হয়, কিংবদন্তি অনুসারে, তার শুরুটা গ্নেইয়াস ফ্লাভিয়াসের নামের সঙ্গে জড়িত। তিনি ছিলেন মুক্তিপ্রাপ্ত দাস এবং বিশিষ্ট রাষ্ট্রীয় কর্মকর্তা আপ্পিয়াস ক্লাভডিয়াস সেকাসের কেরানি। এই শেষোক্ত জন যেসব ব্যবহারশাস্ত্রীয় সূত্র সংকলন করেছিলেন, আইন অনুসারে মামলায় (legis actiones) যা ব্যবহার্য, সেটা তিনি চুরি করে প্রকাশ করে দেন। এটার নাম হয় jus civile Flavianum (ফ্লাভিয়াসের নাগরিক আইন)।

খিঃ পূঃ ২৫৩ সালে প্লিবিয়ানদের মধ্যে থেকে প্রথম সর্বোচ্চ পণ্টিফেক্স তিবেরিয়াস করুনকান্নি শিষ্যদের সমক্ষে ব্যবহারশাস্ত্রীয় প্রশ্নের বিচার ও খোলাখুলি নিজের মত প্রকাশ করতেন, এতে করে তিনি ব্যবহারশাস্ত্রের সাধারণ অধ্যয়নের পথ করে দেন।

খিঃ পূঃ ২য় শতকে বিশিষ্ট রাষ্ট্রীয় কর্মকর্তা সেকস্ট এলিয়ান পেট ফ্লাভিয়াসের সংকলনের পরিপূরণ করেন দাবি-দাখিলার নতুন সূত্র দিয়ে (jus Aelianum)। আরেকটা পুস্তকও তিনি প্রকাশ করেন যাতে তিনি ব্যবহারজীবীদের মন্তব্য ও দাবি-দাখিলার সূত্র সংযুক্ত করে দ্বাদশ ধারার আইন উপস্থিত করেন।

খিঃ পূঃ ২য় শতকের মাঝামাঝি ব্যবহারশাস্ত্র, বিশেষ করে নাগরিক

আইন সম্পর্কিত চিন্তার ক্ষেত্রে বিশেষ অবদান যোগ করেন ম. মানিলিয়াস, প. ম্ংসি স্ংসেভোলা ও ম. ইউনিয়াস ব্রুটাস। ব্যক্তিগত ও সর্বসাধারণীয় আইন নিয়ে লেখেন ক. এলিয়াস টুবেরন।

আইনগত প্রশ্নের মীমাংসায় ব্যবহারশাস্ত্রজ্ঞদের কাজে ছিল তিনটি ভাগ: ১) respondere — লোকেদের ব্যক্তিগত আইন জিজ্ঞাসার উত্তর, ২) cavere — চুক্তি সম্পাদনে প্রয়োজনীয় স্ত্রের বিবরণ ও সাহায্য, ৩) agere — বিচারালয়ে মামলা চালনার জন্য স্ত্রের বিবরণ। ব্যবহারশাস্ত্রজ্ঞরা মামলার ব্যাপারে তাঁদের মতামত গ্রথিত করেছিলেন বিচারকের কাছে লিখিত আবেদন রূপে কিংবা এমন দলিল হিশেবে যাতে থাকত মৌখিক পরামর্শ এবং রচিত হত সাক্ষীদের উপস্থিতিতে। বলবৎ আইনাদির ওপর ভিত্তি করে (সাধারণ আইন, দ্বাদশ ধারার আইন, জনসভার বিধান, ম্যাজিস্ট্রেটদের আজ্ঞা ও সম্রাটদের সংবিধান) ব্যবহারশাস্ত্রজ্ঞরা কোনো একটা মামলাকে বিচার করতেন ন্যায়ের দাবির প্রেরণায় (aequitas) এবং তাতে সংঘাত বাধলে প্রায়ই প্রনো আদর্শকে বদলাতেন ন্যায় এবং ন্যায্য আইন (aequum jus) সম্পর্কে নতুন ধ্যানধারণার আলোয়। ব্যবহারশাস্ত্রীদের পক্ষ থেকে আইনের এরূপ রূপান্তরিত (এবং প্রায়ই নবপ্রণীত) ব্যাখ্যার উদ্দেশ্য ছিল আইনের বয়ানের এমন স্ত্রায়ণের সন্ধান যাতে পরিবর্তমান পরিস্থিতিতে ন্যায়পরায়ণ বিধানদাতাই পাওয়া যায়। আইনী ব্যাপার-স্যাপারে নতুন ভাষ্যের প্রচলন হয় তাতে (সর্বাগ্রে তার য্ক্তিবিস্তার ও রচয়িতার প্রতিষ্ঠার কারণে), স্চিত হয়েছিল আইনের নতুন আদর্শ, jus civile (নাগরিক আইন) হিশেবে তার বিষয়বস্তুর স্বীকৃতি, সংকীর্ণ ও বিশেষ অর্থে তাতে বোঝাত ব্যবহারশাস্ত্রীদের আইন এবং ব্যাপক অর্থে সাধারণ আইন ও জনসভার আইনপ্রণয়নও তার মধ্যে পড়ত। ব্যবহারশাস্ত্রীদের আইনরূপান্তর ক্রিয়াকলাপে রোমক আইনের বিভিন্ন উৎসের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত হয় এবং তার পরবর্তী বিকাশ ও নবায়নে স্থায়িত্ব ও নমনীয়তাকে মেলাতে পারা যায়।

রোমক ব্যবহারশাস্ত্রের শ্রীব্দ্ধি ঘটে প্রজাতন্ত্রের শেষ পর্বে এবং বিশেষ করে সাম্রাজ্যের প্রথম আড়াই শত বছরে। প্রথম দিকের সম্রাটরাই (প্রিন্সেপস্) প্রভাবশালী ব্যবহারশাস্ত্রের সমর্থন নিয়ে বেঁচে যাবার চেষ্টা করত এবং যথাসম্ভব নিজেদের স্বার্থে তাকে কাজে লাগাতে চাইত। এই উদ্দেশ্যে অগস্টাসের আমলেই বিশিষ্ট ব্যবহারশাস্ত্রীরা সম্রাটের নামে উত্তর দেবার অধিকার (jus respondendi) পান। এইরূপ জবাবের খ্বই প্রতিষ্ঠা ছিল

এবং ক্রমে ক্রমে (প্রিন্সেপসের ক্ষমতা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে, আগে যেটা বিধানদাতা ছিল না) তা বিচারকদের পক্ষে অবশ্যকরণীয় হয়ে দাঁড়ায় আর তৃতীয় শতকে ক্লাসিক-ব্যবহারশাস্ত্রীদের এক-একটা বক্তব্য খোদ বিধিরই বয়ান হিশেবে উদ্ধৃত হতে থাকে।

তৃতীয় শতকের দ্বিতীয়ার্ধ থেকে রোমক ব্যবহারশাস্ত্রের অবক্ষয় শুরু হয়, এর বড়ো একটা কারণ ছিল এই যে রোমক সম্রাটেরা আইনদানের ক্ষমতা হস্তগত করতে থাকায় ব্যবহারশাস্ত্রীদের আইনসৃজনী ক্রিয়াকলাপ বন্ধ হয়ে যায়। ডিয়োক্লেটিয়ানের সময় থেকে সম্রাটেরা সীমাহীন আইনপ্রণয়নী ক্ষমতা পেয়ে ব্যবহারশাস্ত্রীদের jus respondendi অধিকার নাকচ করে। অবশ্য নতুন পরিস্থিতিতেও ক্লাসিকাল পর্বের ব্যবহারশাস্ত্রীদের বক্তব্যের প্রতিষ্ঠা বজায় ছিল।

ক্লাসিকাল পর্বের বহুসংখ্যক প্রখ্যাত ব্যবহারশাস্ত্রীদের মধ্যে সবচেয়ে বিশিষ্ট হলেন গাইয়াস (২য় শতক), পাপিনিয়ান (২য়-৩য় শতক), পল (২য়-৩য় শতক), উলপিয়ান (২য়-৩য় শতক) এবং মডেস্টিনাস (২য়-৩য় শতক)। ব্যবহারশাস্ত্রীদের বক্তব্যের নজির দেয়া সম্পর্কে তৃতীয় ভালেন্টিনিয়ানের একটি বিশেষ বিধিতে (৪২৬ সালে)) এই পাঁচজন ব্যবহারশাস্ত্রীর উক্তিকে আইনের মর্যাদা দেয়া হয়। তাঁদের মতামতের মধ্যে পার্থক্য দেখা দিলে সিদ্ধান্ত নেয়া হত অধিকাংশের ভোটে আর সেটাও অসম্ভব হলে পাপিনিয়ানের মতই গ্রাহ্য বলে ধরা হত। এই পাঁচজন ব্যবহারশাস্ত্রীর রচনায় অন্য যেসব ব্যবহারশাস্ত্রীর বক্তব্য উদ্ধৃত হয়েছে উক্ত বিধিতে তাদেরও বক্তব্যের গুরুত্ব স্বীকার করা হয়েছে। এই ধরনের ব্যবহারশাস্ত্রীদের মধ্যে বিশেষ করে বলা হয়েছে সাবিনাস, স্ৎসেভোলা, ইউলিয়ান ও মার্সেলাসের কথা।

ইউস্টিনিয়ান যে রোমক আইনকে কোডবদ্ধ করেন (Corpus juris civilis) তার একটা গুরুত্বপূর্ণ অংশ হল রোমক ব্যবহারশাস্ত্রীদের রচনা। সংহিতাটি কয়েকটি ভাগে বিভক্ত: ১) ইনস্টিটিউশন, অর্থাৎ প্রাথমিক অধ্যয়নের জন্য রোমক আইনের মূলকথার ওপর আলোকপাত (এ অংশের জন্য ব্যবহৃত হয়েছে গাইয়াসের 'ইনস্টিটিউশন', তথা উলপিয়ান, ফ্লোরেন্টিনাস ও মার্শিয়ানাসের রচনাও; ২) ডাইজেস্ট (অথবা পান্ডেক্ট), অর্থাৎ ৩৮ জন রোমক ব্যবহারশাস্ত্রীর (খ্রিঃ পূঃ ১ম শতক থেকে খ্রিঃ ৪র্থ শতক) রচনা থেকে উদ্ধৃতি, তবে পাঁচজন প্রখ্যাত ব্যবহারশাস্ত্রীর রচনার চুম্বকই হল এ ডাইজেস্টের অংশের ৭০ শতাংশ; ৩) ইউস্টিনিয়ানের কোড (সম্রাটের

সংবিধানের সংকলন)। ডাইজেস্ট সংরচন সমেত কোডবন্ধনের এই বিপুল কাজ পরিচালনা করেন ৬ষ্ঠ শতকের খ্যাতনামা ব্যবহারশাস্ত্রী ট্রিবোনিয়ান। মনে রাখা দরকার যে সর্বাগ্রে রোমক ব্যবহারশাস্ত্রীদের রচনা সংকলনের দরুনই ইউস্টিনিয়ানের কোড আইনের ইতিহাসে একটা প্রধান স্থান পেয়েছে।

রোমক ব্যবহারশাস্ত্রীদের ক্রিয়াকলাপ চালিত ছিল প্রধানত আইনী কাজকর্মের প্রয়োজন মেটানো এবং আইনী আদান-প্রদানের পরিবর্তিত দাবির সঙ্গে আইনের চলতি নিরিখগুলিকে খাপ খাওয়াবার লক্ষ্যে। সেই সঙ্গে নিজেদের টীকা ও মূর্ত-নির্দিষ্ট ব্যাপারের জবাব দিয়ে, তথা পাঠ্যপুস্তক ধরনের রচনায় (ইনস্টিটিউশন ইত্যাদি) তাঁরা একসারি সাধারণ তাত্ত্বিক বক্তব্যে উপস্থিত হয়েছেন। একথা সত্যি যে সাধারণ আইনী নীতির সূত্রায়ণ ও সংজ্ঞায় রোমক ব্যবহারশাস্ত্রীরা খুব সন্তর্পণে এগিয়েছেন, মূর্ত-নির্দিষ্ট আইনী প্রশ্নের বিশদ ও খুঁটিনাটি আলোচনাই পছন্দ করেছেন এবং কোনো একটা সাধারণীকরণ করেছেন কেবল এরই ভিত্তিতে। এই থেকেই সেই সুবিদিত প্রবচন 'সমস্ত সংজ্ঞাই বিপজ্জনক' যা ১ম-২য় শতকের ব্যবহারশাস্ত্রী ইয়াভোলেনের উক্তিতে স্থান পেয়েছে: 'নাগরিক আইনে সমস্ত সংজ্ঞাই বিপজ্জনক, কেননা এমন ঘটনা কম যেখানে তা বানচাল হতে পারবে না'।

সাধারণ প্রস্তাব (নিয়ম, regulae) সূত্রায়ণে এরূপ সাবধানতা নির্দিষ্ট একটা আইনী প্রসঙ্গে এই কারণেও অবলম্বিত হয়েছে যে ব্যবহারশাস্ত্রীদের ঐ ধরনের সামান্যীকরণ (নিয়ম) সাধারণ আইনী নিরিখ, নিয়ম ও নীতির তাৎপর্য লাভ করত, অর্থাৎ তাত্ত্বিক সূত্রায়ণের সাক্ষাৎ ব্যবহারিক-আইনী তাৎপর্য ছিল এত বেশি যে ব্যবহারশাস্ত্রীদের কাছ থেকে খুবই সতর্কতা দাবি করত।

প্রাচীন রোমের আইনী চিন্তার আদি পর্যায়ে প্রচলিত ধর্মীয় ধারণা অনুসারে আইনকে মনে করা হত ঈশ্বরপ্রদত্ত কিছু একটা এবং তাকে চিহ্নিত করা হত fas শব্দটা দিয়ে। পরে fas থেকে স্বতন্ত্র হয়ে ঐহিক, মানবিক আইনের নাম দেয়া হয় jus, তাতে বোঝা হত যেমন স্বাভাবিক বিধি (jus noturale) নিয়ে সাধারণ আইন, তেমনি আইনী মতবাদের পরবর্তী ইতিহাসে (কিন্তু খোদ রোমক ব্যবহারশাস্ত্রে নয়) যা-কিছুকে অভিহিত করা হয়েছে পজিটিভ (জারি করা) আইন বলে, তেমন সবই — সাধারণ আইন, বিধি (lex), ম্যাজিস্ট্রেটদের ফরমান, সিনেটের সিদ্ধান্ত, ব্যবহারশাস্ত্রীদের আইন, প্রিন্সেপস্‌দের নির্দেশ, সম্রাটের সংবিধান ইত্যাদি।

সাধারণ আইনের মধ্যে স্বাভাবিক বিধিকে অন্তর্ভুক্ত করার বাস্তবতা স্বীকৃতি, অথচ সেইসঙ্গে রোমক আইনে পজিটিভ আইন (স্বাভাবিক বিধির নাকচ, তার একটা বিপরীত হিশেবে) বিষয়ে সজ্ঞান না থাকার অর্থ এই দাঁড়িয়েছে যে রোমক ব্যবহারশাস্ত্রীদের ভাষ্যে স্বাভাবিক বিধি, তথা তাঁদের কাছে স্বীকৃত অন্য সমস্ত আইনই বলবৎ আইনের সঙ্গে সম্পর্কিত; তার বিশেষ একটা অঙ্গ (সাধারণভাবেই আইনের অঙ্গ ও ধর্ম)।

রোমক ব্যবহারশাস্ত্রীরা আইনের যেভাবে বিভিন্ন ভাগবিভাগ করেছেন ও সংজ্ঞা দিয়েছেন, তাতে এই ব্যাপারটা পরিষ্কার ফুটে ওঠে। সমগ্র আইনকে সর্বসাধারণীয় ('রোমক রাষ্ট্রের অবস্থা নিয়ে') এবং ব্যক্তিগত ('এক-একজন ব্যক্তির লাভ নিয়ে') এই দুই ভাগে উলপিয়ানের যে বিভাগ ক্লাসিক হয়ে দাঁড়িয়েছে, সে প্রসঙ্গে তিনি বলেছেন যে 'ব্যক্তিগত আইন তিন অংশে বিভক্ত, কেননা স্বাভাবিক বিধান, জনগণের বিধান ও নাগরিক বিধান নিয়ে তা গঠিত'। উক্ত 'অংশগুলি' আইনের বিচ্ছিন্ন ও স্বায়ত্তাধীন কোনো বিভাগ নয়, বরং পরস্পরের ওপর সক্রিয় ও প্রভাবক উপাদান ও ধর্ম, যা সমগ্রভাবে বাস্তবে বলবৎ আইনে তাত্ত্বিকভাবে পৃথক করা সম্ভব।

আইনের বিভিন্ন অঙ্গ (অংশ) যে পারস্পরিক অনুপ্রবিষ্ট, সমগ্র আইন থেকে তাদের 'বিশুদ্ধ' বিভাগ ও তীক্ষ্ন স্বাতন্ত্র্য যে সম্ভব নয়, সে কথায় স্বয়ং উলপিয়ানই জোর দিয়েছেন। তিনি লিখেছেন: 'নাগরিক আইন স্বাভাবিক বিধি অথবা জনগণের আইন থেকে পুরোপুরি বিভক্ত হতে পারে না। আমরা যদি সাধারণ আইনে কিছু একটা যোগ করি অথবা তা থেকে কিছু বাদ দিই, তাহলে আমরা সৃষ্টি করব আমাদের নিজস্ব আইন, অর্থাৎ নাগরিক আইন। এভাবে আমাদের আইন হল গ্রীকদের মতো হয় জারি করা, নয় জারি না করা: আইনগুলোর কোনোটা জারি করা, কোনোটা জারি না করা।'

স্বাভাবিক বিধির দাবি ও ধর্ম শুধু নাগরিক আইন নয়, জনগণের আইনকেও (jus gentium) ভেদ করে যায়, তাতে সূচিত হয় সমস্ত জনগণের পক্ষে সাধারণ একটা আইন, সেইসঙ্গে অংশত আন্তর্জাতিক আদানপ্রদানের আইনও। তিনি উল্লেখ করেছেন: 'জনগণের আইন হল সেইটে যা মানবজাতির লোকেরা ভোগ করে; স্বাভাবিক বিধি থেকে তার পার্থক্য সহজেই বোঝা যায়: স্বাভাবিক বিধি হল জীবিত সমস্ত প্রাণীর পক্ষে সাধারণ আর দ্বিতীয়টা সাধারণ কেবল লোকেদের নিজেদের মধ্যে সম্পর্কের ক্ষেত্রে'।

এতে করে উলপিয়ানের কাছে জনগণের আইন দাঁড়াচ্ছে স্বাভাবিক বিধির অংশ, তদ্‌পরি তাদের মধ্যে পার্থক্য টানা হচ্ছে তাদের ধর্ম ও গ্‌ণ অন্‌সারে নয়, তাদের অন্তর্গত বিষয়ীর পরিসর দিয়ে (সমস্ত জীবিত প্রাণী নাকি কেবল লোকেরা)। তাঁর মতে, স্বাভাবিক বিধি 'প্রকৃতি শিখিয়েছে সমস্ত জীবিত প্রাণীকে, কেননা এটা (শ্‌ধ্‌) মানবজাতির প্রকৃতিগত নয়, মাটিতে, সম্‌দ্রে যত জীব জন্ম নেয়, তথা পাখিদের পক্ষেও এটা সাধারণ। এক্ষেত্রে পড়ে প্‌র্‌ষ ও নারীর মিল যাকে আমরা বলি বিবাহ, এর মধ্যে পড়ে শিশ্‌র জন্ম, তার লালনপালন; আমরা দেখি যে পশ্‌রাও, এমনকি বন্যরাও এ আইনের অভিজ্ঞতা রাখে।' এ থেকে পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে যে, উলপিয়ানের মতে, মানবসমাজেও বিবাহ, শিশ্‌পালন ইত্যাদি প্রথাও লোকের প্রকৃতিগত স্বাভাবিক বিধির অন্তর্গত এবং বলাই বাহ্‌ল্য এতে স্বাভাবিক বিধির দাবি মেনে, তদন্‌সারে ও তাদের ম্‌র্ত-নির্দিষ্ট করে-তোলা বিবাহ, পরিবার, লালনপালন ইত্যাদি বিষয়ে নাগরিক আইনের বিদ্যমানতা নাকচ হচ্ছে না।

ব্যবহারশাস্ত্রী গাইয়াসের দ্‌ষ্টিভঙ্গি থেকেও ব্যাপারটা তাই দাঁড়ায়। তিনি লিখেছেন 'আইন ও রীতিনীতি দ্বারা চালিত সমস্ত লোকেই অংশত নিজস্ব, অংশত সমস্ত লোকের পক্ষেই সাধারণ আইন ভোগ করে'। আর এই সাধারণ আইনকে তিনি বলেছেন জনগণের আইন, বনিয়াদ ও মর্মার্থের দিক থেকে তা হল স্বাভাবিক বিধি — 'স্বাভাবিক বিচারব্‌দ্ধি যে আইনে সমস্ত লোককেই ভূষিত করেছে'।

সাধারণভাবে আইনের অন্তর্নিহিত তার বিভিন্ন দিক ও ধর্মের পরস্পর সম্পর্ক ও ঐক্যের ধারণা তাত্ত্বিক দিক দিয়ে উলপিয়ান ও গাইয়াসের চেয়ে আরো যথাযথ ও পরিচ্ছন্নর্‌পে ব্যক্ত করেছেন ব্যবহারশাস্ত্রী পল। তাঁর বিচারে আইনের বিভিন্ন 'অংশের' বদলে (যেগ্‌লিকে অনিবার্যতই জড়িত করা হয়েছে তাদের বাহ্যিক, যান্ত্রিক পারস্পরিক পার্থক্যের সঙ্গে) সমগ্রভাবে যে আইন এক, তার (এবং সাধারণভাবেই সাধারণ আইন সম্পর্কে বোধের) পরস্পরসম্পর্কিত বিভিন্ন দিক ও বৈশিষ্ট্যের কথা এসেছে। তিনি লিখেছেন: ''আইন' কথাটা কতিপয় অর্থে ব্যবহৃত হয়: প্রথমত, 'আইনে' বোঝায় সর্বদাই যা ন্যায্য ও সদয় — যেমন স্বাভাবিক বিধি। অন্য অর্থে, কোনো একটা রাষ্ট্রে সকলের বা অধিকাংশের পক্ষে যা হিতকর, তাই হল 'আইন', যেমন নাগরিক আইন। আমাদের রাষ্ট্রে jus honorarium-কেও (প্রিটোরিয়ান আইন) যে আইন বলা হয়, সেটাও কম সঠিক নয়।'

মনে রাখা গুরুত্বপূর্ণ যে এই সমস্ত বিভিন্ন 'অর্থই' একই সময়ে আইনের (jus) সাধারণ বোধে বিধৃত।

রোমক ব্যবহারশাস্ত্রীরা যে স্বাভাবিক বিধিকে সমস্ত পরিণাম সহ সাধারণ আইনের সামষ্টিক বোধের অন্তর্ভুক্ত করেছেন, সেটা এসেছে আইনকে একটা নৈতিক ব্যাপার বলে তাঁদের ধারণা অনুসরণেই।

উলপিয়ান লিখেছেন: 'যারা আইন বিষয়ে অধ্যয়ন করতে চায়, তাদের সর্বাগ্রে জানতে হবে jus (আইন) কথাটা এল কোত্থেকে? এ নামকরণ হয়েছে justitia (সত্য, ন্যায়) থেকে, কেননা সেলসাস চমৎকার করে নির্ধারণ করে দিয়েছেন যে আইন হল ars (শিল্প, ব্যবহারে রূপায়ণযোগ্য জ্ঞান ও নৈপুণ্য, বিদ্যা), boni (মঙ্গল) ও aequi (সমতা ও ন্যায়)।'

রোমক ব্যবহারশাস্ত্রীদের আইন-চেতনায় aequi (এবং aequitas) সম্পর্কিত ধারণা বড়ো একটা ভূমিকা নিয়েছে এবং সেটাকে তাঁরা ব্যবহার করেছেন jus iniquum (যে আইন সমান ন্যায়ের দাবি মানে না এমন আইন)-এর বিপরীতে aequum jus (সমান ও ন্যায্য আইন)-কে খাড়া করার উদ্দেশ্যে।

Aequitas স্বাভাবিক-বিধিমূলক ন্যায়ের মূর্ত রূপ ও অভিব্যক্তি হওয়ায় তা বিদ্যমান আইনের মূল্যায়ন ও সংশোধনের মাপদণ্ড, আইনরচনায় (ব্যবহারশাস্ত্রী, প্রিটোর, সিনেট এবং আইনরচনার অন্যান্য কর্তাদের) দিশারি, আইনের ব্যাখ্যা ও প্রয়োগে নীতিসূত্রের কাজ করেছে।

শব্দতত্ত্বের দিক থেকে aequitas কথাটা সাম্য ও সমপরিমাণ বুঝিয়ে রোমের ব্যবহারশাস্ত্রে আইনবিষয়ক ব্যাপারে তার প্রয়োগে ন্যায়পরতার তাৎপর্য অর্জন করে একটা বিশেষ অর্থে (justitia কথাটার মূর্ত-নির্দিষ্টতার অর্থে), কারণ সাধারণ আইন এবং বিশেষ করে স্বাভাবিক বিধি হিশেবে ন্যায়পরতায় (justitia) থাকে — প্লেটো, আরিস্টটল, সিসেরো, স্টোইক এবং তাঁদের প্রভাবে রোমের ব্যবহারশাস্ত্রীদের দৃষ্টিভঙ্গি অনুসারে — মানবিক পারস্পরিক সম্পর্কে সমতা, সমানুপাতিকতা, সমতুল্যতার (aequi) কতকগুলি দিক।

উলপিয়ান উল্লেখ করেছেন, 'justitia (সত্য, ন্যায়পরতা) হল প্রত্যেককে তার অধিকার দেবার চিরন্তন ও নিরন্তর ইচ্ছা'। আইনী ন্যায়পরতার এই সাধারণ বোধ থেকে তিনি 'আইনের' বিস্তৃততর এই 'অনুশাসন' দিয়েছেন: 'সততার সঙ্গে জীবনযাপন, অপরের ক্ষতি না করা, যার যা প্রাপ্য প্রত্যেককে তা দেয়া'। এই অনুযায়ী ব্যবহারশাস্ত্রকেও তিনি অভিহিত করেছেন,

'ঐশ্বরিক ও মানবিক ব্যাপারের প্রজ্ঞান, ন্যায় ও অন্যায়ের চৈতন্য' বলে।

'প্রত্যেককে তার অধিকার দেবার' যে দাবি এখানে সূত্রবদ্ধ হয়েছে, সেটা শুধু রোমক ব্যবহারশাস্ত্রীদের ভাষ্যেই নয়, স্বাভাবিক-বিধির মতবাদের বহু পূর্ববর্তী ও পরবর্তী প্রবক্তাদের ভাষ্যেও স্বাভাবিক বিধির মূল নীতি। Jus aequum (jus iniquum-এর বিপরীতে) আদর্শই হল justitia (সত্য ও ন্যায়পরতা)-র দাবির বাস্তবায়ন, নির্দিষ্ট জনগোষ্ঠীর তৎকালীন বাস্তব জীবনের পরিবর্তনশীল পরিস্থিতি, দাবি ও স্বার্থের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য স্বাভাবিক বিধির (সেইসঙ্গে সাধারণ আইনেরও) প্রতিসরণ ও প্রকাশ।

সমগ্রভাবে প্রাচীন রোমক ব্যবহারশাস্ত্রীদের আইন-চেতনার চরিত্রলক্ষণ হল আইনের অ্যাক্সিওলজিকাল (মূল্যবোধাশ্রয়ী) দিকটায়, তার অন্তর্নিহিত আবশ্যিকতা ও বাধ্যবাধকতায় জোর দেয়া। বিদ্যমান যা-কিছু জারি করা আইনের মঞ্জুরি পেয়েছে তা সবই নয়, কেবল যা সমুচিত ও করণীয় তাই হল আইন। আর বাধ্যবাধকতার ক্ষেত্রে ব্যাপারটা প্রধানত অ্যাক্সিওলজিকাল (ন্যায়পরতা ও আইনের মৌল সম্পর্ক ও পারস্পরিক অনুপ্রবেশের কথা মনে রেখে)।

এই দিক থেকে পলের নিম্নোক্ত উক্তি তাৎপর্যপূর্ণ: 'বলা হয় যে অন্যায় সিদ্ধান্ত হলেও প্রিটোর বিধানদাতা, এটা (কথাটা) প্রিটোর কী করল তা নিয়ে নয়, তার ওপর কী করার ভার তাই নিয়ে'। সুতরাং এক্ষেত্রে ন্যায়পরতা (এবং তার দাবি পালন) দেখা দিচ্ছে আইন কথাটার অভিধা ও বোধের উপযোগী তার আবশ্যিক বিধায়ক দিক ও ধর্ম হিশেবে। উপযুক্ত ন্যায়পরতার সঙ্গে সঙ্গতি ছাড়া আইন (এক্ষেত্রে প্রিটোরিয়ান আইন) aequum jus হিশেবে অগ্রাহ্য, এবং তা হল jus iniquum। এই সঙ্গতিটা তাই দেখা দিচ্ছে সাধারণভাবেই আইন বলতে যা বোঝায় তার একটা আবশ্যিক দিক হিশেবে।

প্রাচীন রোমক ব্যবহারশাস্ত্রীদের দৃষ্টিভঙ্গি অনুসারে আইন (jus) বোধের এই কর্তব্যের দিকটা আইনের সমস্ত উৎসেই পরিব্যাপ্ত, বিধিও (lex) তার অন্তর্গত। এই থেকেই রোমক ব্যবহারশাস্ত্রীরা বিধির যে সংজ্ঞা দিয়েছেন তার অনেকগুলিরই বৈশিষ্ট্য হল বিধির মূল্যবোধাত্মক সারবস্তা, আদর্শরূপে কর্তব্য, আবশ্যিক প্রজ্ঞা ও সাধারণভাবে তাৎপর্যময়তায় গুরুত্ব অর্পণ (কোনো একটা ক্ষমতা-সংস্থার বাধ্যতামূলক নির্দেশ হিশেবে নিতান্ত তার বাহ্যিক-আনুষ্ঠানিক সংজ্ঞায় নয়)।

যেমন, পাপিনিয়ান বিধির এই সংজ্ঞা দিয়েছেন: 'বিধি হল অনুজ্ঞা,

প্রাজ্ঞ পুরুষদের সিদ্ধান্ত, ইচ্ছাকৃত বা অজ্ঞাতসারে কৃত অপরাধ দমন, রাষ্ট্রের সাধারণ প্রতিশ্রুতি'। পরবর্তী কালের আরো বিমূর্ত ভাষায় বলা যেতে পারে যে বিধির উক্ত সংজ্ঞায় তার সর্বনির্দেশাত্মকতা, বিচার-বুদ্ধি, সামাজিকতা (অপরাধবিরোধিতা), সাধারণ-রাষ্ট্রিক চরিত্রও (বিধির ওপর রাষ্ট্র রক্ষার দায়িত্ব এবং খোদ রাষ্ট্র কর্তৃক বিধি পালন ও তার পবিত্রতা, উভয় অর্থেই) এসে গেছে।

গ্রীক বাগ্মী ডেমোস্থিনিসের নিম্নোক্ত সংজ্ঞার সঙ্গে একমত মার্সিয়ানাস বিধির যে সংজ্ঞা দিয়েছেন তার বিষয়বস্তুও অনুরূপ: 'বিধি তাই, যা বিভিন্ন কারণে লোককে মানতে হবে, কিন্তু প্রধানত এই কারণে যে, সমস্ত বিধিই হল ঈশ্বরের ভাবনা (উদ্ভাবনা) ও দান, প্রাজ্ঞ ব্যক্তিদের সিদ্ধান্ত, ইচ্ছাকৃত অথবা অনিচ্ছাকৃত অপরাধ দমন, জনগোষ্ঠীর সাধারণ সম্মতি, তদন্তর্ভুক্তদের যা পালন করা উচিত।'

বিধি কথাটায় যে অবশ্যপালনীয়তা নিহিত (কর্তব্য ও অকর্তব্য, নিষিদ্ধকে পৃথক করার নিরিখ-রূপ বিধি), তাকে রোমক ব্যবহারশাস্ত্রীরা ব্যাখ্যাত ও বিকশিত করেছেন স্টোইকদের অনেকখানি প্রভাবে, যাদের কাছে 'কর্তব্যের' (পালনীয়, দায়িত্ব ইত্যাদির) ভূমিকা যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ। তাছাড়া, রোমক ব্যবহারশাস্ত্রীদের সংজ্ঞায় বিধির যে একটা আদর্শায়িত ধারণা প্রকৃতিগত (কর্তব্য ও প্রজ্ঞারূপী বিধি), তাতেও স্টোইকদের ধারণা প্রতিফলিত, যারা আসলে আদর্শ স্বাভাবিক বিধিকে আইনই বলত (বিশ্বজনীন, ঐশ্বরিক, প্রাজ্ঞ, স্বাভাবিক ইত্যাদি)। রোমক ব্যবহারশাস্ত্রীদের অনেক যুক্তিতে 'বিধি' বলতে যেমন আইনের নির্দিষ্ট কোনো উৎসের (জনগণের অথবা সম্রাটের বিধি) বৈশিষ্ট্য বোঝা হত, তেমনি তার আবশ্যিক (আদর্শায়িত-আইনী, মূল্যবোধাত্মক-সারসম্বন্ধ, গুণগত) দিকগুলোও।

যেমন, স্টোইক ক্রিসিপাস প্রদত্ত বিধির এই সংজ্ঞার উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেছেন মার্সিয়ানাস: 'বিধি হল সমস্ত ঐশ্বরিক ও মানবিক ব্যাপারের রাজা; তা যেন যেমন ভালো, তেমনি মন্দদের মাথার ওপর থাকে, প্রকৃতিগতভাবেই যারা গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত তেমন সমস্ত জীবিত প্রাণীর তা যেন হয় নায়ক ও পরিচালক, ন্যায় ও অন্যায়ের মানদণ্ড; (বিধি) আদেশ দেয় তাই করবার যা সম্পন্ন করা উচিত, নিষেধ করে তা না করবার যা করা উচিত নয়'।

অধিকার ও বিধির উল্লিখিত আদর্শায়িত-আইনী গুণ সেখানেও ধরে নেয়া হয় যেখানে রোমক ব্যবহারশাস্ত্রীরা বিধির ও আইনের অন্য কোনো

উৎসের ব্যবহারশাস্ত্রীয়-টেকনিকাল বিশ্লেষণ করেছেন। যেমন, ব্যবহারশাস্ত্রী মডেস্টিনাস যখন লেখেন যে 'আইনের কাজ (শক্তি) হল: আদেশ দেয়া, নিষেধ করা, অনুমোদন করা, শাস্তি দেয়া'* তখন ধরে নেয়া হয় যে আইনী নির্দেশের এরূপ সূত্রায়ণ ও শ্রেণী বিভাগের অর্থ (ও শক্তি) থাকে ততটাই যতটা ব্যাপারটা ঠিক আইন, অর্থাৎ ন্যায় আইন নিয়েই। এই নীতিগত দিকটা পরিষ্কার করে দেখিয়েছেন ব্যবহারশাস্ত্রীরা নিজেরাই। যেমন, পল লিখেছেন: 'যা আইনের নীতি অগ্রাহ্য করে গৃহীত তা পরিণাম ক্রিয়ায় প্রসারিত হতে পারে না'। অন্য কথায়, যা আইনের নীতিবিরোধী, তা ব্যবহারশাস্ত্রে বলবৎ নয়।

একই কথা বলেছেন ইউলিয়ানও: 'যা আইনের অর্থ অগ্রাহ্য করে প্রবর্তিত হয়েছে, তাকে আমরা ব্যবহারশাস্ত্রীয় নিয়ম হিশেবে অনুসরণ করতে পারি না'।

পরে রোমক ব্যবহারশাস্ত্রীরা আইনের আদর্শ ব্যাখ্যার যেসব নিয়ম ও পদ্ধতি বিশদে সংরচন করেছিলেন, যাতে আলোচ্য উৎসের অর্থ যথাযোগ্য নির্ধারিত হতে পারে, তাতে এই ভাবনাটা আরো মূর্ত-নির্দিষ্ট রূপ পায়।

রোমের ব্যবহারশাস্ত্রীয় চিন্তার একটা গুরুত্বপূর্ণ কীর্তি হল আইনকে সর্বসাধারণী ও ব্যক্তিগততে ভাগ করা।

সর্বসাধারণী আইনের ক্ষেত্রে রোমক ব্যবহারশাস্ত্রীরা দেবালয় ও পুরোহিতদের অধিকার, রাষ্ট্রীয় সংস্থাদির (ম্যাজিস্ট্রেট) ও পদাধিকারীদের ক্ষমতা কী, ক্ষমতা (imperium), নাগরিকত্ব এবং একসারি রাষ্ট্রিক ও প্রশাসনিক প্রতিষ্ঠানের আইনে কী বোঝায় তা নির্ণয় করে। প্রজাতন্ত্র থেকে রাজতন্ত্রে উত্তরণের সময় রোমক ব্যবহারশাস্ত্রীরা সিজারবাদের আমলকে আইনবদ্ধ করা এবং সম্রাটদের আইন জারি করার অধিকার প্রমাণের জন্য কম চেষ্টা করেন নি। যেমন, সম্রাটের আজ্ঞার আইনী শক্তি সমর্থন করেন গাইয়াস। উলপিয়ানের মতেও, সম্রাটের ফরমান আইন। এই উক্তিগুলি তাঁরই: 'প্রিন্সেপস্ আইন পালন থেকে মুক্ত', 'প্রিন্সেপসের যাতে লাভ, সেটা আইনের শক্তি ধরে'। এ কথা অবশ্য মনে রাখা দরকার যে উলপিয়ানের প্রথম উক্তিটা একটা সাধারণ প্রতিপাদ্য নয়, তার একটা বিশেষ প্রসঙ্গ ছিল, মুক্তদাসের মৃত্যুর পর পেট্রনের উত্তরাধিকার সংক্রান্ত দুটি আইনের ক্ষেত্রে তা প্রযুক্ত হয়, তাই ধরে নেয়া হয়েছিল যে ঠিক এই দুটি আইন মেনে চলতে

প্রিন্সেপস্‌ বাধ্য নয় (অর্থাৎ উত্তরাধিকারীদের ফর্দ বা স্বত্ব তিনি বদলাতে পারেন)। স্বয়ং উলপিয়ানের কাছে অন্তত আলোচ্য সূত্রটিতে স্বেচ্ছাচারের (প্রিন্সেপসের) কোনো অধিকার স্বীকৃত হয় নি, যদিও তার নিজস্ব প্রসঙ্গ থেকে ছিন্ন করে নিলে তা অনেক সাধারণ ও নিঃসন্দেহে বিপজ্জনক একটা অর্থ লাভ করে।

ব্যবহারশাস্ত্রীদের অনেকেই ছিলেন সম্রাটদের আস্থাভাজন পরামর্শদাতা ও রাষ্ট্রের উচ্চ পদে অধিষ্ঠিত। তাঁদের কয়েকজন অবশ্য নিজেরাই রাজক্ষমতার বলি হয়েছেন। যেমন, উলপিয়ান প্রিটোরিয়ার প্রিফেক্ট* হিশেবে প্রিটোরিয়ানদের** স্বেচ্ছাচার ও উচ্ছৃঙ্খলতার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করতে গিয়ে কয়েকবার প্রাণনাশের মুখে পড়েন এবং ২২৮ সালে সম্রাট আলেকজান্ডার সেভেরাসের সমক্ষেই নিহত হন তাদের হাতে। এর কিছু আগে কারাকাল্লাসের আমলে ২১২ সালে মৃত্যুদণ্ড হয় পাপিনিয়ানের, ইনিও ছিলেন প্রিটোরিয়ার প্রিফেক্ট। কারাকাল্লাস তাঁর ভাই গেটাকে হত্যা করে প্রখ্যাত এই ব্যবহারশাস্ত্রীর কাছ থেকে তাঁর কর্মের অনুমোদন দাবি করেছিলেন। পাপিনিয়ান রাজি হন নি, বলেছিলেন: 'হত্যা করার চেয়ে হত্যার সমর্থন কম কঠিন নয়'।

রোমক ব্যবহারশাস্ত্রীরা বিশেষ মন দিয়েছিলেন ব্যক্তিগত আইন, সর্বাগ্রে নাগরিক আইনের সমস্যায়। ব্যবহারশাস্ত্রী গাইয়াস নাগরিক আইনকে বর্ণনা করেছেন কোনো একটা জনগোষ্ঠীতে (রোমান, গ্রীক ইত্যাদি) প্রবর্তিত (লিখিত অথবা মৌখিক ভাবে) আইন। তাঁর এই কথাটাকে পাপিনিয়ান পরিপূরিত করেছিলেন নাগরিক আইনের উৎসগুলির উল্লেখ করে: বিধি, প্লেবিসাইট, সিনেটের রায়, প্রিন্সেপস্‌দের ডিক্রি, পণ্ডিত ব্যবহারশাস্ত্রীর প্রস্তাব। 'নাগরিক আইনের পরিপূরণ ও সংশোধন' হিশেবে তিনি তার একটা উৎস বলে প্রিটোরিয়ান আইনের উল্লেখ করেছেন। এই অর্থেই মার্শিয়ানাস প্রিটোরিয়ান আইনকে বলেছেন 'নাগরিক আইনের জীবন্ত কণ্ঠ'।

নাগরিক আইনের ক্ষেত্রে রোমক ব্যবহারশাস্ত্রীরা সম্পত্তি, পরিবার, ইচ্ছাপত্র, চুক্তি, ব্যক্তির অধিকার ইত্যাদি প্রশ্ন নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। ব্যক্তিগত সম্পত্তিধর, পণ্যমালিকের স্বার্থ রক্ষার দৃষ্টি থেকে

সম্পত্তি সম্পর্কের ওপর তাঁরা যে আলোকপাত করেছেন, পুঙ্খানুপুঙ্খতায় তা বিশিষ্ট। মার্কস লিখেছেন: 'আসলে রোমানরাই **প্রথম ব্যক্তিগত মালিকানার আইন**, বিমূর্ত আইন, ব্যক্তিগত আইন, বিমূর্ত ব্যক্তিত্বের আইন রচনা করে। রোমক ব্যক্তিগত আইন হল তার ক্লাসিকাল অভিব্যক্তিতে ব্যক্তিগত আইন।'*

রোমক আইন ও ব্যবহারশাস্ত্রীদের মতবাদ অনুসারে পশু ও অন্যান্য দ্রব্যাদির সঙ্গে সঙ্গে দাসেরাও সম্পত্তির অন্তর্গত।

গাইয়াস লিখেছেন: 'ব্যক্তির আইনগত প্রতিষ্ঠায় গুরুত্বপূর্ণ পার্থক্য হল এই যে লোকেরা হয় মুক্ত, নয় দাস। মুক্তদের মধ্যেও একদল মুক্ত হয়েই জন্মেছে, অন্য দলকে মুক্তি দেয়া হয়েছে।' উলপিয়ানও একই রকম ভাগ করে যোগ দিয়েছেন যে তা ঘটেছে জনগণের আইনে, কেননা 'স্বাভাবিক বিধিতে সবাই জন্মায় স্বাধীন হয়েই'।

জনগণের আইন বলতে রোমক ব্যবহারশাস্ত্রীরা যা বুঝেছিলেন, তাতে যেমন আন্তঃরাষ্ট্রিক সম্পর্কের নিয়ম, তেমনি যারা রোমান নয়, তাদের সঙ্গে রোমক নাগরিকদের সম্পত্তিগত ও অন্যান্য চুক্তিমূলক সম্পর্কের মানদণ্ডও তার মধ্যে পড়ে। এ আইনের বড়ো একটা অংশই গড়ে উঠেছে ম্যাজিস্ট্রেটদের হুকুমনামায়, যাদের এক্তিয়ারে ছিল অরোমকদের সঙ্গে সম্পর্ক, তাছাড়া সম্রাটের সংবিধান এবং ব্যবহারশাস্ত্রীদের আইনপ্রণয়নী ক্রিয়াকলাপে। এতে করে নিশ্চিত হয় নাগরিক আইন ও জনগণের আইনের মানদণ্ডের ওপর পারস্পরিক প্রভাবপাত, জনগণের আইন পরিণত হয় রোমক আইনের এমন এক শাখায় যা রোম রাষ্ট্রের রাজনৈতিক অবস্থান এবং অরোমক জনগণ ও ব্যক্তি-বিশেষের সঙ্গে সম্পর্কের ক্ষেত্রে রোমকদের ব্যক্তিগত স্বার্থ রক্ষা করত।

যেসব প্রশ্ন জনগণের আইনের আওতায় পড়ত, সে প্রসঙ্গে গের্মোগেনিয়ান লিখেছেন: 'এই জনগণের আইন অনুসারে যুদ্ধ চালানো, জনগণকে ভাগ করা, রাজ্যের ভিত্তি স্থাপন, সম্পত্তির ভাগ-বাঁটোয়ারা, সীমান্ত, জমি নির্ধারণ, ভবন নির্মাণ, ব্যবসা-বাণিজ্য, ক্রয়-বিক্রয়, ভাড়া এবং নাগরিক আইনে যা প্রবর্তিত তা বাদে অন্যান্য কর্তব্য নির্ধারিত হয়'।

জনগণের আইনে আন্তর্জাতিক-আইন ধরনের একসারি মানদণ্ড আছে ('আন্তর্জাতিক আইন' বলে কোনো কথা রোমানদের ছিল না)। জনগণের

আইন অনুসারে সমুদ্র 'সকলের জন্য সাধারণ'। গাইয়াস এবং পম্পোনিয়াস 'শত্রু' বলতে কেবল তাকে বোঝেন যার বিরুদ্ধে রোমানরা প্রকাশ্যে যুদ্ধ ঘোষণা করেছে অথবা যে প্রকাশ্যে রোমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেছে। অঘোষিত যুদ্ধে যে প্রতিপক্ষ, তারা হল 'দস্যু ও লুঠেরা'। শত্রুর সঙ্গে সবরকম চুক্তি নিষিদ্ধ। পল এই কথায় জোর দিয়েছেন যে লোহায় শান দেবার পাথর, তথা লোহা, শস্য, লবন শত্রুর কাছে বিক্রয় করা চলবে না, অন্যথায় প্রাণদণ্ড। রোমানদের হাতে বন্দী শত্রু তার নাগরিকত্ব হারিয়ে দাস হয়। শত্রুর রাষ্ট্রদূতদের নিরাপত্তা প্রসঙ্গে পম্পোনিয়াস লিখেছেন: 'শত্রুর রাষ্ট্রদূতকে আঘাত করলে সেটাকে জনগণের আইনের বিরোধী বলে ধরতে হবে, কেননা রাষ্ট্রদূত পবিত্র বলে গণ্য। তাই কোনো জাতির দূত যদি আমাদের এখানে থাকে এবং সে জাতির বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষিত হয়, তাহলে তারা মুক্তই থাকবে, কেননা এটাই হল জনগণের আইন অনুসারী।'

রোমক ব্যবহারশাস্ত্রীদের সৃজনকর্ম পরবর্তী কালের আইনী চিন্তাকে খুবই প্রভাবিত করেছে। তার পেছনে ছিল যেমন রোমক ব্যবহারশাস্ত্রের উচ্চ সাংস্কৃতিক মান (আদ্যোপান্ত যুক্তিবিস্তার ও বিশ্লেষণ, সূত্রায়ণের সুনির্দিষ্টতা, সাধারণ-তাত্ত্বিক ও ব্যবহারশাস্ত্রীয়-টেকনিকাল ধরনের প্রচুর সমস্যাদি বিচার ইত্যাদি), তেমনি আইনের পরবর্তী ইতিহাসে রোমক আইন যে ভূমিকা নিয়েছিল, সেটাও।

স্বাধীন একটা বিদ্যা হিশেবে ব্যবহারশাস্ত্রের পুরো একগুচ্ছ বনিয়াদী প্রতিপাদ্য প্রণেতা রোমক ব্যবহারশাস্ত্রীদের সৃজনী কীর্তিতে বর্তমান কালের গবেষকরা আজো নিবদ্ধদৃষ্টি। সেটা খুবই সঙ্গত ও স্বাভাবিক অন্তত এই কারণেই যে বর্তমান কালের অনেক বোধ, পরিভাষা ও নির্মিতির উৎস হল রোমক আইন ও রোমক ব্যবহারশাস্ত্রীরা।

*

আরেলিয়াস অগাস্টিন (৩৫৪-৪৩০) ছিলেন খ্রিস্টীয় ধর্মসম্প্রদায়ের এক প্রমুখ ভাবাদর্শী। খ্রিস্টধর্ম গ্রহণের (৩৮৭) আগে তিনি ছিলেন প্রথমে সু-কু'র দ্বৈত সংগ্রামের মতাবলম্বী মানি-পন্থীদের* কাছাকাছি, পরে নাস্তিক্য, প্লেটো ও নয়াপ্লেটোপন্থীদের দর্শন, সিসেরোর রচনায় আকৃষ্ট

হন। খ্রিস্টান হবার পর তিনি 'বিরুদ্ধবাদীদের' তাড়নায় অতি সক্রিয় অংশ নেন। ৩৯৬ সাল থেকে মৃত্যু পর্যন্ত তিনি ছিলেন গিপ্পনের (উত্তর আফ্রিকা) বিশপ। খ্রিস্টান দর্শনের মূল প্রতিপাদ্যগুলি তিনি রচনা করেন। তাঁর রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি পাওয়া যাবে তাঁর 'ঐশ্বরিক নগর' গ্রন্থে।

মানবজাতির ইতিহাসের যে খ্রিস্টীয় ধারণা অগাস্টিন প্রচার করেছেন, তার ভিত্তি হল বাইবেল। সমস্ত সামাজিক, রাষ্ট্রিক, আইনী প্রতিষ্ঠান ও নির্দেশাদি হল মানবিক পাতকের পরিণাম। আদম ও ইভ, যাদের থেকে গোটা মানবজাতির সৃষ্টি, অগাস্টিনের মতে, তাদের 'মহা অপরাধের' ফল দাঁড়িয়েছে এই যে 'মানবিক স্বভাবটাই বদলে গেছে খারাপের দিকে এবং পাপ ও অনিবার্য মৃত্যু কবলিত সে স্বভাব প্রদত্ত হয়েছে বংশধরদের কাছে'। এই পাপাত্মতা স্রষ্টা-ঈশ্বরেরই অভিপ্রায়প্রসূত, মানুষকে তিনি দিয়েছেন ইচ্ছার স্বাধীনতা, অর্থাৎ ঐশ্বরিকভাবে নয়, নিজের মতো করে, মানুষের মতো দিন কাটাবার সামর্থ্য। তিনি লিখেছেন: 'মানুষ যে শয়তানের অনুরূপ সেটা এইজন্য নয় যে তার দেহ আছে যা শয়তানের নেই, সেটা এইজন্য যে সে থাকে নিজের মতো করে, মানুষের মতো... আর মানুষ যখন ঐশ্বরিকভাবে নয়, মানুষের মতো থাকে, তখন সে শয়তানের অনুরূপ।'

মানবিক স্বাধীনতায় তাই পাপে পতিত হওয়া অনিবার্য, সু ও কু, ঐশ্বরিক ও শয়তানির মধ্যে বাছবিচার করা সম্ভব নয়। 'মানুষের মতো' নয়, 'ঈশ্বরের মতো' বাস করার ইচ্ছেটাই মানুষের মনে জাগে ঐশ্বরিক কৃপায় এবং তা বর্ষিত হয় কেবল 'বরপুত্রদের ওপর'। মানুষের সমগ্র অস্তিত্বকাল যাবৎ তাদের দুই ভাগে (মানুষের মতো এবং ঈশ্বরের মতো দিনযাত্রা) ভাগ করে অগাস্টিন মন্তব্য করেছেন: 'এই বিভাগকে আমরা প্রতীক হিশেবে অভিহিত করেছি নগর বলে, অর্থাৎ লোকেদের দুটি সমাজ বলে, যাদের একটার নির্বন্ধ চিরকাল ঈশ্বরের সঙ্গে বাস করা, অন্যটা শয়তানের সঙ্গে চিরকাল দণ্ড ভোগ করবে'।

অগাস্টিন বলেছেন যে 'বিশেষ একটা ব্যবস্থা ও রীতিনীতি অনুসারে' যত লোক বাস করেছে বা করছে, তাদের সমস্ত পার্থক্য সত্ত্বেও 'মানবিক আদান-প্রদানের দুটির বেশি ধারা', দেহ আর আত্মা অনুসারে বসবাসকারী লোকেদের 'দুটি নগর' ছাড়া আর কিছু ছিল না। তিনি ব্যাখ্যা করেছেন: 'পার্থিব নগরে আমরা দুটি ধরন দেখি: একটা হল এ নগরেরই বাস্তবতা, অন্যটা এই বাস্তবতাকে কাজে লাগায় স্বর্গীয় নগর পরিকল্পনার জন্য।

পাপদুষ্ট স্বভাব জন্ম দেয় পার্থিব নগরের নাগরিকদের আর স্বভাবকে পাপমুক্ত করা কৃপা জন্ম দেয় স্বর্গীয় নগরের নাগরিকদের; একটাকে বলা হয় ঈশ্বরের ক্রোধের আধার, অন্যটাকে কৃপার আধার।'

মানবিক সমাজের কাঠামোর মধ্যে একটা বিশেষ খিস্টধর্মীয় রূপে দুটি একেবারে বিপরীত ধরনের গোষ্ঠীর যে পার্থক্য অগাস্টিন করেছেন, তাতে তাঁর উপর পূর্বসূরীদের প্রভাব প্রতিফলিত, বিশেষ করে প্লেটোর এই বক্তব্য যে প্রতি রাষ্ট্রের মধ্যে মূলত আছে দুটি রাষ্ট্র (গরিবদের ও ধনীদের); দুটি পলিস (পৃথক এক-একটা পলিসরূপ রাষ্ট্র এবং বিশ্বজনীন, মহাজাগতিক পলিস) সম্পর্কে স্টোইকদের ধারণা; সু ও কু, শয়তান ও ঈশ্বরের মধ্যে দ্বন্দ্বের মানি-পন্থীদের ভাবনা।

পার্থিব রাষ্ট্রিক-আইনী জীবনের ('পার্থিব নগরের' মধ্যে সম্পর্ক ও নির্দেশাদি) পাপদুষ্টতা, অগাস্টিনের মতে, প্রকাশ পায় 'মানুষের ওপর মানুষের' প্রভুত্বে, পরিচালনা ও আজ্ঞাধীনতার বিদ্যমান সম্পর্কে, প্রভুত্ব ও দাসত্বে। আদি পাপের পরিণাম হিশেবে গড়ে ওঠা এবং মানব প্রকৃতির পাপদুষ্টতা বজায় রাখা এই অবস্থাটাকে অগাস্টিন বলেছেন মানবিক জীবনের 'স্বাভাবিক অবস্থা'। এই অর্থে ('মানুষ অনুসারী' জীবনের জন্য) দাসত্বও হয়ে দাঁড়ায় 'স্বাভাবিক', যদিও তা ঈশ্বর কর্তৃক সৃষ্ট আদি মানবপ্রকৃতি এবং 'ঈশ্বর অনুসারী' জীবনের বিরোধী। অগাস্টিন এই কথায় জোর দিয়েছেন: 'তাহলে পাপই হল দাসত্বের প্রথম কারণ, যার দ্বারা নিজের অবস্থার দরুন মানুষ মানুষের অধীনস্থ হয়। আর এটা ঈশ্বরের রায় ছাড়া অন্য কোনোভাবে হতে পারে না, তাঁর কাছে অসত্য কিছু নেই এবং পাপীদের পাপ অনুসারে তিনি বিভিন্ন শাস্তি দিতে পারেন।' এই প্রসঙ্গে 'যুদ্ধের আইন থেকে' দাসেদের উদ্ভব বলে প্রাচীন লেখকদের মধ্যে যে ধারণা প্রচলিত ছিল, সেটাকে তিনি নিয়েছেন এবং নিজস্ব অবস্থান থেকে (প্রভুত্ব ও দাসত্বের আদি কারণ হল পাপ) পূর্বসূরীদের এই ধারণার নবভাষ্য দিয়েছেন।

পার্থিব জগতে স্বাভাবিকভাবে যে অবস্থাটা গড়ে উঠেছে, অগাস্টিন তার সমালোচনা করেছেন ঐশ্বরিক শৃঙ্খলা এবং তার পার্থিব আদিরূপ যা প্রতিফলিত হচ্ছে 'বরপুত্রদের' এ তাদের গোষ্ঠীর (খিস্টীয় গির্জা) জীবনে, তারই একটা ধর্মীয়-আদর্শায়িত অবস্থান থেকে। বিশ্বের এই পাপদুষ্ট অবস্থাটা সাময়িক, তা চলবে খিস্টের দ্বিতীয় আবির্ভাব এবং বিচারের দিন পর্যন্ত, যখন স্থাপিত হবে 'স্বর্গীয় রাজ্য', ধার্মিকরা পাবে

'দেবদূতদের জীবন' আর অধার্মিকদের 'দ্বিতীয় মৃত্যু' ঘটবে, কেননা 'সবাই আমরা অভ্যুত্থিত হব, কিন্তু সবাই পরিবর্তিত হব না'। এই প্রকল্পিত সময়টা যতদিন না আসছে, ততদিন পার্থিব সামাজিক-রাজনৈতিক ব্যবস্থাটা অগাস্টিন সমর্থন করছেন, অবশ্য এই একটা শর্ত রেখে যে তা যেন খ্রিস্টান ধর্ম ও গির্জায় বাধা না দেয়; এই শেষোক্ত ক্ষেত্রে (অর্থাৎ খ্রিস্টবিরোধী রাজনৈতিক-আইনী ব্যবস্থায়) ক্ষমতা পরিণত হয় বলপ্রয়োগে ও দস্যুদলের প্রভুত্বে। তিনি লিখেছেন: 'এই স্বর্গীয় নগর পৃথিবীতে ভ্রাম্যমাণ, তা সমস্ত জাতির সমস্ত নাগরিকদের ডাক দিচ্ছে, এবং সমস্ত ভাষায় ভ্রাম্যমাণ সমাজের লোক জমা করছে, যেসব অধিকার, আইন ও প্রতিষ্ঠানাদি দ্বারা পার্থিব জগৎ প্রতিষ্ঠিত বা রক্ষিত, তাদের মধ্যে পার্থক্যে কোনো গুরুত্ব দিচ্ছে না; এই শেষোক্তের পার্থিব জগৎ কিছুই খারিজ বা চূর্ণ করা হচ্ছে না, উল্টে বরং, সবকিছু রক্ষা ও পালন করা হচ্ছে, সেগুলি বিভিন্ন জাতির ক্ষেত্রে বিভিন্ন হলেও পার্থিব জগতের একই লক্ষ্যে চালিত, শুধু ধর্মে বাধা না দিলেই হল, এ ধর্ম একমাত্র, সর্বোচ্চ ও সত্য ঈশ্বরকে ভক্তি করতে শেখায়।'

অগাস্টিন শিক্ষা দিচ্ছেন, মানবিক পরস্পরসম্পর্কের যে স্বাভাবিক অবস্থা গড়ে উঠেছে, তাকে রক্ষা করার আদেশ দেয় সবাইকে যা চালায় সেই ঐশ্বরিক বিধাতার বিধান। তাঁর কল্পনায় পাপী মানুষের পক্ষে দাসত্ব এমনকি উপকারীই, কেননা 'লালসার দাস হওয়ার চেয়ে মানুষের দাস হওয়াও ভালো' এবং 'হীনতায় সেবকদের উপকার হয়'। 'প্রভুত্বের লালসাকে' সামান্য সমালোচনা করে এবং 'গর্ব প্রভুত্বকারীদের ক্ষতি করে' এই উপদেশ দিয়ে অগাস্টিন খ্রিস্টশিষ্য পল অনুসরণে প্রধান মনোযোগ দিয়েছেন দাসেদের ধমক দেয়ায়, 'প্রভুর কাছ থেকে তারা যদি নিজেদের মুক্তি না পায়, তাহলে তারা নিজেরাই নিজেদের দাসত্বকে খানিকটা স্বাধীন করে, কপট ভয় থেকে নয়, সত্যকার প্রবৃত্তি থেকে সেবা, যতদিন না অসত্য সরে যাচ্ছে, লোপ পাচ্ছে সর্ববিধ কর্তৃত্ব ও মানবিক প্রভুত্ব এবং সবকিছুতে থাকবে ঈশ্বর'।

ঐশ্বরিক বিধানের অনিবার্য পরিণাম হিশেবে অগাস্টিনের কাছে দাসপ্রথা আবশ্যক, আর দাসদের থাকছে এই আবশ্যিকতা ও তা সঠিকভাবে পালন করার 'স্বাধীনতা'।

শাসকদের অগাস্টিন ডাক দিয়েছেন ঐশ্বরিক বিধানের নির্বাহক হতে এবং সর্ববিধ ধর্মদ্রোহের বিরুদ্ধে গির্জার সংগ্রামে সহায়তা করতে।

প্রাচীন কালেই অগাস্টিনের মতবাদের বেশ প্রভাব ছিল। পরে রোমান-ক্যাথলিক গির্জা তাঁর বক্তব্যগুলিকে ব্যাপকভাবে কাজে লাগিয়েছে সর্বোপায়ে নিজেদের অবস্থান দৃঢ় করে ক্ষমতার জন্য নিজেদের দাবিকে সুসিদ্ধ করতে। গির্জার যে সেবা তিনি করেছেন, তার জন্য তাঁকে সেণ্ট (আশিসধন্য) বিশেষণে ভূষিত করা হয়। আজও তিনি রয়ে গেছেন খ্রিস্টান ধর্মের এক স্তম্ভ।

চতুর্থ অধ্যায়

মধ্যযুগের রাজনৈতিক মতবাদ

*

§১। সাধারণ বৈশিষ্ট্য

মধ্যযুগের রাজনৈতিক মতবাদ সামন্ততান্ত্রিক সামাজিক-অর্থনৈতিক ব্যবস্থা, সে সমাজের শ্রেণী বিন্যাসের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত। সামন্ততন্ত্রের গোটা ইতিহাস ধরে চলেছে সামন্তদের এবং তাদের অধীনস্থ জনগণের মধ্যে সংগ্রাম।

এ পর্বের প্রধান রাজনৈতিক ভাবাদর্শ হল সামন্ত শ্রেণীর ভাবাদর্শ, যার চরিত্রটা ঈশ্বরতত্ত্বীয়। পশ্চিম ইউরোপে ক্যাথলিক চার্চ হয়ে দাঁড়ায় বিদ্যমান ব্যবস্থার সর্বাধিক সাধারণ সংশ্লেষ এবং সবচেয়ে সাধারণ মঞ্জুরি।

মধ্যযুগীয় পরিস্থিতিতে 'পৃথক পৃথক শ্রেণীর স্বার্থ, প্রয়োজন ও দাবি ধর্মীয় প্রচ্ছদের আড়াল নিত'*। সামাজিক সম্পর্ককে আক্রমণ করার জন্য প্রয়োজন হয় তাদের পবিত্রতার জ্যোতি খসানো। এই কারণে, এঙ্গেলস যা বলেছেন, সমস্ত বৈপ্লবিক সামাজিক ও রাজনৈতিক মতবাদকে হতে হয় 'যুগপৎ প্রধানত ঈশ্বরতত্ত্বীয় ধৃষ্টোক্তি'**।

মধ্যযুগের বৈশিষ্ট্য হল এমন ধরনের রাজনৈতিক ভাবনা যার মূল চেহারাটা হল রাজনৈতিক সমস্যা প্রসঙ্গে ঈশ্বরতাত্ত্বিক দৃষ্টিভঙ্গি। রাজনৈতিক ভাবনার মধ্যযুগীয় ধরনটা প্রাধান্য করে সামন্ততন্ত্রের উদ্ভব ও বিকাশের গোটা পর্ব জুড়ে। সামন্ততান্ত্রিক সমাজের গর্ভে বুর্জোয়া শ্রেণী যত পরিপক্ক হয়ে উঠতে থাকে, ততই এই বর্ধমান নতুন শ্রেণীর ভাবাদর্শীরা গড়ে তুলতে থাকে নতুন ধরনের বিশ্ববীক্ষা — ব্যবহারশাস্ত্রীয়। তার চরিত্র বর্ণনা করে এঙ্গেলস লেখেন: 'এটা ছিল এমন ঈশ্বরতত্ত্বীয় বিশ্বদৃষ্টি, যাতে আরোপ করা হয় ঐহিক চরিত্র। আপ্তবাক্য, ঐশ্বরিক আইনের স্থান নিল মানুষের আইন, গির্জার জায়গা নিল রাষ্ট্র। যে অর্থনৈতিক ও সামাজিক সম্পর্ক গির্জার দ্বারা অনুমোদিত হওয়ায় আগে ধরা হত গির্জার ও আপ্তবাক্যের সৃষ্টি এখন

তাদের ধরা হল আইনের ওপর প্রতিষ্ঠিত এবং রাষ্ট্র কর্তৃক সৃষ্ট বলে'*। ব্যবহারশাস্ত্রীয় বিশ্ববীক্ষায় উত্তরণে সূচিত হল গির্জার আত্মিক একনায়কত্বের অবসান, নতুন কালের রাজনৈতিক ভাবাদর্শের উদ্ভব।

আদি মধ্যযুগের গোটা সময়টা ধরে ধর্মীয় ও ঐহিক সামন্তদের মধ্যে তীব্র সংগ্রাম চলে। ধর্মীয় সামন্তেরা এ সংগ্রামে ব্যাপকভাবে কাজে লাগায় অগাস্টিনের তত্ত্ব, চেষ্টা করে নতুন যুক্তি দিয়ে থিসিসের পরিপূরণ করতে। যেমন, বহু দিক থেকে অগাস্টিনের প্রতিপাদ্যগুলি পরিবিকশিত করেন সলসবেরির জন (১২ শতক)। তাঁর 'পলিক্রাটিক' গ্রন্থটি আদি স্কলাস্টিক্সের (যুক্তিবাদী ধর্মতত্ত্ব) একটি অতি প্রখ্যাত রচনা। রাজনৈতিক প্রশ্নাদিতে, লেখক নিজেই বলেছেন, তিনি অনুসরণ করেছেন প্লুটার্কের 'প্রজাতন্ত্র বিষয়ে' ইহটি।

নিজের রচনায় সলসবেরির জন রাষ্ট্র বিষয়ে আদিম ধরনের একটি আঙ্গিক তত্ত্ব পেশ করেন। যাজক সম্প্রদায় মানবদেহের আত্মাসদৃশ, রাজা তার শির, সিনেট — হৃৎপিণ্ড, ব্যবস্থাপক ও বিচারকেরা তার ইন্দ্রিয়, রাজপুরুষ ও যোদ্ধারা তার বাহু, করসংগ্রাহকেরা পাকস্থলী, কৃষকেরা তার পদদ্বয়। এই তত্ত্ব থেকে লেখক সিদ্ধান্ত টেনেছেন যে পোপ কেবল গির্জার নয়, রাষ্ট্রেরও প্রধান, কেননা মানবদেহে আত্মার স্থানই সর্বাগ্রে।

'পলিক্রাটিক'এ একটা বিশেষ অংশ আছে স্বৈরশাসক থেকে রাজার পার্থক্য নিয়ে। জন বলেছেন, স্বৈরশাসক থেকে রাজার পার্থক্য হল এই যে শেষোক্তজন আইনের অধীনস্থ এবং তারই ভিত্তিতে শাসন করে জনগণকে, নিজেকে মনে করে তাদের সেবক, তাকে প্রদত্ত আইন সে কাজে লাগায় কেবল রাষ্ট্রীয় চাপ ও সেবাকর্ম সর্বাগ্রে বহন করার জন্য। গির্জার আদেশ যে পালন করে না, তেমন সমস্ত রাজাকে তিনি স্বৈরশাসক বলে অভিহিত করেছেন এবং বলেছেন যে তাদের হত্যা করা উচিত।

ঐহিক সামন্তের পক্ষভুক্তরা তাদের নিজস্ব যুক্তি দিত। যেমন, ফ্লেরির হুগো (১২ শতক) মনে করতেন যে পরিবারে শিশু যেমন পিতার অধীন, যাজকদেরও তেমনি উচিত রাষ্ট্রের অধীনস্থ হওয়া।

ক্লেরভের বার্নার্ড (১০৯০-১১৫৩) যাজক সম্প্রদায়ের ঐহিক ক্ষমতায় দাবির সমালোচনা করেছেন স্বকীয় একটা তত্ত্বের সাহায্যে। পোপ তৃতীয় ইউজিনিয়াসকে তিনি লেখেন: 'তুমি বিশপ, আত্মার যাজক, সুতরাং ঐহিক

বিচার চালনা তোমার মর্যাদার যোগ্য নয়। সেটা চালানো উচিত ঐহিক বিচারক, রাজা ও শাসকদের; অপরের ক্ষেত্রে তুমি হস্তক্ষেপ করবে কেন?'* ক্লেরভের বার্নার্ডের মতে, আত্মার যাজকেরা ঐহিক বিচারকদের জন্য সময় ব্যয় করবে, এমন যোগ্যতা তাদের নেই।

মধ্যযুগীয় স্কলাস্টিক** মতবাদের শীর্ষবিন্দু হয়ে দাঁড়ায় টমাস আকুইনাসের দর্শন।

সম্প্রদায়ভেদী প্রতিনিধিত্বমূলক রাজতন্ত্র গঠিত হবার সঙ্গে সঙ্গে মধ্যযুগীয় রাজনৈতিক ভাবাদর্শে বড়ো একটা পরিবর্তন ঘটে। এ যুগের লেখকেরা পুরোপুরি ক্যাথলিক বিশ্ববীক্ষার অনুগামী হলেও চোখে পড়ে তাদের মধ্যে ঈশ্বরতত্ত্বীয় যুক্তির সঙ্গে সঙ্গে ব্যবহারশাস্ত্রীয় যুক্তি প্রয়োগের প্রয়াস। মধ্যযুগীয় আইনজ্ঞ, পাদুয়ার মার্কিলিয়াস (জন্ম ১২৮০), দান্তে আলিগয়েরির (১২৬৫-১৩২১) তত্ত্বগুলি এই ধরনের। তাঁদের তত্ত্বের মধ্যে কোনো না কোনো মাত্রায় প্রকাশ পেয়েছে মধ্যযুগীয় বর্ধমান বার্গারদের (নগরবাসী) স্বার্থ, যারা সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থার ভিত্তিতে হাত না দিয়ে রাজক্ষমতার সঙ্গে একটা জোট স্থাপনের চেষ্টা করছিল।

যেমন, 'বিশ্বের রক্ষক' নামক তাঁর গ্রন্থে (১৩২৪) পাদুয়ার মার্সিলিয়াস এমন কথা বলেন যে রাষ্ট্র গড়ে উঠতে পারে সামাজিক চুক্তির ফলে। পোপ জন ২২তমের সঙ্গে সম্রাট ব্যাভেরিয়ার লুড্ভিকের সংগ্রামে তিনি শেষোক্তের পক্ষে দাঁড়ান এবং প্রমাণ করেন যে আত্মিক ক্ষমতার চেয়ে ঐহিক ক্ষমতা উচ্চতর। সবচেয়ে সেরা ধরনের রাষ্ট্র কী হতে পারে এই প্রশ্নের বিচারে তিনি কাম্য মনে করেছেন প্রতিনিধিত্বমূলক রাজতন্ত্রকে, যেখানে রাজার ক্ষমতা সম্প্রদায়ভেদী প্রতিষ্ঠানাদিতে সীমাবদ্ধ। বিবেকের স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠার পক্ষ নিয়েছিলেন তিনি। ১৩২৭ সালে তিনি তাঁর অবিদ্যমানে প্রাণদণ্ডিত এবং গির্জা থেকে বহিষ্কৃত হন। তাঁর পরবর্তী ভাগ্য অজ্ঞাত।

১৪ শতকের শেষে দ্রুত বাড়তে থাকে ধর্মদ্রোহী আন্দোলন, বেশ বিস্তারিত রাজনৈতিক কর্মসূচি নিয়ে তা অবতীর্ণ হয়। চোদ্দ-ষোলো শতকের ক্ষেত্রে ফ. এঙ্গেলস দু'ধরনের ধর্মদ্রোহের মধ্যে পার্থক্য করেছেন— একটা বার্গারদের, অন্যটা কৃষক ও ইতরজনের। বার্গারদের ধর্মদ্রোহে সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থার বিরোধিতা করা হয় কেবল গির্জার সামন্ততন্ত্রের

ক্ষেত্রে, কেননা 'নগরগুলি সর্বত্র স্বীকৃত হয়েছিল একটা পৃথক সম্প্রদায় হিশেবে, নিজেদের বিশেষ সুবিধার ওপর নির্ভর করে অস্ত্রহাতে অথবা সম্প্রদায়ের সমাবেশে ঐহিক সামন্ততন্ত্রের বিরুদ্ধে লড়বার যথেষ্ট সুযোগ ছিল তাদের'*।

এঙ্গেলস বলেছেন যে, অন্য চরিত্র ধারণ করে 'সেই ধর্মদ্রোহ যা কৃষক ও ইতরজনের দাবি সরাসরি প্রকাশ করে এবং প্রায় সর্বদাই মিলেছিল বিদ্রোহের সঙ্গে।... তারা ধর্মীয় গোষ্ঠীর সদস্যদের সম্পর্কের ব্যাপারে আদি খ্রিস্টীয় সাম্যের পুনঃপ্রতিষ্ঠার দাবি করত এবং নাগরিক সম্পর্কের ক্ষেত্রেও এই সাম্যকে মানদণ্ড হিশেবে চালু করতে চাইত। 'ঐশ্বরিক পুত্রদের সমতা' থেকে তারা প্রতিপাদন করত নাগরিক সমতা এবং তখনই অংশত এমনকি সম্পত্তির সমতা'**।

জার্মানিতে সংস্কারের একজন প্রবক্তা মার্টিন লুথারের (১৪৮৩-১৫৪৬) রাজনৈতিক মতবাদে নবকালের রাজনৈতিক ভাবনায় উত্তরণ সূচিত হয়েছে চমৎকার। লুথার দৃঢ়ভাবে বিরোধিতা করেন ক্যাথলিক চার্চের আধ্যাত্মিক একনায়কত্বের, তবে তিনি ঈশ্বরতাত্ত্বিক যুক্তিই চালিয়ে যান। ক. মার্কস লিখেছেন: '**লুথার ঐশ্বরিকতা** অনুসারে দাসত্বকে পরাস্ত করেন কেবল এইজন্য যে তৎস্থলে বসান **প্রত্যয়** অনুসারে দাসত্ব। বিশ্বাসের কর্তৃত্ব পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করে কর্তৃত্বে বিশ্বাস চূর্ণ করেন'***।

সামন্ততান্ত্রিক ইউরোপের রাষ্ট্রগুলিতে নিরঙ্কুশ রাজতন্ত্রের আধিপত্যের পর্বে রাজনৈতিক চিন্তা ভাবাদর্শের দিক দিয়ে খুবই সারসমৃদ্ধ। মার্কস যা বলেছেন, নিরঙ্কুশ রাজতন্ত্রের উদ্ভব হয় 'উৎক্রমণশীল পর্বে যখন পুরনো সামন্ততান্ত্রিক সম্প্রদায়গুলির পতন ঘটছে আর নাগরিকদের মধ্যযুগীয় সম্প্রদায় থেকে গড়ে উঠছে আধুনিক বুর্জোয়া শ্রেণী এবং সংগ্রামী পক্ষগুলির কেউ কারো ওপর প্রাধান্য করতে পারে নি।'****

বিকাশমান বুর্জোয়ার প্রতিনিধিরা নিজেদের যে রাজনৈতিক ভাবাদর্শ সংরচন করে তার ভিত্তিতে ছিল স্বাভাবিক বিধি ও সামাজিক চুক্তির ধারণা। নতুন বুর্জোয়া ভাবাদর্শের বিরুদ্ধে দাঁড়াল সামন্ত শ্রেণীর ভাবাদর্শ। এই পর্বেও সামন্ততান্ত্রিক রাজনৈতিক ভাবাদর্শ তার ঈশ্বরতত্ত্বীয় বাহ্য

চেহারা বজায় রাখে, তবে কিছু কিছু ব্যবহারশাস্ত্রীয় বিশ্ববীক্ষার উপাদান স্থান পেতে থাকে তাতে।

এ পর্বের সামন্ততান্ত্রিক শিবিরের বৈশিষ্ট্যসূচক রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গির টিপিক্যাল দৃষ্টান্ত হল ইংরেজ অভিজাত রবার্ট ফিলমার লিখিত ১৬৮০ সালে প্রথম প্রকাশিত 'প্যাট্রিয়ার্খ'।

ফিলমার দৃঢ়ভাবে নিন্দা করেছেন ব্রিটিশ বিপ্লবের, সমর্থন করেছেন নিরংকুশ রাজশাসনের পক্ষপাতীদের স্বার্থ। সামাজিক চুক্তির ধারণাকে তিনি ঈশ্বরতত্ত্বহীন মতবাদ বলে প্রত্যাখ্যান করেছেন, যা 'পবিত্র শাস্ত্রাদির' পরিপন্থী। ফিলমারের মতে, রাজার ক্ষমতা ঈশ্বরপ্রদত্ত, কোনো মানবিক আইনের অধীন তা হতে পারে না।

নিজের অবস্থান সমর্থনে ব্যবহারশাস্ত্রীয় কিছু কিছু যুক্তি 'প্যাট্রিয়ার্খ' লেখকের কাছে বর্জনীয় নয়। যেমন, তিনি জোর দিয়ে বলেছেন যে রাজা স্বাধিকারে তাঁর প্রজাদের পিতৃ-প্রভু, কেননা নিজের ক্ষমতা তিনি উত্তরাধিকার-সূত্রে পেয়েছেন পৃথিবীর প্রথম পিতৃ-প্রভু আদমের কাছ থেকে।

বেশ প্রচারিত হয় ফরাসি যাজক বসসুইয়ের 'রাজনীতি, পবিত্র শাস্ত্রের বাণী থেকে নিষ্কাশন' যা প্রকাশিত হয় ১৭০৯ সালে, লেখকের মৃত্যুর পরে। ফিলমারের মতো বসসুইয়েও সামাজিক চুক্তির সমালোচনা করেছেন। তিনি বলেন, রাজতান্ত্রিক ক্ষমতার উদ্ভব ঐশ্বরিক, জনগণের সঙ্গে রাজার নিতান্ত একটা চুক্তি থেকে তা শুরু হতে পারে না।

গ্রন্থের লেখক স্বীকার করেন যে কোনো কোনো রাজা নিজ ক্ষমতার অপব্যবহার করে। কিন্তু তাঁর মতে, এই অনাচারের বিরুদ্ধে কোনো একটা ব্যবস্থা উদ্ভাবন করা সঠিক নয়। সেরূপ ব্যবস্থা বহুদিন থেকেই বর্তমান আর সেটা হল 'ভগবৎ ভীতি'। লোকদের দিক থেকে রাজা শাস্তিবহির্ভূত, কিন্তু ঈশ্বর তাকে দেন আরো অনেক ভয়ংকর শাস্তি।

গির্জা ও রাষ্ট্রের মধ্যে সম্পর্কের সমস্যাটা মধ্যযুগীয় রাজনৈতিক চিন্তার ক্ষেত্রে ঐতিহ্যাগত, তাতেও অমনোযোগী থাকেন নি বসসুইয়ে। তিনি রায় দিয়েছেন রাষ্ট্রের পক্ষে, এবং পোপের বেদী থেকে রাজক্ষমতার পরিপূর্ণ স্বাধীনতার জন্য জিদ করেছেন। তাঁর ব্যাখ্যার টিপিক্যাল সামন্ততান্ত্রিক চরিত্রটা দেখা যাবে পরধর্মসহিষ্ণুতা বর্জন এবং ধর্মদ্রোহবিচারের অনুমোদনে।

রাশিয়ায় মধ্যযুগীয় রাজনৈতিক চিন্তার বিকাশ একটা স্বকীয় পার্থক্যে চিহ্নিত। কিয়েভ রুসের যুগেই তখনকার সাহিত্য থেকে দেখা যায় যে

রাজনৈতিক ধারণা বিকাশ লাভ করছে। যেমন, ইল্লারিয়নের 'আইন ও ঐশ্বরিক করুণা বিষয়ে উপদেশ' (১১ শতক), নেস্তরের 'সাময়িক বছরগুলোর কাহিনী' (১২ শতকের গোড়া), যেখানে লেখক এই প্রশ্নের জবাব দেবার চেষ্টা করেছেন: 'রুশ ভূমি কোথা হইতে আসিল, কিয়েভে কে রাজত্ব করিতে শুরু করিল, এবং কোথা হইতে রুশ ভূমি থাকিয়া রহিল।'

সামন্ততান্ত্রিক খন্ডবিখন্ডতার সময় বহু সাহিত্যিক সূত্রে রুশ রাষ্ট্রের স্বাধীনতা, রাজন্যদের ক্ষমতা বৃদ্ধির প্রবল সমর্থন করা হয়, যা অন্তর্দ্বন্দ্বের অবসান ঘটাবে। ভ্লাদিমির মনোমাখের (১২ শতকের গোড়া) 'উপদেশ', 'ইগোরের বাহিনীর কথা' (১২ শতক), দানিইল জাতোচনিকের (হেরামট) 'প্রার্থনা' (১৩ শতকের গোড়া) এই ধরনের পুঁথি।

কেন্দ্রীভূত রুশ রাষ্ট্রের উদ্ভব ও শক্তিবৃদ্ধি সূচিত হয় রাজনৈতিক ও আইনী চিন্তার জোয়ারে। ১৪-১৬শ শতকের রাজনৈতিক রচনাগুলিতে, বিদেশী রাষ্ট্রগুলির সঙ্গে কূটনৈতিক পত্রাবলিতে প্রধান স্থান নেয় রুশ রাষ্ট্রের সার্বভৌমত্ব ও জারের সর্বশক্তিমত্তার ধারণা ('সুজদালের সিমেয়নের ফ্লোরেণ্টাইন ক্যাথিড্রালের কাহিনী', 'ভ্লাদিমির নগরের রাজন্যদের কথা' প্রভৃতি)।

এইসব ধারণা সবচেয়ে সুস্পষ্টরূপে প্রকাশ পায় ১৬শ শতকে অভিজাত সম্প্রদায়ের ভাবাদর্শী, প্রাবন্ধিক ইভান পেরেসভেতভের রচনাগুলিতে। ১৭শ শতকের বৃহৎ একটি রাজনৈতিক আলোচনাগ্রন্থ হয়ে ওঠে ইউরি ক্রিজানিচের (১৬১৮-১৬৮৩) 'রাষ্ট্র বিষয়ে আলাপ'। ইনি খরভাতিয়ার লোক, রাশিয়ার রাজকার্যে যোগ দিয়েছিলেন। তিনি প্রচার করেন যে জারকে হতে হবে আলোকপ্রাপ্ত, প্রজাদের কল্যাণের জন্য যত্নশীল; দাবি করেন 'সমুন্নত আত্মশাসন' প্রতিষ্ঠার।

মধ্যযুগ আরবীয়-ইসলামী রাজনৈতিক চিন্তার উদ্ভব ও প্রখর বিকাশে চিহ্নিত। তার আত্মিক উৎস ছিল প্রধানত রোমক-বাইজেণ্টাইন ও ইরানীয় সাহিত্যিক ঐতিহ্য। ইসলামের প্রশ্রয়ে যে রাজনৈতিক মতবাদ গড়ে ওঠে, তার বৈশিষ্ট্য হল রাজার (খলিফার) শাসনের ঐশ্বরিক চরিত্র প্রতিপাদন। আরবীয়-ইসলামী চিন্তাধারার প্রমুখ প্রবক্তাদের (আল ফারাবি, ইবন সিনা, ইবন তুফাইল, ইবন রুশদ) রচনায় আদর্শ রাজনৈতিক ব্যবস্থার প্রকল্পও দেয়া হয়েছে। নীতিগতভাবে তা অবলম্বন করেছে রাষ্ট্রের প্রকৃতি ও লক্ষ্য বিষয়ে প্লেটোর দৃষ্টিভঙ্গি। ধরা হয়েছিল যে ব্যবস্থাটার ভিত্তি হবে সুবুদ্ধির নিয়ম, তাতে মূর্ত হবে শৃঙ্খলা আর ন্যায়। উক্ত মনীষীদের মতে, আদর্শ

শাসককে অবশ্যই হতে হবে শারীরিক ও নৈতিক পূর্ণতার দৃষ্টান্তস্থল, প্রজ্ঞায় অতুলনীয়। তাঁরা এই কথায় জোর দিয়েছেন যে সমাজের সম্প্রদায়-ভেদী ব্যবস্থাকে কঠোরভাবে মেনে চলতে হবে, এমন প্রতিটি সম্প্রদায়কে (সবচেয়ে বড়ো অভিশাপ — বিশৃঙ্খলা এড়াতে হলে) তার যা করণীয় সেটা বিনা বাক্যে পালন করতে হবে। সমস্ত 'আদর্শ প্রজার' কর্তব্য হল শাসকের অধীনতা স্বীকার, সততার সঙ্গে নিজের কর্তব্য পালন, আত্মোন্নতির প্রয়াস।

এখানে উল্লেখ করা অযথা হবে না যে আরবীয়-ইসলামী আত্মিক সংস্কৃতি ভারতের বিদ্যা-কৃতিত্ব থেকে কম ধার নেয় নি। এই সংস্কৃতি দিয়েই তারা ইউরোপে প্রবেশ করতে থাকে।

মধ্যযুগীয় ভারতীয় রাজনৈতিক চিন্তার প্রতিভূ বলে ধরা যেতে পারে, জহরলাল নেহরুর মতে, শুক্রাচার্যের 'নীতিসার' (৯ বা ১০ম শতক)। এ গ্রন্থে বলা হয়েছে, জাতিভেদ হওয়া উচিত জন্মসূত্রে নয়, সামর্থ্য অনুসারে। প্রশাসনিক পদে নিয়োগের ক্ষেত্রে প্রস্তাব করা হয়েছে 'জাতি বা বংশ নয়, কর্ম, চরিত্র ও সুকৃতির কথা বিবেচনা করার'। জনগণের অধিকাংশের মনোভাব অনুসারে রাজাকে চলতে উপদেশ দেয়া হয়েছে। 'নীতিসার'-এর রাজার অধীনে রাষ্ট্রীয় পরিষদ, সামাজিক কর্মে নিয়োজিত উচ্চ কর্মকর্তাদের ক্রিয়াকলাপ, নাগরিক ও গ্রামীণ জীবনের সংগঠন, সেচ-ব্যবস্থা ইত্যাদির বিবরণ দেয়া হয়েছে। অন্ততপক্ষে তত্ত্বের ক্ষেত্রে রাজাদের সর্বেসর্বা ক্ষমতা, পরম আধিপত্যের ঐশ্বরিক অধিকারে প্রশ্ন তোলা হয়েছে, নিন্দা করেছে স্বৈরাচারী পদ্ধতিতে শাসনের, স্বেচ্ছাচারের।

মধ্যযুগীয় চীনা রাজনৈতিক চিন্তার বৈশিষ্ট্য হল এই যে কনফুশিয়াসবাদ সেখানে রাষ্ট্রীয় ভাবাদর্শের স্থান নিয়েছিল (৭ম শতক থেকে)। তবে এ কনফুশিয়াসবাদ তার প্রবর্তকের বা প্রথম অনুসারকদের সমকালীন মতবাদ নয়। বহুল পরিমাণে তা লেগিস্ট মতবাদে আচ্ছন্ন হয়, দাওবাদ ও বৌদ্ধ মতবাদের অনেক দিক তাতে বিধৃত হয়। মধ্যযুগীয় চীনের পরিস্থিতি, বৃহৎ কেন্দ্রীভূত সামন্ততান্ত্রিক রাজতন্ত্রের চাহিদার সঙ্গে কনফুশিয়াসবাদকে খাপ খাইয়ে নেবার পথে যাঁরা এগিয়ে ছিলেন, তাঁদের মধ্যে একজন প্রমুখ চিন্তাবিদ হলেন জু সি (১১৩০-১২০০)। তিনি যেমন ধর্মীয়-দার্শনিক দিক থেকে, তেমনি দেশের শাসকের নিকট অকুণ্ঠ বাধ্যতার প্রেরণায় জনগণকে লালিত করার উদ্দেশ্যে আরো যথাযথ সূত্রায়ণের দিক থেকে প্রাচীন কন-ফুশিয়াসবাদকে সংস্কৃত, 'সমুন্নত' করেন।

§২। টমাস আকুইনাস

মধ্যযুগীয় স্কলাস্টিসিজমের একজন প্রমুখ প্রতিনিধি হলেন টমাস আকুইনাস। রোমের ক্যাথলিক চার্চকে সেবার জন্য তিনি সন্ত মণ্ডলীতে স্থান পান। ১৮৭৯ সালে পোপ ত্রয়োদশ লিও'র বাণী Aeterni Patris-এ তাঁর দর্শনকেই একমাত্র সত্য দর্শন বলে স্বীকার করা হয়।

টমাসের জন্ম ১২২৪ সালে সিসিলির আকুইনো নামে ছোটো একটি জায়গায় (এই থেকেই আকুইনাস নাম)। কাউন্ট উপাধি ত্যাগ করে তিনি সন্ন্যাসজীবন গ্রহণ করেন, ডোমিনিকান সম্প্রদায়ে যোগ দেন। মৃত্যু হয় ১২৭৪ সালে।

টমাস আকুইনাসের ক্রিয়াকলাপ মধ্যযুগীয়

স্কলাস্টিসিজমের বিকাশের একটা নতুন পর্বের সঙ্গে জড়িত। বারো শতকের আগে পর্যন্ত আরিস্টটলের রচনার সঙ্গে পশ্চিম ইউরোপের পরিচয় ছিল খুবই কম। প্রামাণ্য দার্শনিক বলে গণ্য হতেন প্লেটো। বারো শতক জুড়ে আরিস্টটলের একসারি রচনা অনুদিত হতে থাকে আরবী ভাষা থেকে; তাঁর রচনার ওপর আরব পণ্ডিতদের মন্তব্যের সঙ্গেও পরিচিত হয় ইউরোপীয়রা। গ্রন্থাগারগুলিতে আবিষ্কৃত হল স্টাগিরিটের এযাবৎ অজ্ঞাত রচনার লাতিন ও গ্রীক পাণ্ডুলিপি এবং তার টীকা।

সামন্ততান্ত্রিক সমাজে শ্রেণী বিরোধের তীব্রতাবৃদ্ধি, ধর্মদ্রোহী আন্দোলনের বিস্তারে রোমের ক্যাথলিক চার্চের সামনে দেখা দিল নিজের 'তাত্ত্বিক' ঘাঁটি শক্ত করার কর্তব্য। তেরো শতকের গোড়াতেও যেক্ষেত্রে আরিস্টটল সম্পর্কে নেতিবাচক মনোভাব ছিল স্কলাস্টিকদের, বলা হত 'যেখানে আরিস্টটলের প্রাধান্য সেখানে খিস্টধর্মের প্রাধান্য থাকতে পারে না', সেক্ষেত্রে সে শতকের শেষের দিকে পরিস্থিতি পালটে যায়। মধ্যযুগে মহান দার্শনিক ও বৈজ্ঞানিক প্রামাণিকতার স্বীকৃতি পেলেন আরিস্টটল।

স্বভাবতই ক্যাথলিকবাদ ও সামন্ততান্ত্রিক সমাজব্যবস্থা রক্ষার উপযোগী করে আরিস্টটলের মতবাদকে গুছিয়ে খাপ খাইয়ে নেয়া হয়। ভ. ই. লেনিন লিখেছেন: 'পোপতন্ত্র আরিস্টটলের ভেতরকার জীবন্তটাকে হত্যা করে চিরন্তন করে তোলে মৃতটাকে'*। আরিস্টটলকে এইরূপ ঢেলে সাজায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেয় টমাস আকুইনাসের গুরু মহান আলবার্টের রচনা, তবে মূল কাজটা সম্পূর্ণ করেন আকুইনাস নিজেই।

টমাস আকুইনাসের প্রধান রচনার নাম 'ঈশ্বরতত্ত্বসমষ্টি' (Summa theologiae) এবং সাধারণভাবে স্কলাস্টিসিজমের সমস্ত সমস্যাই তাতে বিধৃত। কয়েক শত প্রশ্ন ও উপপ্রশ্নের উত্তর নিয়ে গ্রন্থটি রচিত। প্রতিটি উপপ্রশ্নের জবাবে পক্ষে ও বিপক্ষে যুক্তি দেয়া হয়েছে, প্রচুর উদ্ধৃতি আছে 'পবিত্র শাস্ত্রাদি' ও অন্যান্য প্রামাণ্য পুঁথি থেকে। প্রশ্নের উত্তরগুলো সন্নিবিষ্ট বিভিন্ন বিভাগে। এ গ্রন্থে বেশ মন দেয়া হয়েছে রাজনৈতিক ও আইনী প্রশ্নে।

টমাস আরো কয়েকটি রচনার লেখক। রাজনৈতিক ও আইনী মতবাদের ইতিহাসের দিক থেকে বিশেষ তাৎপর্য ধরে 'রাজন্য শাসন বিষয়ে' (De Regimine Principun) গ্রন্থটি। আকুইনাস নিজে বইটির গোটা প্রথম খণ্ড এবং দ্বিতীয় খণ্ডের চারটি অধ্যায়ের বেশি লিখে উঠতে পারেন নি।

তাঁর মৃত্যুর পর গ্রন্থটি সম্পূর্ণ করেন তাঁর একজন শিষ্য। আরিস্টটলের 'রাজনীতি' ও 'নীতিশাস্ত্র' এবং লম্বার্ডির পিটারের লেখা 'নীতিবচন'এর উপর তাঁর টীকারও খানিকটা গুরুত্ব আছে।

মধ্যযুগীয় স্কলাস্টিসিজমের একটা কেন্দ্রীয় প্রশ্ন ছিল universalis, অর্থাৎ সাধারণ ধারণার প্রকৃতি কী। কয়েক শতক ধরে সংগ্রাম চলেছে 'বাস্তববাদী' ও 'নোমিনালিস্টদের' মধ্যে। 'বাস্তববাদীরা' মনে করতেন সাধারণ ধারণা বস্তুত বিদ্যমান এক ধরনের আত্মিক মর্মার্থরূপে, এক-একটা বস্তুর তা প্রতিরূপ। বিপরীতপক্ষে, নোমিনালিস্টরা (লাতিন nomina — নাম থেকে) universalis নিতান্ত অভিজ্ঞামাত্র, এক-একটা বস্তুর বাস্তবতার ওপর তাঁরা জোর দিতেন।

নোমিনালিজমকে মার্কস বলেছিলেন মধ্যযুগে বস্তুবাদের প্রথম অভিব্যক্তি। ভ. ই. লেনিনও উল্লেখ করেন যে 'মধ্যযুগীয় নোমিনালিস্ট ও বাস্তববাদীদের সংগ্রামের মধ্যে আছে বস্তুবাদী ও ভাববাদীদের মধ্যে সংগ্রামের সাদৃশ্য'*।

সরকারি ক্যাথলিকবাদ ঝুঁকেছিল বাস্তববাদের দিকে, যা প্রথম দিকে অবলম্বন করেছিল প্লেটোর মতবাদ। মধ্যযুগীয় লেখকদের মতে, ক্যান্টারবেরির আনসেল্ম (১০৩৩-১১০৯) স্কলাস্টিসিজমের সূত্রপাত করেন। তিনি বাস্তববাদকে এই অর্থে ব্যবহার করেছেন ঈশ্বরের অস্তিত্বের তথাকথিত 'তত্ত্ববিদ্যক প্রমাণ' হিশেবে। Universalis-কে বাস্তব বলে মেনে এবং ধারণার ক্রমাগত সাধারণীকরণ করে আন্সেল্ম উপস্থিত হলেন সবচেয়ে সাধারণ ধারণায়, যা দেখা দিচ্ছে অস্তিবান সবকিছুর সাধারণ উৎস, অর্থাৎ ঈশ্বর হিশেবে। কিন্তু ঈশ্বরের এইরূপ অস্তিত্ব প্রমাণের মধ্যে প্রচ্ছন্ন ছিল সর্বেশ্বরবাদের বিপদ। ঠিক সর্বেশ্বরবাদের অর্থেই 'তত্ত্ববিদ্যক প্রমাণের' ব্যাখ্যা করা হয়েছে বেনের আমালরিখ আর ডিনাণ্টের ডেভিডের ধর্মদ্রোহে। তার আগে পর্যন্ত বাস্তববাদের ভিত্তিতে ছিল প্লেটোর দর্শন। তখন নিজেদের মতবাদের এরূপ ব্যাখ্যার বিরুদ্ধে অন্তত বাহ্যত প্রত্যয়জনক কোনো যুক্তি বাস্তববাদীদের ছিল না।

টমাস আকুইনাস বাস্তববাদের অবস্থানে থেকেও তার সূত্রগুলিতে কিছু অদলবদল করেন, বাস্তববাদীদের দৃষ্টিভঙ্গির সঙ্গে যুক্ত করেন আরিস্টটলের দৃষ্টিভঙ্গি। আরিস্টটলের কাছ থেকে তিনি নেন পদার্থ ও রূপের ধারণা। কিন্তু তাঁর কাছে পদার্থের কোনো স্বাধীন সত্তা নেই; তা শুধু আকারের

সূচনা মাত্র। কেবল আকারই দেয় অস্তিত্ব, পদার্থের অভিধা ও সংজ্ঞা। ঈশ্বরে আকার বর্তমান অনন্তকাল।

Universalis আর আকারকে টমাস সমার্থে দেখেছেন। নোমিনালিস্টদের সঙ্গে খানিকটা সায় দিয়ে 'স্কলাস্টিসিজমের ও ঈশ্বরতত্ত্বের এই রাজন্য' লিখেছেন যে তাঁদের অভিমত মানবিক ধারণার অনুবর্তী, এবং এই দিক থেকে universalis হল একটা বস্তুর বিমূর্তায়ন। কিন্তু আসলে, আকুইনাস বলেছেন, ঈশ্বরে universalis বিদ্যমান ছিল বস্তুসৃষ্টির আগেই।

Universalis-এর এরূপ ভাষ্যে সর্বেশ্বরবাদের অবস্থান অনেক দুর্বল হয়। আকার নিয়ে আরিস্টটলীয় মতবাদকে টমাস ব্যাপকভাবে ব্যবহার করেছেন রাজনৈতিক ও আইনী সমস্যার বিচারেও।

আকুইনাসের রাজনৈতিক মতবাদ বোঝার পক্ষে খুবই গুরুত্বপূর্ণ হল আইন সম্পর্কে তাঁর ধারণা। আইন বলতে তিনি বোঝেন নির্দিষ্ট একটা লক্ষ্যের জন্য প্রয়োজনীয় শৃঙ্খলার নিয়ম। আইনের ক্রিয়া পরিব্যাপ্ত যেমন প্রাকৃতিক প্রক্রিয়ায়, তেমনি মানবিক কার্যকলাপে। কিন্তু তাদের প্রয়োগপ্রণালী বিভিন্ন। বস্তুপিণ্ড লক্ষ্যচালিত হয় ঐশ্বরিক ইচ্ছায়, মানুষের কিন্তু নিজস্ব স্বাধীন ইচ্ছা আছে, নিজেই সে নিজেকে চালিত করে লক্ষ্যের দিকে।

মানবিক ক্রিয়াকর্মের লক্ষ্যটা কী?

আরিস্টটল অনুসরণে টমাসের কাছে সে লক্ষ্য হল পরমানন্দ। তবে পরমানন্দের ব্যাখ্যা তিনি করেছেন ধর্মীয় প্রেরণায়। এই পরমানন্দকে তিনি মানসম্মান, খ্যাতিপ্রতিপত্তি, বৈষয়িক ঐশ্বর্যের মধ্যে দেখেন নি, দেখেছেন কেবল সমস্ত অস্তিত্বের আদি কারণ, অর্থাৎ ঈশ্বরের বোধিলাভে তাত্ত্বিক প্রজ্ঞার কর্মণ্যতায়। পার্থিব জীবনে কেবল অসম্পূর্ণ পরমানন্দলাভ সম্ভব। পূর্ণ পরমানন্দ সম্ভব কেবল অন্য জীবনে, অতিপ্রাকৃত পথে, ঈশ্বরের সাহায্যে। মানুষ চলেছে ঐশ্বরিক করুণায় অন্তিম লক্ষ্যের দিকে।

অতিমাত্রায় বিমূর্ত এইসব যুক্তি টমাসের কাছে প্রয়োজন হয়েছিল নিছক ব্যবহারিক কয়েকটি সিদ্ধান্ত প্রণয়নের জন্য। পার্থিব জীবনেও মানুষের উচিত ইচ্ছার অকপটতা রক্ষা, লক্ষ্যের ক্ষেত্রে সেইটেই হওয়া দরকার উচিতমতো ইচ্ছা, নির্দিষ্ট কতকগুলি কর্মসাধনের পর মানুষ যোগ্যতা লাভ করে, কেননা সমস্ত কল্যাণই অর্জিত হয় গতি ও ক্রিয়ায়।*

সদাচারের আরিস্টটলীয় মতবাদ গ্রহণ করলেও টমাস কিন্তু তার

—

ক্রিয়াক্ষেত্র সীমাবদ্ধ রাখেন। স্বাভাবিক ও সঞ্চারিত বা ঈশ্বরতাত্ত্বিক সদাচারের মধ্যে পার্থক্য করেন তিনি। প্রথমটা মানুষ অর্জন করে তার স্বাভাবিক শক্তিতে, আরিস্টটলের মতবাদ অনুসারে যা মিলবে প্রাণকে আইনানুগত্যে অভ্যস্ত করিয়ে। যেমন, প্রজ্ঞা, পৌরুষ, নম্রতা, ন্যায্যতা। আরিস্টটলের মতে, এই ধরনের সদাচার হল দুই চরম প্রান্তের মধ্যস্থল। কিন্তু সঞ্চারিত বা ঈশ্বরতাত্ত্বিক সদাচার, যেমন, বিশ্বাস, আশা, ভালোবাসা ইত্যাদির ক্ষেত্রে প্রাচীন দার্শনিকের মতবাদ খাটে না। এক্ষেত্রে সাধারণভাবে সদাচারের জন্য আশিসধন্য অগাস্টিন যে নির্দেশ দিয়েছেন তাই প্রযোজ্য, অর্থাৎ এগুলি মানুষের ইচ্ছার বাইরে আত্মার ঈশ্বরপ্রণোদিত সদ্‌গুণ।* এইসব সদাচারের মানদণ্ড ঈশ্বর। তাঁর সন্নিকট হতে গেলে আধিক্য থাকতে পারে না, তাই এসব সদাচারে চরম কিছু নেই।

সদাচারে মানবজীবনের লক্ষ্য সাধনে সাহায্য হয়, সে সদাচারগুলি লক্ষ্য সাধনে আইন দ্বারা চালিত এবং আইন পালনই তাদের কাজ।

সদাচারের প্রশ্ন বিচারে আকুইনাস মনুষ্য সম্পর্কের নিয়ন্ত্রক বলে আইনকে ধার্য করেছেন।

নতুন প্রশ্নের বিচারে প্রবৃত্ত হয়ে টমাস আইনের একটা প্রাথমিক সংজ্ঞা দেন। তাঁর 'ঈশ্বরতত্ত্বসমষ্টি'তে আমরা পড়ি: 'আইন হল আচরণে প্রবৃত্ত বা অপ্রবৃত্ত কোনো একজনের ক্রিয়াকর্মের নির্দিষ্ট একটা নিয়ম ও মাপকাঠি'**।

এই সংজ্ঞাকে আরো সুনির্দিষ্ট করে তিনি আইনের মর্মার্থ ব্যাখ্যার চেষ্টা করেছেন। তাঁর ধারণা, ক্রিয়ার ভিত্তি হল প্রজ্ঞা। প্রজ্ঞার আদি-উৎস লক্ষ্য। মানুষের কাছে এ লক্ষ্য হল পরমানন্দ লাভ। সুতরাং আইনের মর্মার্থে নিহিত মনুষ্যজীবনকে পরমানন্দ লাভে চালিত করায়।

কিন্তু মানুষ রাষ্ট্রের সদস্য, রাষ্ট্র হল সম্পূর্ণত একটা জোট; সুতরাং আইনকে সাধারণ কল্যাণের কথা মনে রাখতে হবে। আইন জারি করা উচিত তাদের যারা এই লক্ষ্য অনুসরণ করে। সমাজকল্যাণের জন্য শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠা করবে হয় সমাজ নিজেই কিংবা তার স্থানে যে অবতীর্ণ হয়েছে। এইভাবে, বিধানদাতা হতে পারে স্বয়ং সমাজ কিংবা যে ব্যক্তি সাধারণ কল্যাণের অভিভাবকত্ব পেয়েছে।

শেষত, মানবিক ক্রিয়াকলাপের মানদণ্ড হতে হলে আইনকে হতে হবে সর্বগোচর।

এই সমস্ত কথার ভিত্তিতে টমাস আইনের সংজ্ঞা দিয়েছেন: 'আইন হল সাধারণ কল্যাণের জন্য বিচারবুদ্ধির বিশেষ একটা নির্দেশ যা জারি করেন সমাজের ভারপ্রাপ্তরা'*।

আইনের প্রকৃতিভেদ করতে গিয়ে 'ঈশ্বরতত্ত্বসমষ্টি'র লেখক সর্বাগ্রে ঐশ্বরিক ও মানবিক আইনের মধ্যে তফাৎ করেছেন। প্রথমটা সঞ্চারিত বা ঈশ্বরতাত্ত্বিক এবং দ্বিতীয়টা স্বাভাবিক সদাচার নিয়ে। এই দুই ধরনের আইনের প্রতিটিই আবার স্বাভাবিক ও অস্তিবাচক প্রবর্তিত ধারায় বিভক্ত। ফলে পাওয়া যাচ্ছে চার ধরনের আইন: শাশ্বত (lex aeterna); স্বাভাবিক (lex naturalis); মানুষিক (lex humana); ঐশ্বরিক (lex divina)।

শাশ্বত আইন হল ঐশ্বরিক প্রজ্ঞার বিচারবুদ্ধি। তবে এটা সম্পূর্ণত ঐশ্বরিক প্রজ্ঞা নয়। এ প্রজ্ঞার একটা অংশকে তিনি পৃথক করেছেন যা নির্মাণ করে — সেটা কারুকলা, আর যে অংশটা লক্ষ্যের দিকে চালিত করে, সেটা আইন। শাশ্বত আইন সর্বোচ্চ আইন। নিম্নতন সমস্ত আইনকে আসতে হবে এই শাশ্বত আইন থেকে।

টমাসের মতবাদ অনুসারে, শাশ্বত আইনের প্রতিফলন ঘটে মানুষের বিচারবুদ্ধিতে। এরূপ প্রতিফলন কেবল ব্যবহারিক বিচারবুদ্ধি নিয়ে। ব্যবহারিক বিজ্ঞতার প্রাথমিক বনিয়াদ যেক্ষেত্রে সদয়তা, স্বাভাবিক নিয়মের ক্ষেত্রে সদয়তা সম্পর্কিত সবকিছু নিয়ে। সদয়তা মানুষের প্রকৃতিসিদ্ধ, তাই মানুষের যা কিছুতে প্রকৃতিগত প্রবণতা, তাকেই স্বাভাবিক নিয়ম বলে মনে করে ব্যবহারিক বিচারবুদ্ধি।**

তিনি মনে করেন, সদাচারী জীবনের জন্য শুধু মানুষের স্বাভাবিক প্রবণতাই যথেষ্ট নয়, শৃঙ্খলা ও আবশ্যক। পাপাত্মাদের ওপর বলপ্রয়োগে এবং ভয় দেখিয়ে কুকর্ম থেকে নিবৃত্ত করা উচিত, অন্যের শান্তিভঙ্গে তাদের বাধা দেয়া দরকার। লোকেদের শান্তি ও সদাচারের বিকাশের জন্য প্রয়োজন মানুষিক আইন। মানুষিক আইন আসে স্বাভাবিক নিয়ম থেকে, তবে তার কিছু কিছু অংশ স্বাভাবিক নিয়মের বিপরীত না হলেও পুরোপুরি

মানুষিক বিচারের ওপর নির্ভরশীল। যেমন, অপরাধের জন্য কতটা শাস্তি হবে, সেটা এই ধারায় পড়ে।*

মানুষের বিধান যদি স্বাভাবিক নিয়মের বিরুদ্ধে যায়, তাহলে তা মানুষিক আইন বলে গণ্য নয়।

মানুষিক আইন বিষয়ে টমাসের ধারণাটা খুবই জটিল। তাতে যেমন আছে নিতান্ত আইনী, তেমনি নীতিশাস্ত্রীয় মানদণ্ড, তবে পুরোপুরি নয়, শুধু সাধারণ কল্যাণের সঙ্গে যেটা সংশ্লিষ্ট। যে লোকেদের জন্য মানুষিক আইন প্রণীত, তাদের প্রকৃতির কথা মনে রাখতে হবে সে আইনকে। যেহেতু তা প্রধানত প্রণীত অসম্পূর্ণ লোকেদের জন্য, তাই সমস্ত পাপ নয়, অধিকাংশ লোক যে গুরুতর পাপ পরিহার সক্ষম, শুধু তাই নিষিদ্ধ করা তার উচিত।

আকুইনাসের মতবাদে, অন্যায় আইন হতে পারে দু'রকম। প্রথমত, যা সাধারণ কল্যাণের বিরোধী, দ্বিতীয়ত, যা ঐশ্বরিক বিধানের পরিপন্থী। প্রথমটা প্রজাদের ক্ষেত্রে অবশ্যপালনীয় এমন নয়, তবে পালনও করা যেতে পারে। দ্বিতীয়টা একেবারেই অপালনীয়, কেননা মানুষের চেয়ে ঈশ্বরের কাছে অধীনতা বেশি।

তাঁর কাছে চতুর্থ ধরনের আইন হল ঐশ্বরিক বিধি যা বিধৃত 'ঐশ্বরিক উদ্ঘাটনে'। এ আইন আবশ্যক নিম্নোক্ত কারণে:

— মানুষের লক্ষ্য মানুষের স্বাভাবিক সামর্থ্যের ঊর্ধ্বে;

— মানুষের বিচারশক্তির অপ্রতুলতায় দেখা দেয় বিভিন্ন মতামত, মতৈক্য সম্ভব কেবল উচ্চ নেতৃত্ব বর্তমান থাকলে;

— পূর্ণতালাভ ও পুণ্যকর্মের জন্য মানুষের আত্মার যে অভ্যন্তরীণ গতিবেগ আবশ্যক, তা মানুষিক আইনের অধিগম্য নয়;

— শেষত, সর্ববিধ ত্রুটি অপনোদনে মানুষিক আইন অক্ষম। যেসব পাপ মানুষিক আইনে নিষিদ্ধ নয়, তা নিষিদ্ধ করতে হবে এমন আইনে যার উদ্ভব ঐশ্বরিক।**

ঐশ্বরিক বিধি দুই ভাগে বিভক্ত — ওল্ড-টেস্টামেণ্ট (আদি বিধি) ও নিউ-টেস্টামেণ্ট (নব বিধি)। তাঁর মতে, প্রথমটায় বিধৃত হয়েছে নৈতিক অনুশাসন, প্রজ্ঞাতেই যার শক্তি। নিউ-টেস্টামেণ্ট বা নব বিধির আইন

মানুষ পেয়েছে পবিত্র আত্মার পরমকরুণার সঙ্গে সমাহিত হবার জন্য।

টমাসের আইন বিষয়ক মতবাদে আইনী ও নৈতিক অনুশাসনের মধ্যে পার্থক্য করা হয় নি। অন্যান্য সামাজিক নিরিখ থেকে আইনী নিরিখকে তফাৎ করার চেষ্টা তিনি করেছেন ন্যায়পরায়ণতার প্রশ্ন বিচারে। তাঁর মতে, ন্যায়পরায়ণতা হল একটা স্বাভাবিক সদাচার, যা মানুষের ইচ্ছা ও ক্রিয়াকর্মের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট। রোমক ব্যবহারশাস্ত্রীরা ন্যায্যতার যে সংজ্ঞা দিয়েছেন, সেটাকে সঠিক মনে করেন আকুইনাস। ওঁদের মতো তিনিও মনে করেন যে ন্যায় হল প্রত্যেককে তার প্রাপ্য দেবার নিরবচ্ছিন্ন নিয়ত সংকল্প।*

টমাসের মতে, আইন (Jus) হল ন্যায়ের বিষয়বস্তু। তা অপরের সঙ্গে সমতা স্থাপনের কর্ম হিশেবে নির্দিষ্ট। যদি সমতা স্থাপিত হয় অবস্থার স্বাভাবিক নিয়মেই, তবে আমরা পাই স্বাভাবিক আইন, যদি মানুষের নির্দেশে, তাহলে প্রবর্তিত আইন।

আরিস্টটলের মতোই আকুইনাস ন্যায্যতাকে ভাগ করেছেন সাম্যমূলক ও বণ্টনমূলকে। মূর্ত-নির্দিষ্ট লোকেদের পারস্পরিক সম্পর্ক গড়ে ওঠে সাম্যমূলক ন্যায়ের ভিত্তিতে, মানুষ ও সমাজের মধ্যে সম্পর্ক স্থাপিত বণ্টনমূলকতার ওপর। দ্বিতীয় ক্ষেত্রে প্রত্যেকে পায় সমগ্রের জন্য তার যতটা অংশগ্রহণ সেই অনুসারে।

বণ্টনমূলক ন্যায্যতার মতবাদ থেকেই টমাস সামন্ততান্ত্রিক সম্প্রদায়ভেদী ব্যবস্থাকে সঙ্গত প্রতিপন্ন করেন। রাষ্ট্র শাসনে 'ভাড়াটে মজুর ও নোংরা লোকেদের', তথা ছোটোখাটো মিস্ত্রি-কারুশিল্পীদেরও কোনোরূপ অংশগ্রহণ অনুচিত। বেশি অধিকার দিতে হবে মধ্য শ্রেণীকে — যোদ্ধা, বিচারক, প্রশাসক, বিজ্ঞানী, যাজক, অভিজাতদের। সর্বাধিক অধিকার থাকা চাই শাসকদের, কেননা তারা হল সমগ্র সমাজের প্রতিমূর্তি।

দাসপ্রথা বজায় রাখার কথা বলেছেন আকুইনাস। তিনি বলেছেন, ঈশ্বর সবাইকে সমান করে সৃষ্টি করলেও পাপের জন্য শাস্তির ব্যবস্থা রেখেছেন তিনি। স্বাভাবিক আইনে বন্দীদের হত্যা না করে দাসে পরিণত করা উচিত। তিনিও আরিস্টটলের এই যুক্তি দিয়েছেন যে স্বাভাবিক অসমানতা আছে, অর্থনৈতিক দিক থেকে দাসপ্রথা আবশ্যক।

টমাসের রচনায় ব্যক্তিগত মালিকানাও সমর্থন পেয়েছে। তিনি মনে

করেন যে তার প্রবর্তন করেছে মানুষেই, তবে স্বাভাবিক আইনের বিরোধী তা নয়। ব্যক্তিগত সম্পত্তির সমর্থনে আরিস্টটলের যুক্তিগুলির পুনরুক্তি তিনি করেছেন সবিস্তারে, সেই সঙ্গে আরো যোগ করেছেন: ঐশ্বরিক শৃঙ্খলা আরো পাকা হয়, যখন প্রত্যেকে তার যা আছে তাতে তুষ্ট।

রাষ্ট্র বলতে কী বোঝায়, সে প্রশ্নে তিনি দৃঢ়ভাবেই সরে গেছেন আরিস্টটল থেকে। আরিস্টটলের 'রাজনীতি' গ্রন্থের উপর টীকায় তিনি রাষ্ট্রের সংজ্ঞা দিয়েছেন মানবিক বিদ্যার সর্বোচ্চ সৃষ্টি বলে; একেবারেই উপেক্ষা করেছেন 'রাজনীতি'র সেই অংশটা যেখানে রাষ্ট্রকে বলা হয়েছে প্রয়োজনীয় এবং সম্মিলিত বসবাসের একটা শাশ্বত রূপ।

বিশ্ব সৃষ্টির সঙ্গে সাদৃশ্য দেখিয়ে আকুইনাস রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার ব্যাখ্যা করেছেন। তাঁর মতে, সার্বভৌম শুধু রাষ্ট্রের শাসক নন, তার স্রষ্টাও। তাঁর মতে, রাষ্ট্রে সার্বভৌমের স্থান তেমনই, যেমন ঈশ্বরের স্থান মহাবিশ্বে। শাসক হল একমাত্র একীকরণ নীতি, তাছাড়া রাষ্ট্র ধ্বংস পাবে।

শাসকের ক্ষমতা নিহিত ঈশ্বর প্রবর্তিত শৃঙ্খলায়, সেই অনুসারে উচ্চতনেরা কর্মে প্রবৃত্ত করবে অধস্তনদের। সুতরাং অধস্তনদের উচিত উচ্চতনদের অধীনস্থ থাকা।*

'ঈশ্বরতত্ত্বসমষ্টি'তে টমাস ক্ষমতার ঐশ্বরিক উদ্ভব তত্ত্ব নিয়ে অনেক কথা বলেছেন, তবে আরো সবিস্তারে বলেছেন লম্বার্ডির পিটারের 'নীতিবচন'এর ওপর তাঁর টীকায়।

তাঁর মতে, ক্ষমতার ক্ষেত্রে তিনটি উপাদানকে আলাদা করে দেখা চাই: তার উদ্ভব, তার ব্যবহার এবং তার মর্মার্থ। ঈশ্বর কু নয়, সু-এর কারণ। সুতরাং এই দাঁড়ায় যে ক্ষমতায় যা কিছু সু তা আসছে ঈশ্বর থেকে, যা কিছু খারাপ, তার উদ্ভব অন্য কিছুতে।

ক্ষমতার উদ্ভব ও প্রয়োগ সু-এর বিপরীতে যেতে পারে, সেক্ষেত্রে তা ঈশ্বর থেকে উদ্ভূত নয়। আর ক্ষমতার যেটা মর্মার্থ, সেটা হল এই যে তা সর্বদাই সু-এর সাধক, কেননা তা পরিচালনা ও বশ্যতার নির্দিষ্ট একটা শৃঙ্খলা স্থাপন করে। এইভাবে মর্মার্থের দিক থেকে ক্ষমতা সর্বদাই ঈশ্বরপ্রেরিত।

টমাস বলছেন, ক্ষমতার নিকট বশ্যতা সেই পরিমাণে উচিত যে পরিমাণে তা আসছে ঈশ্বর থেকে। এই পূর্বসূত্রের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্কে তিনি বিচার

করেছেন ক্ষমতার নিকট বশ্যতার সীমা। ক্ষমতা যদি লাভ করা হয়ে থাকে অন্যায়ভাবে তাহলে যে পারবে তারই অধিকার আছে শাসকের বশ্যতা স্বীকার না করার। ক্ষমতার বেঠিক ব্যবহারও বশ্যতা অস্বীকারের ভিত্তি যোগাতে পারে। এক্ষেত্রে তিনি অবশ্যতার দুটি উদাহরণের উল্লেখ করেছেন। প্রথমত, শাসনক্ষমতা যে লক্ষ্যে প্রতিষ্ঠিত, তার বিপরীত ক্রিয়াকলাপ যখন তা মঞ্জুর করে, যথা, পুণ্যকর্মের বিরুদ্ধে দাবি করে পাপাচার। এক্ষেত্রে ক্ষমতার নিকট বশ্যতা অস্বীকার শুধু অধিকার নয়, কর্তব্যই। দ্বিতীয়ত শাসনক্ষমতা যখন এমন আজ্ঞা দেয় যা তার আয়ত্তাধীন নয়; যেমন, এমন কর বসায় যা দিতে প্রজারা বাধ্য নয়। এক্ষেত্রেও প্রজারা বশ্যতা অস্বীকার করতে পারে, তবে এরূপ অস্বীকৃতি তাদের পক্ষে অবশ্যকর্তব্যই হবে, এমন নয়।

বশ্যতা অস্বীকার প্রকাশ পেতে পারে বিদ্রোহের আকারে। নীতিগতভাবে, তিনি মনে করেন, বিদ্রোহ রাষ্ট্রস্থ জনগণের ঐক্যের বিরোধী, সুতরাং তা মারাত্মক পাপ। তবে জনগণ হল একই অধিকার ও সাধারণ হিতে সংশ্লিষ্ট লোকসমষ্টি। কিন্তু স্বৈরশাসনে সাধারণ হিত নেই, কেননা সে শাসন স্বৈরশাসকের ব্যক্তিগত হিতের জন্য প্রতিষ্ঠিত। স্বৈরশাসনে স্বৈরশাসক নিজেই শৃঙ্খলাভঙ্গকারী, কেননা নিজের নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্য সে জনগণের মধ্যে কলহবিবাদে উৎসাহ দেয়। এই কারণে, টমাসের মতে, সাধারণ উপকার রক্ষায় স্বৈরশাসকের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ নিষ্পাপ শুধু নয়, এমনকি প্রশংসনীয়ই। স্বৈরশাসককে হত্যাও অনুমোদন করেন তিনি।

বিদ্রোহের অধিকার নিয়ে টমাসের যুক্তিগুলিকে কোনো একটা গণতান্ত্রিক প্রবণতার প্রতিফলন বলে দেখলে কিন্তু ভুল হবে। তিনি যে পর্বে এসব লিখেছিলেন, তখন যাজক ও রাষ্ট্রের মধ্যে সংগ্রাম ভয়ানক তীব্র হয়ে উঠেছিল। এ সংগ্রামে চার্চ একাধিকবার আবেদন করেছে জনগণের কাছে। টমাসের সমস্ত যুক্তিই হল এই ঘটনাটার প্রতিফলন ও তা সমর্থনের প্রয়াসে প্রণোদিত।

আকুইনাসের রচনায় বেশ খানিকটা মন দেয়া হয়েছে রাষ্ট্রের রূপবিষয়ক মতবাদে। আরিস্টটল অনুসারে তিনি রাজতন্ত্র, অভিজাততন্ত্র, গোষ্ঠীতন্ত্র এবং মিশ্র শাসনের মধ্যে তফাৎ করেছেন। তাঁর মতে, মিশ্র শাসন হল গণতান্ত্রিক ও আভিজাতিক উপাদানের মিলন।

টমাসের সমস্ত সহানুভূতিই রাজতন্ত্রের দিকে। এর সমর্থনে তিনি একমেবাদ্বিতীয় ঈশ্বর সৃষ্ট বিশ্ব শৃঙ্খলার নজির দেন। তাঁর মতে,

ঐতিহাসিক অভিজ্ঞতাতেও রাজতন্ত্রের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপন্ন হয়। তার প্রধান যুক্তিটি এই যে তা সহজেই অধঃপতিত হয় স্বৈরশাসনে।

নিরঙ্কুশ (principatum regini) ও রাজনৈতিক principatum politicum) — রাজতন্ত্রকে এই দুই ভাগে ভাগ করে তিনি স্পষ্টতই শেষেরটিকে পছন্দ করেন। এরূপ রাজতন্ত্রের প্রধান বৈশিষ্ট্য হল রাজা আইনের অধীনস্থ, তার সীমা সে অতিক্রম করতে পারবে না। যা মনে হয়, রাজনৈতিক রাজতন্ত্র বিষয়ে টমাসের ধারণাটা তখন পশ্চিম ইউরোপে যেসব পরিবর্তন ঘটছিল তার প্রভাববহির্ভূত নয়। সেখানে তখন সম্প্রদায়ভেদী-প্রতিনিধিত্বমূলক রাজতন্ত্র দানা বেঁধে উঠতে শুরু করেছিল।

আধ্যাত্মিক ও ঐহিক ক্ষমতার পারস্পরিক সম্পর্ক বিচারে টমাস তাদের কর্মক্ষেত্রে ভাগ করে দেবার চেষ্টা করেছেন। ঐহিক ক্ষমতার উচিত প্রজাদের কেবল বাহ্য ক্রিয়াকলাপ পরিচালিত করা, আর লোকেদের আত্মা চালনা পুরোপুরি গির্জার এক্তিয়ারে। লম্বার্ডির পিটারের 'নীতিবচন'এর ওপর টীকায় টমাস লিখেছেন: 'আধ্যাত্মিক ও ঐহিক উভয় ক্ষমতাই যেহেতু আসছে ঐশ্বরিক ক্ষমতা থেকে, তাই ঐহিক ক্ষমতা আধ্যাত্মিক ক্ষমতার ততটা অধীন যতটা ভগবান তাকে অধীন করেছেন, অর্থাৎ যে ব্যাপারগুলি আত্মা ত্রাণ নিয়ে ঠিক সেইসব ক্ষেত্রে; অতএব এইসব ব্যাপারে ঐহিক নয়, গির্জার ক্ষমতার অধীনস্থ হতে হবে। আর যেগুলি নাগরিক কল্যাণ নিয়ে, সেগুলিতে 'সম্রাটকে সাম্রাজ্য দাও' এই প্রবচন অনুসারে গির্জার ক্ষমতার চেয়ে বরং ঐহিক ক্ষমতার অধীনস্থ হওয়া উচিত। কেবল দৈবাৎই এই উভয় ক্ষমতা মিলিত হয় পোপের মধ্যে যিনি উভয় ক্ষমতারই শীর্ষে'*।

যা দেখতে পাচ্ছি, ঐহিক ও যাজকতন্ত্রের ক্ষমতার মধ্যে বিতর্কে টমাস মোটের ওপর ঝুঁকেছেন শেষোক্তের দিকে। গির্জার পক্ষ থেকে ধর্মত্যাগী রাজন্যদের ক্ষমতা হরণের অধিকার সমর্থন করেছেন তিনি। তাঁর মতে, রাজন্য গির্জা থেকে বিতাড়িত হলে প্রজারা তার অধীনতা মানার বাধ্যবাধকতা থেকে মুক্তি পায়।

ধ্যানধারণার সংগ্রামের ইতিহাসে টমাস আকুইনাসের দৃষ্টিভঙ্গি ও ভাবনা হয়ে দাঁড়ায় একটা বড়ো দিক্‌চিহ্ন। তবে বুর্জোয়া ব্যবস্থা উদ্ভবের পরবর্তী যুগে তাঁর উত্তরাধিকারকে দেখা হতে থাকে মূলত মধ্যযুগীয় বলে।

মধ্যযুগের ঈশ্বরতাত্ত্বিক বিশ্ববীক্ষার স্থলে বুর্জোয়াদের আইনী ও রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গিতে ব্যবহারশাস্ত্রীয় দৃষ্টিভঙ্গিই স্থান নেয় বুর্জোয়ার ক্লাসিকাল বিশ্ববীক্ষা হিশেবে। ব্যবহারশাস্ত্রীয় বিশ্ববীক্ষার কাঠামোর মধ্যে টমাস আকুইনাসের তাত্ত্বিক নির্মাণগুলির কোনো ঠাঁই হয় না।

সাম্রাজ্যবাদের যুগে বুর্জোয়া ভাবাদর্শের আবার গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন ঘটে।

আধুনিক বুর্জোয়া ভাবাদর্শের সংকটের একটা প্রকাশ হল তাতে ধর্মীয় প্রবণতার বৃদ্ধি। ভ. ই. লেনিন লিখেছেন সাম্রাজ্যবাদী বুর্জোয়া 'বর্ধমান, শক্তিশালী হয়ে-উঠতে-থাকা প্রলেতারিয়েতের ভয়ে পশ্চাৎপদ, মুমূর্ষু, সবকিছু মধ্যযুগীয়কে আঁকড়ে ধরছে। টলায়মান মজুরি-দাসত্বকে বাঁচাবার জন্য ক্ষয়িষ্ণু বুর্জোয়া এমন সব শক্তির সঙ্গে যোগ দিচ্ছে যারা ফুরিয়ে গেছে, ফুরিয়ে যাচ্ছে'*।

এই প্রক্রিয়ার একটা প্রকাশ হল ব্যবহারশাস্ত্রীয় বিশ্ববীক্ষার পতন। এই পরিস্থিতিতে বুর্জোয়া মতাদর্শীদের পক্ষে সম্ভব হয়েছে টমাস আকুইনাসের দ্বারস্থ হওয়া, গড়ে উঠেছে নয়াটমিজমের দর্শন, দেখা দিয়েছে রাষ্ট্র ও আইনের নয়াটমিস্ট ধারণা।

রাষ্ট্র ও আইনের নয়াটমিস্ট তত্ত্ব গত দশ বছরে ব্যাপক প্রচার লাভ করেছে। টমাসের আধুনিক অনুগামীরা পুনর্জীবিত করছে রাষ্ট্র ক্ষমতার ঐশ্বরিক উদ্ভব নিয়ে তাঁর মতবাদ, বলবৎ আইনগুলির সমর্থন খুঁজছে প্রাকৃতিক নিয়ম ও স্বাভাবিক বিধির মধ্যে।

৪৩। মার্টিন লুথার

লুথার (১৪৮৩-১৫৪৬) — পণ্ডিত-ঈশ্বরতাত্ত্বিক, অগাস্টিনিয়ান* সাধু, জার্মানিতে সংস্কারের প্রখ্যাত কর্মবীর, লুথারবাদী (প্রটেস্ট্যান্ট) ধর্মবিশ্বাসের প্রবর্তক, যা বহুল প্রচারিত হয় জার্মানি, বল্টিক অঞ্চল, স্ক্যান্ডিনেভীয় দেশগুলিতে।

সংস্কার হল একটা ব্যাপক সামাজিক ধর্মীয় ও রাজনৈতিক আন্দোলন, চালিত তা ক্যাথলিক চার্চের বিরুদ্ধে এবং ১৬শ শতকের প্রথম দশকগুলিতে ছড়িয়ে পড়ে প্রায় গোটা ইউরোপে। অধিকাংশ ইউরোপীয় দেশে প্রাধান্য করছিল ক্যাথলিক চার্চ, তা ছিল সামন্ততান্ত্রিক সমাজের

অতি গুরুত্বপূর্ণ এক প্রতিষ্ঠান ও ভাবাদর্শীয় হাতিয়ার। অধিপতি শ্রেণীর একটা সংগঠন হিশেবে তা নিজের কাঠামোয় সামন্ততন্ত্রের সোপান-ব্যবস্থার পুনরুৎপাদন করেছিল। ভাবাদর্শ হিশেবে ক্যাথলিক চার্চ ছিল বিদ্যমান সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থার সর্বোচ্চ সাধারণীকরণ ও অনুমোদন*, সামন্তদের ক্ষমতার ঐশ্বরিক উদ্ভব, একদলের প্রভুত্ব ও অন্যদলের অধীনতা, সামন্তদের আনুগত্য স্বীকার ও তাদের অর্থ দেবার কর্তব্য প্রতিষ্ঠিত করত। চার্চের শক্তির ভিত্তি ছিল জনগণের অন্ধ বিশ্বাস।

জটিল এক কেন্দ্রীভূত সংগঠন গড়ে তোলে চার্চ। এ. লাভিস ও আ. রাম্বো লিখেছেন, 'এমন সুবিস্তৃত একটা ব্যবস্থাপনার চাহিদা মেটাবার জন্য প্রয়োজন হয় বিপুল অর্থসঙ্গতির এবং চার্চ শেষ পর্যন্ত পরিণত হয় রোমে টাকা পাঠাবার এক অতিকায় আর্থিক যন্ত্রে। এই থেকেই বোঝা যায় কেন ক্রমাগত বাড়তে থাকে ক্রিয়াকর্ম, আচার-অনুষ্ঠান, কারুণ্য, প্রার্থনাদির জন্য ভ্রমণের গুরুত্ব, যা প্রথমে ছিল অনুকম্পার একটা প্রকাশ, পরে তা অনুকম্পাকে সরিয়ে দিয়ে কঠোর নৈতিকতার দাবিকে চাপা দিতে থাকে।'**

ক্যাথলিক যাজকদের অজ্ঞতা, অনৈতিকতা, অধিকারের অপব্যবহারে রুষ্ট হয়ে ওঠে ধর্মবিশ্বাসীরা, উঠতে থাকে অসংখ্য প্রতিবাদ।

সামন্ততান্ত্রিক জগতের রাজনৈতিক খণ্ডবিখণ্ডতার পর্বে সামন্ততান্ত্রিক বাধ্যীকরণের ভাবাদর্শীয় অস্ত্র হিশেবে চার্চ সমগ্রভাবে সামন্তদের ঘাটতিটা পূরণ করে আসছিল। ১৫শ শতক নাগাদ অবস্থাটা বদলাতে শুরু করে। জাতীয় রাজতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা, রাজার কেন্দ্রীয় ক্ষমতার শক্তিবৃদ্ধি, যা রাষ্ট্রযন্ত্রের সাহায্যে অভিজাতদের প্রভুত্ব সমর্থন করছিল — এসবের ফলে চার্চের ভাবাদর্শীয় ও রাজনৈতিক বৃত্তি কম অত্যাবশ্যক হয়ে পড়ে। তাছাড়া, গির্জা ছিল বড়ো বেশি ব্যয়সাপেক্ষ আর পোপকে শীর্ষে নিয়ে তার সোপানতান্ত্রিক সংগঠন ছিল শক্তিশালী হয়ে-উঠতে-থাকা রাজক্ষমতার স্বার্থের পরিপন্থী। নগর ও বুর্জোয়াদের বিকাশের ফলে জোরালো হতে থাকে ঐহিক ও যাজকতান্ত্রিক ক্ষমতার বিরুদ্ধে সামন্ততন্ত্রবিরোধী আন্দোলন। কৃষকসম্প্রদায় ও শহরের নিম্নজনের পক্ষ থেকে গির্জার সমালোচনার ফলে জন্ম নিল প্রচলিত ধর্মমতের বিরোধিতা।

ইতালীয় এবং দক্ষিণ জার্মানির যে বুর্জোয়ারা রোম কুরিয়ার সঙ্গে

আর্থিক লেনদেনে জড়িত ছিল, তারা বাদে ইউরোপীয় দেশগুলির বুর্জোয়ারা যা দাবি করছিল তার লক্ষ্য ছিল নতুন একটি বুর্জোয়া চার্চ গড়ে তোলা।

সাধারণজনের ক্রমবর্ধমান বৈপ্লবিক আন্দোলন, বার্গার সম্প্রদায় ও বীরব্রতীদের অসন্তোষ বিশেষ তীব্র হয়ে ওঠে জার্মানিতে। ১৫শ শতকে জার্মানিই রয়ে গিয়েছিল ক্যাথলিক চার্চের আয়ের প্রধান উৎস। ফ্রান্স, ব্রিটেন, স্পেনে চার্চের প্রতিষ্ঠা সমান পাকাপোক্ত হলেও তাদের সঙ্গে জার্মানির এই একটা তফাৎ ছিল যে এখানে গির্জার পদাধিকারীরা হত প্রধানত বিদেশী, পোপের প্রিয়পাত্র পদসেবীরা। গির্জার আয় এখানে স্থানীয় প্রভুত্বকারী শ্রেণীদের হাতে পেঁছিত না।

জার্মানির বিরোধী ও বিপ্লবী শক্তিরা বহুদিন ছিল খণ্ডবিখণ্ড, কেবল ব্যাপক সামাজিক দ্রুতগতির পর্বেই তারা প্রতিক্রিয়াশীল ক্যাথলিক শিবিরের বিপরীতে একটা ঐক্যবদ্ধ শক্তিরূপে সম্মিলিত হয়। তবে এ ঐক্য দীর্ঘস্থায়ী হয় নি। আভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্বের ফলে গড়ে ওঠে দুটি বড়ো শিবির — বার্গার-সংস্কারবাদী (লুথারের নেতৃত্বে) ও বিপ্লবী (ট. মুনট্সারের নেতৃত্বে), যারা তৃতীয়, প্রতিক্রিয়াশীল ক্যাথলিক শিবিরের বিরুদ্ধে দাঁড়ায়।

ক্যাথলিক চার্চের বিরুদ্ধে লুথারের অনেক বক্তব্যেরই সূত্রপাত করে দিয়েছিলেন তাঁর পূর্বসূরীরা — প্রখ্যাত ইংরেজ সংস্কারপন্থী জ. উইক্লিফ (১৩২০—১৩৮৪), চেকিয়ায় সংস্কার যুগের প্রমুখ উদ্‌গাতা ইয়ান গুস (১৩৬৯-১৪১৫) এবং ভিটেনবার্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ভেজেল।

নিজের রচনা ও পুস্তিকাগুলিতে উইক্লিফ পোপ-প্রথা, তাঁর সম্পত্তিবিষয়ক দাবির বিরোধিতা করেন। তিনি এই ধারণাটা প্রচার করেন যে ক্ষমতা যখন সমাজের হিতসাধন করে, কেবল তখনই কোনো কর বা বশ্যতার একটা মানে হয়। তিনি শিক্ষা দেন যে রাষ্ট্র গির্জার ওপর নির্ভরশীল নয়, বরং গির্জারই উচিত ঐহিক ক্ষমতার অধীনে থাকা। রাষ্ট্র জবাবদিহি করবে পোপের কাছে না, ঈশ্বরের কাছে। ইংরেজ রাজদরবার ও অভিজাত কুলের সমর্থন ছিল এইসব কথায়। গির্জা বহু জমির মালিক হতে পারবে এমন অধিকার উইক্লিফ মানতেন না, মনে করতেন যে পোপপ্রথা খ্রিস্টীয় চার্চের একটা অত্যাবশ্যক উপাদান নয়। চোদ্দ শতকের ৭০-এর দশকে, লুথারের প্রায় দেড় শ' বছর আগেই উইক্লিফ চার্চ সংস্কারের পুরো

একটা ব্যবস্থার কথা বলে যান। তিনি পোপ- ও বিশপপ্রথা, সন্ন্যাসধর্ম, সাধুসন্তদের পূজনীয় করে তোলার বিরোধিতা করেন, ধর্মীয় ক্রিয়াকর্মের সরলীকরণ দাবি করেন, আরাধনায় লাতিনের পরিবর্তে ইংরেজি ভাষা ব্যবহারের কথা তোলেন। নিজের অনুগামীদের নিয়ে উইক্লিফ বাইবেলের অনুবাদ করেন ইংরেজি ভাষায় এবং দরিদ্র যাজকদের সাহায্যে প্রচার করেন নিজের মতামত। উইক্লিফের এবম্বিধ মতামত সইতে পারে নি পোপতন্ত্র, গির্জা থেকে তাঁকে বহিষ্কৃত করা হয়।

কেবলমাত্র বাইবেলকে অভ্রান্ত বলে স্বীকার, ঈশ্বর ও লোকেদের মধ্যে পোপের মধ্যস্থতা অস্বীকার, যাজক সম্প্রদায়কে নৈতিক দিক থেকে পুনঃশিক্ষিত করার দাবি ইত্যাদি গুরুত্বপূর্ণ ভাবনা ইয়ান গুস পেয়েছিলেন উইক্লিফের কাছ থেকে। উইক্লিফের মতো ক্যাথলিক চার্চের সমস্ত ফতোয়াই তিনি অবশ্য অস্বীকার করেন নি, তাহলেও তাঁরই মতো বহিষ্কৃত হন চার্চ থেকে। এর পর তিনি পাপস্খালনের জন্য কারুণ্য বিক্রয়কে প্রকাশ্যেই বলতে থাকেন ঈশ্বরদ্রোহ, পোপ অভ্রান্ত এ মতবাদ অস্বীকার করেন, এবং স্বয়ং পোপকেই বলেন অ্যান্টিক্রাইস্ট — খ্রিস্টশত্রু। গির্জার ভূসম্পত্তিকে অযাজকীয় করার যে দাবি তিনি তোলেন, তাতে ইহজাগতিক সম্ভ্রান্তবর্গের সহানুভূতি ছিল।

বাইবেলের চেক অনুবাদের সংশোধন, সাহিত্যিক চেক ভাষা ও বানান নিয়ে অনেক খেটেছিলেন গুস। ক্যাথলিক চার্চ বিরোধী ক্রিয়াকলাপের জন্য কনস্তানৎস ক্যাথিড্রেল তাঁকে মৃত্যুদণ্ডিত করে, পুড়িয়ে মারা হয় তাঁকে।

লুথারের জন্মের দুই বছর আগে মারা যান এরফুর্টের অধ্যাপক ভেজেল। পোপ, 'রক্তবাস পরিহিত বানরটি', মোক্ষদান ফতোয়া, সাধুসন্ত পূজা, অনুশাসন, দীক্ষা ধর্মীয় উপবাসের তীব্র বিরোধিতা করেন তিনি। খুবই সম্ভব যে মোক্ষদান বিষয়ে ভেজেলের মত প্রভাবিত করেছিল লুথারকে, যিনি নিশ্চয় এরফুর্টে ভেজেলের রচনা পাঠ করেছেন।

উইক্লিফ, গুস ও ভেজেলেরও আগে তেরো শতকের গোড়াতেই দক্ষিণ ফ্রান্স ও উত্তর ইতালিতে ক্যাথলিকতন্ত্রের বিরোধিতা করেছিল আলবিগয়ী সম্প্রদায়। এরা ক্যাথলিক আচার-অনুষ্ঠান ও গির্জার সোপান-ব্যবস্থায় আপত্তি করে, ধর্মীয় রূপে প্রকাশ করে সামন্ততন্ত্রের বিরুদ্ধে শহরগুলির ব্যবসায়ী-কারুজীবী অধিবাসীদের প্রতিবাদ। দক্ষিণ ফ্রান্সের অভিজাতদের একাংশ তাদের সঙ্গে যোগ দিয়ে গির্জার ভূসম্পত্তি অযাজকীয় করার দাবি তোলে।

তাই 'প্রথম প্রটেস্ট্যাণ্ট লুথার ছিলেন না।'* নিজে তিনি তাঁর ভাবাদর্শীয় পূর্বসূরীদের সবাকার নাম করেন নি, তবে একাধিকবার, বিশেষ করে তাঁর সংস্কারমূলক ক্রিয়াকলাপের র‍্যাডিকেল পর্বে স্বীকার করেছেন যে তিনি ইয়ান গুসের অনুগামী।

সরাসরি এইরূপ ক্রিয়াকলাপ লুথার শুরু করেন ১৫১৭ সালের ৩১ অক্টোবর। ভিটেনবার্গ রাজকীয় গির্জার দরজাগুলির ওপরে তিনি টাঙান কারুণ্য বিক্রয়ের বিরুদ্ধে, নতুন ধর্মীয় মতবাদ প্রচার করে ৯৫টি থিসিস। তাছাড়া, পোপের যে প্রতিনিধিরা জার্মানিতে কারুণ্য দানের খবরদারি করে তাদের অযোগ্য আচরণের বিরুদ্ধে অভিযোগ সহ থিসিসগুলির আলাদা আলাদা কপি তিনি পাঠান ব্রাণ্ডেনবুর্গ ও মাইনট্সের বিশপের কাছে। লুথারের থিসিসগুলিতে প্রকাশ পায় বিভিন্ন শ্রেণীর — বীরব্রতী সম্প্রদায়, শহুরে লোক, রাজন্যদের একাংশ ও দরিদ্র যাজকদের অসন্তোষ। তা হয়ে দাঁড়ায় জার্মানিতে পেকে-ওঠা বিপ্লবের নিশান, ধর্মসংকারের রূপ নিয়ে তা তুঙ্গবিন্দুতে পেণছয় কৃষক সমরে।

সমগ্রভাবে ধরলে, ক্যাথলিক চার্চের সঙ্গে পরিপূর্ণ বিচ্ছেদের কথা লুথার ভাবেন নি। তাঁর সংস্কার কর্মসূচিতে প্রথম দিকে ছিল কেবল কারুণ্য দানের প্রচলিত রেওয়াজের বিরুদ্ধে এই অভিযোগ যে পাপের জন্য শাস্তি থেকে মানুষকে মুক্তি দেয়ার একটা স্বল্পক্রিয় উপায় এটা।

রোমক-ক্যাথলিক চার্চের বিপরীতে লুথার দেখাতে চেয়েছিলেন যে মানুষ ও তার ঐহিক জীবনকে মূলতই পাপাত্মক বলে ভাবা অনুচিত। মানুষ ও ঈশ্বরের ভেতর গির্জা ও যাজকসম্প্রদায়ের মধ্যস্থতা, তথা ক্যাথলিক চার্চের পক্ষ থেকে লোকেদের 'পাপ স্খালন' ও 'আত্মা ত্রাণের' অধিকার তিনি অস্বীকার করেছিলেন। লুথার এই বক্তব্য উপস্থিত করেন যে মানুষ 'ত্রাণ' বা 'মোক্ষ' পায় গির্জা ও তার আচার-অনুষ্ঠানের মাধ্যমে নয়, 'বিশ্বাসে', যা ঈশ্বরই তাকে দেন। এতে করে যাজক সম্প্রদায়ের পক্ষ থেকে জগতে আধিপত্য করার দাবিই শুধু তিনি অস্বীকার করেন নি, গির্জার রাজনৈতিক ও ভাবাদর্শীয় নিগড় থেকে বার্গার সম্প্রদায়ের মুক্তির প্রয়াস, জাগতিক প্রতিষ্ঠানাদি ও ঐহিক রাষ্ট্রকে ধর্মীয় প্রতিষ্ঠা দেবার আকাঙ্ক্ষাও ব্যক্ত করেছিলেন।

পোপের ফতোয়া, বাণী, ক্যাথিড্রেলের নির্দেশাদির বদলে 'পবিত্র শাস্ত্রের' পুনঃপ্রতিষ্ঠার দাবি করেন তিনি।

ক্যাথলিক চার্চে কারুণ্যদান মারফত পাপ স্খালনের যে প্রথা চালু হয়েছিল, লুথারের মতে তা পরিপূর্ণ ধিক্কারযোগ্য, কেননা কারুণ্য-ক্রেতার পক্ষে তা আত্মপ্রবঞ্চনা এবং এই মোহ তা ছড়ায় যে পাপ সহজে ক্ষমা লাভ করতে পারে।

লুথার লিখেছেন, 'যারা বলে যে বাক্সে টাকা ঝনঝনালেই প্রায়শ্চিত্তালয় থেকে আত্মা উদ্ধার পাবে, তারা ভুল প্রচার করে।... যারা মনে করে যে কারুণ্যদানের মাধ্যমে তারা ত্রাণ পেয়েছে, তারা নিজেদের গুরুর সঙ্গে চিরকালের মতো থাকবে ধিক্কৃত। বিশেষ সাবধান হতে হবে তাদের ক্ষেত্রে যারা বলে যে পোপের মুক্তিদান একটা অমূল্য রত্নভাণ্ডার যা দিয়ে লোকে মিটমাট করে নেয় ঈশ্বরের সঙ্গে।'* তিনি মনে করতেন যে ঈশ্বরের সঙ্গে পাপীর মিটমাট হয় অন্তরের অনুশোচনায়, লোকের আত্মিক পুনর্জন্মের অভ্যন্তরীণ প্রক্রিয়ায়। সেটা সোজাসুজি বলা হয়েছে ৩৬তম থিসিসে: 'যে সত্যি করেই অনুশোচনা করছে, কৃত পাপের জন্য মনস্তাপে ভুগছে, এমন প্রতিটি খ্রিস্টানই পোপের পাপমোচন ছাড়াই ক্ষমা লাভ করবে।'**

তবে কারুণ্য বিক্রয় লুথার অনুমোদন করেছেন নির্দিষ্ট কতকগুলি শর্তে। তিনি শুধু এই মনে করতেন যে কারুণ্যদান পরোপকার ও দয়াদাক্ষিণ্যের স্থান নিতে পারে না, পোপের কারুণ্য ক্রয়ের চেয়ে দরিদ্রকে সাহায্য করা, তৃষিতকে জলদান বেশি ভালো ও হিতকর। কারুণ্য ক্রয় একটা স্বেচ্ছাধীন ব্যাপার, বাধ্যতামূলক নয়।

লুথারের থিসিসগুলি জনসাধারণের জন্য নয়, লেখাও হয়েছে তা লাতিন ভাষায়। তা হলেও জনসাধারণের মধ্যে তা ছড়িয়ে পড়ে আর রোমের পক্ষ থেকে তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগে সমাজের দৃষ্টি আকৃষ্ট হয় তাঁর দিকে। ফ. এঙ্গেলস লিখেছেন: 'ট্যুরিঙ্গেনের অগাস্টিন সাধুর থিসিসগুলি বারুদের পিপেয় বিদ্যুৎস্পর্শের মতো অগ্নিপ্রজ্বালক হয়ে ওঠে।'***

লুথারের বিরুদ্ধে অভিযোগ আনা হল। পোপ যে বিচারসভা নিয়োগ

করে আউগ্‌স্‌বুর্গে ১৫১৮ সালের অক্টোবরে তা লুথারের থিসিসগুলিকে ধর্মদ্রোহ বলে ঘোষণা করে। এগুলি বর্জন করার প্রস্তাব দেয়া হয় তাঁকে। তিনি সম্মত হন না। আউগ্‌স্‌বুর্গ থেকে পালিয়ে যান ভিটেনবার্গে।

লাইপজিগে যে বিতর্ক হয় তাতে লুথার প্রকাশ্যে রোমের পোপের পুণ্যময়তা ও অভ্রান্তিতে সন্দেহ প্রকাশ করেন। এর পর গির্জা থেকে বহিষ্কার ও অভিশাপের ভয় দেখিয়ে তাঁকে তাঁর বিভ্রান্তি বিসর্জন দিয়ে রোমে হাজির হতে বলা হয়। লুথার তার জবাবে পুস্তিকা লিখলেন: 'গির্জার ব্যাবিলোনীয় বন্দিত্ব'। এতে তিনি পোপ এবং গোটা রোমক-ক্যাথলিক চার্চের নিন্দা করেন। ধর্মের ব্যাপারে পোপের ও ক্যাথিড্রালের অভ্রান্ত কর্তৃত্ব, তথা তাঁর আইন দানের অধিকার সম্পর্কে প্রশ্ন তোলেন তিনি।

দেশব্যাপী সমর্থনে ও স্যাক্সনির কুরফিউর্স্ট প্রাজ্ঞ ফ্রিডরিখের রক্ষণাধীনে (জার্মান সংস্কারককে তিনি তাঁর রাজনৈতিক খেলায় একটা গুরুত্বপূর্ণ অস্ত্র বলে মনে করতেন) লুথার রোমে যেতে অস্বীকার করলেন। প্রবল জাতীয় জোয়ারের পরিস্থিতিতে ১৫১৯-১৫২০ সালে লুথার লেখেন জ্বালাময়ী সব পুস্তিকা ও আবেদন যাতে জার্মানিতে বৈপ্লবিক মনোভাব বর্ধিত হয়ে ওঠে। 'জার্মান জাতির খ্রিস্টান অভিজাত সম্প্রদায়ের প্রতি' আবেদনে তিনি ঐহিক ও আত্মিক জ্ঞানের মধ্যে পার্থক্য এবং পবিত্র ধর্মশাস্ত্র ব্যাখ্যায় একমাত্র পোপের অধিকারকে বাইবেল বিরোধী বলে অভিহিত করেন। যাজক পদে নিয়োগ বা অপসারণ হওয়া উচিত সমাজের ইচ্ছায় এবং তারা হবে ঐহিক ক্ষমতার অধীন। পোপের ঐহিক দাবিকে প্রচণ্ড সীমাবদ্ধ রাখা, কার্ডিনালদের সংখ্যা হ্রাস করার প্রস্তাব করেন তিনি, যাজকদের কৌমার্যব্রতকে তিনি 'পৈশাচিক অত্যাচার' বলে তাতে আপত্তি করেন। সেই সঙ্গে আবেদনে এই কথায় জোর দেয়া হয় যে রোমের সঙ্গে সংগ্রাম চালাতে হবে শান্তিপূর্ণ পদ্ধতি, 'কথা দিয়ে', বাইরে থেকে বলপ্রয়োগ করে নয়।

আমূল সংস্কার থেকে পিছু হটলেও ১৫১৯-১৫২০ সালে লুথার রোমক চার্চের সঙ্গে ঘোরতর সংগ্রাম চালিয়ে যেতে থাকেন। ১৫২০ সালের জুনে পোপের নির্দেশপত্রে লুথারের মতবাদকে সরকারিভাবে ধর্মদ্রোহ বলে ঘোষণা করে অভিশাপ দেয়া হয়। জনগণের সমর্থনে সাহস পান সংস্কারক। ১৫২০ সালের ১০ ডিসেম্বর তিনি ভিটেনবার্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের ফটকের সামনে প্রকাশ্যে পোপের নির্দেশপত্র পুড়িয়ে দেন। নির্দেশপত্রের সঙ্গে

সঙ্গে যেসব পুস্তকে আনুশাসনিক বিধানাদি ছিল তাও সঁপে দেওয়া হয় আগুনে।

লুথারের মতবাদ সমগ্রতই বিদ্যমান রাষ্ট্রের স্বীকৃতির ওপর প্রতিষ্ঠিত, বলপ্রয়োগে প্রাধান্যকারী সমাজসম্পর্ক পরিবর্তনের সর্ববিধ প্রয়াসেরই তিনি বিরোধী। লুথার এই অবস্থান সমর্থন করেছিলেন ১৫১৭ সালের অনেক আগে থেকেই। জার্মান সংস্কারক যখন বুঝলেন যে পোপতন্ত্র সংস্কার মানবে না, তখন তিনি সংস্কারের বিশদ কর্মসূচি নিয়ে আবেদন জানান জনগণের কাছে নয়, অভিজাত সম্প্রদায়ের কাছে। গির্জা সংস্কারের গর্ভ থেকে নির্গত সমাজবিপ্লব, সামন্ততান্ত্রিক নিপীড়কদের বিরুদ্ধে জনগণের উত্থান ঘটেছিল লুথারের ইচ্ছার বিপরীতেই। গণবিক্ষোভে তিনি ছিলেন স্পষ্টতই অসন্তুষ্ট। গির্জার ও রাষ্ট্রীয় সংস্কার সাধনে যেকোনো বলাত্মক প্রচেষ্টার শত্রু বলে তিনি নিজেকে ঘোষণা করেন। লুথারের সংস্কার মতবাদে প্রকাশ পেয়েছে জার্মান বার্গার সম্প্রদায়ের শ্রেণীগত সীমাবদ্ধতা। এই যে সম্প্রদায়ের মতপ্রবক্তা হিশেবে তিনি এগিয়ে এসেছিলেন, তারা ক্যাথলিক চার্চের বিরোধিতা করেছে, কিন্তু সমাজসম্পর্কে পরিবর্তনের কথাটার তত্ত্বে আমলই দেয় নি।

তাঁর সমসাময়িক সবার মতো লুথারও 'respublica' অর্থে 'রাষ্ট্র' কথাটা জানতেন না, তার বদলে তিনি ব্যবহার করেছেন 'ক্ষমতা' (obrig-keit)। লুথারের রাজনৈতিক মতবাদের মূলকথাটা হল দুই জগৎ সম্পর্কে তাঁর থিসিস। তাঁর মতে, খ্রিস্টানরা একই সময়ে থাকে আত্মিক ও ঐহিক দুই জগতেই। আত্মিক জগৎ ব্যাপ্ত কেবল খ্রিস্টে যারা বিশ্বাসী তাদের মধ্যে। ঐহিক জগৎ সমস্ত লোকেদের নিয়েই। আত্মিক জগতে ঈশ্বরের কর্তৃত্ব, ঐহিক জগতে ক্ষমতার কর্তৃত্ব, তাতে বলবৎ পার্থিব পরিমাপ, বিচক্ষণতা ও স্বাভাবিক বিধিকে তিনি তার ভেতরে ফেলেছেন। লোকেরা দুই জগতের ক্ষমতাধীন, কেননা প্রকৃতিগতভাবেই তারা মন্দ ও পাপী। ঐহিক জগতে যে ক্ষমতার আধিপত্য তার কাজ হল পাপানুষ্ঠান হতে না দেওয়া, বলপ্রয়োগে লোকেদের কুপ্রবৃত্তি চরিতার্থতায় বাধা দেয়া। লুথার বলছেন, লোকেরা যদি পুণ্যবান হত, তাহলে ক্ষমতা ও রাষ্ট্র থাকার প্রয়োজন হত না।

তাঁর সমস্ত রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গির মতো রাষ্ট্র সম্পর্কেও লুথারের মতবাদের মূল্যায়নে নির্ধারক ব্যাপার হল তার অবজেকটিভ প্রভাবের হিসাব। এই অভিমতে আসার কারণ আছে যে ক্ষমতাকে মান্য করার জন্য লুথারের

প্রচার সামন্তদের ক্ষমতা, পরে বুর্জোয়াদের ক্ষমতাকে বৈধ ও সংহত করায় বহুলাংশে সহায়তা করেছে।

বাইবেলকে ভিত্তি করে লুথার সোৎসাহে প্রচার করেছেন নম্রতা, ঈশ্বর প্রতিষ্ঠিত ক্ষমতার নিকট অন্ধ বশ্যতার মতবাদ: 'সরকারের উচিত ইতরজনের উপর, সমস্ত লোকের উপর প্রভুত্ব করা, প্রহার, দলন, ফাঁসি দান, অগ্নিদগ্ধ, মুণ্ডচ্ছেদ, চক্রপিষ্ট করতে হবে, যাতে লোকে সরকারকে ভয় করে, জনগণকে তা অধীনে রাখতে পারে।'*

১৫২৫ সালে অভ্যুত্থানের প্রস্তুতি প্রসঙ্গে কৃষকেরা ১২ দফায় নিজেদের দাবি সূত্রবদ্ধ করে লুথারের সমর্থনের জন্য পাঠায়, তিনি তা পুরোপুরি নাকচ করে দেন। যেমন, দশমিকা, অর্থাৎ গির্জা ও যাজক সম্প্রদায়ের প্রতিপালনে আয়ের দশমাংশ আদায় তুলে দেবার যে দাবি করে কৃষকেরা, সে প্রসঙ্গে লুথার মন্তব্য করেন: 'অধিকার বলেই দশমিকা তাদের প্রাপ্য' আর ভূমিদাসপ্রথা উচ্ছেদের দাবি তিনি নাকচ করে দেন এই বলে: 'আব্রাহামেরও দাস ছিল'। মৃগয়া ও মৎস্য শিকারের সুবিধা, বন ব্যবহারের অধিকার, বিচার ব্যবস্থার শৃঙ্খলা, ভালো আইন প্রণয়নের ব্যাপারে লুথারের ধারণা যে এগুলি আইনজীবীদের ব্যাপার, তাঁর নয়।

লুথার প্রচার করেন যে তাঁর কাজ হল আদি খিস্টাচারে প্রত্যাবর্তন, কিন্তু শুধু ধর্মের ক্ষেত্রে। কৃষকেরা কিন্তু জার্মান সংস্কারকের চাইতে এগিয়ে গিয়েছিল অনেকদূর। ফ. এঙ্গেলস লিখেছেন, লুথারকে সমর্থন করে তারা দাবি করেছিল 'শুধু গির্জার ব্যাপারে নয়, সামাজিক জীবনেও আদি খিস্টাচারে প্রত্যাবর্তন। তারা মনে করত, পীড়ন ও দাসত্বের যে অবস্থায় তারা রয়েছে, সেটা বাইবেলের শিক্ষার সঙ্গে খাপ খায় না।... সেই কারণেই কৃষকেরা অভ্যুত্থিত হয় এবং নিজেদের প্রভুদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ শুরু করে যা হতে পারত কেবল বিধ্বংসী যুদ্ধই।'** অভ্যুত্থানীদের টুস্কিভক্কাউয়ের ধর্মপ্রচারক টমাস মুনট্সার ধর্মীয় আবরণে সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থার বলপূর্বক উচ্ছেদ ও এমন সমাজশৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠার প্রচার করতেন যাতে কোনো খিস্টানেরই ব্যক্তিগত সম্পত্তিতে অধিকার থাকবে না। অন্যদের ওপর খিস্টানদের ক্ষমতা ও জবরদস্তি, কোনো একটা সরকারি পদের অধিকার বা উত্তরাধিকারসূত্রে ক্ষমতা লাভের বিরোধিতা

করতেন তিনি। তিনি দেখাবার চেষ্টা করতেন যে মানুষ যেহেতু ঈশ্বরের চোখে সমান, তাই পৃথিবীতেও তাদের সমান হতে হবে নিজেদের মধ্যে।

বিপ্লবের সম্মুখীন হয়ে 'কৃষকদের রক্তপিপাসু দস্যুদলের বিরুদ্ধে' লুথার মিলিত হন পোপের সঙ্গে। 'যে পারে তেমন প্রত্যেকের উচিত ওদের **কুড়ুলে কাটা, গোপনে অথবা প্রকাশ্যে ওদের টুঁটি চিপে মারা, পেটানো,** যেমন করে মারা হয় **ক্ষেপা কুকুরকে,'** চিৎকার করে উঠেছিলেন লুথার। 'তাই অনুরাগী ভদ্ররা, সাহায্যে এসো, উদ্ধার করো। যে পারো, পেটাও, মারো, দমন করো ওদের, আর তাতে যদি কারো মৃত্যু হয়, তবে আশীর্বাদ তার ওপর, কেননা এর চেয়ে আশিসধন্য মৃত্যু আর হতে পারে না,' — ১৫২৫ সালে লুথার লিখেছিলেন 'পুস্তিকায়'।*

এর আগে বাইবেল অনুবাদ করে লুথার ইতরজনের আন্দোলনে একটা পরাক্রান্ত অস্ত্র তুলে দেন, যেটা কৃষকেরা কাজে লাগায় রাজন্য, অভিজাত ও পাদ্রিদের বিরুদ্ধে সংগ্রামে, পরে ঐ একই বাইবেলের ভিত্তিতে তিনি অনুমোদন করেন 'ঈশ্বর প্রতিষ্ঠিত' রাজন্য ক্ষমতা, নিঃশর্ত বাধ্যতা ও ভূমিদাস প্রথা। এঙ্গেলস লিখেছেন, 'এটা শুধু কৃষক অভ্যুত্থান নয়, ধর্মীয় ও ঐহিক ক্ষমতার বিরুদ্ধে লুথারের নিজেরই বিদ্রোহ বিসর্জন; এইভাবে লুথার রাজন্যদের অনুকূলে শুধু জন-আন্দোলন নয়, বার্গার আন্দোলনের প্রতিও বিশ্বাসঘাতকতা করেন।'** টমাস মুনট্‌সারকে লুথার শয়তানের হাতিয়ার বলে অভিহিত করেন, রাজন্যদের ডাক দেন দেশ থেকে হাঙ্গামার প্ররোচকদের বহিষ্কার করার জন্য, তারা শুধু ক্ষতিকর মতবাদ প্রচারেই সীমাবদ্ধ থাকছে না, বিদ্রোহ এবং ক্ষমতার বিরুদ্ধে হিংসাত্মক প্রতিরোধের ডাক দিচ্ছে। জনগণের একজন হিশেবে শুরু করে লুথার পরে চলে যান জনগণের নিপীড়কদের পক্ষে।

তবে লুথারের ক্রিয়াকলাপ একটা বড়ো স্থান অধিকার করেছে জার্মানির ইতিহাসে। ১৯৬৭ সালে গণতান্ত্রিক জার্মানি ও ফেডারেল জার্মানি সমেত পশ্চিম ইউরোপের বেশ কয়েকটি দেশে উদ্‌যাপিত হয় সংস্কারের ৪৫০তম বর্ষ।

লুথারের ক্রিয়াকলাপে, তাঁর দৃষ্টিভঙ্গিতে আছে দুটি দিক — প্রগতিশীল ও রক্ষণশীল, এমনকি প্রতিক্রিয়াশীলই। ঠিক এই দ্বিতীয়

দিকটাকেই তুলে ধরেছে ও তার গুণগান করেছে বুর্জোয়া ভাবাদর্শীরা।

আ. বেবেল লিখেছেন, 'বিপ্লবী দলগুলির প্রতি লুথারের মনোভাব থেকে বোঝা যায় কেন বর্তমানের বুর্জোয়ারা তাঁকে বীর বলে সম্মান করে চলেছে: তাঁর মধ্যে বুর্জোয়া দেখতে পায় নিজেদের পূর্বসূরী ও শিক্ষাদাতাকে।'*

বুর্জোয়াদের কাছে লুথার আপনজন সর্বাগ্রে এই কারণে যে ১৫১৭ থেকে ১৫২৫ সাল অবধি তিনি সেই বিবর্তনের মধ্য দিয়ে গেছেন, সাময়িকভাবে আন্দোলনের নেতৃত্বে থেকে সমস্ত বুর্জোয়া পার্টিই যার মধ্য দিয়ে যায়। তাঁর আচরণ পুরোপুরি খাপ খায় বুর্জোয়া উদারনীতিকদের রণকৌশলের সঙ্গে, যারা বিপ্লবী শুধু অতি সুনির্দিষ্ট একটা সীমা পর্যন্ত।

দীর্ঘকাল ধরে জার্মানিতে রাষ্ট্র তত্ত্বের বিকাশ প্রভাবিত হয়েছে ঠিক অথবা বেঠিকভাবে ব্যাখ্যাত লুথারীয় মতবাদে। এ কথাটা বিশেষভাবে খাটে প্রজাদের কাছ থেকে আইন মেনে চলার দাবি উপস্থাপনে। গুরুত্বপূর্ণ একথাটাও মনে রাখা দরকার যে বর্তমানে লক্ষ লক্ষ লোক লুথারীয় ধর্মের অনুগামী।

আধুনিক মার্কসবাদী ইতিহাসবিদ্যায় সংস্কারকে ধরা হয় সামন্ততন্ত্র থেকে পুঁজিবাদে উৎক্রমণকালের আদি বুর্জোয়া বিপ্লবের অঙ্গাংশ।

লুথারের ক্রিয়াকলাপের, এমনকি বিশুদ্ধ আধ্যাত্মিক ক্ষেত্রেরও প্রগতিশীল, অবজেকটিভ ফলাফলের বৈপ্লবিক দিকটা উপেক্ষা করে না মার্কসীয় রাজনৈতিক ভাবনা। ক. মার্কস লিখেছেন, 'এমনকি ঐতিহাসিক দৃষ্টিকোণ থেকে তাত্ত্বিক মুক্তি জার্মানির পক্ষে বিশেষ ব্যবহারিক তাৎপর্য ধরে। জার্মানির **বৈপ্লবিক** অতীত তো তত্ত্বের দিক থেকে **সংস্কার**। যেমন তখন বিপ্লব শুরু হয়েছিল **সাধুর** মস্তিষ্কে, তেমনি এখন তা শুরু হচ্ছে **দার্শনিকের** মস্তিষ্কে।'**

নামের সূচি

মার্কস (Marx), **কার্ল** (১৮১৮-১৮৮৩) — বৈজ্ঞানিক কমিউনিজমের প্রতিষ্ঠাতা, আন্তর্জাতিক প্রলেতারিয়েতের নেতা, প্রতিভাবান মনীষী। জন্ম ট্রিয়র শহরে (প্রাশিয়া), আইনজীবী পরিবারে। বার্লিন বিশ্ববিদ্যালয়ে আইনের কোর্স শেষ করেন। ইতিহাস ও দর্শনে বিপুল আগ্রহ দেখান। ১৮৪২ সালে 'রাইন পত্রিকা'র সম্পাদক, যার পাতায় তখনকার প্রাশিয়ায় এবং গোটা জার্মানিতে যে সামাজিক, রাজনৈতিক ও আত্মিক পীড়ন চলছিল, তার বিরুদ্ধে প্রচণ্ড সংগ্রাম চালানো হয়। পত্রিকা বন্ধ হয়ে যাবার পর প্যারিসে আসেন, তারপর লণ্ডনে। এঙ্গেলসের সঙ্গে একত্রে বৈপ্লবিক তত্ত্ব সৃষ্টি এবং কমিউনিস্ট পার্টি সংগঠনে বিপুল কাজ করেন। 'কমিউনিস্ট পার্টির ইশতেহার' তাঁরা রচনা করেন, যাতে মার্কসবাদের মূল ভাবনা এবং প্রলেতারিয়েতের সংগ্রামের অন্তিম লক্ষ্যের কথা ঘোষিত হয়। মার্কস ছিলেন ১ম আন্তর্জাতিকের সংগঠক ও নেতা। একই সময়ে তিনি খাটেন তাঁর মূল গ্রন্থ 'পুঁজি' নিয়ে। আন্তর্জাতিক শ্রমিক আন্দোলনের ইতিহাসে একটা বিরাট ঘটনা হয়ে দাঁড়ায় 'পুঁজি'র ১ম খণ্ডের প্রকাশ। মার্কসের অর্থনৈতিক মতবাদে অর্থশাস্ত্রে বিপ্লব সূচিত হয়, পুঁজিবাদী পীড়নের বিরুদ্ধে সংগ্রামে তা হয়ে দাঁড়ায় প্রলেতারিয়েতের পরাক্রান্ত মানসিক অস্ত্র। —১, ৩১, ৩৮, ৫৮, ৬১, ৬২, ৬৮, ৭৩, ৭৬, ১২৫, ১৪৬, ১৪৮, ১৭৯, ২১১, ২২০, ২২৬, ২৪৬।

এঙ্গেলস (Engels), **ফ্রিডরিখ** (১৮২০-১৮৯৫) — বৈজ্ঞানিক কমিউনিজমের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা, ক. মার্কসের বন্ধু ও সহযোদ্ধা। জন্ম বার্মেনে (প্রাশিয়া), কলওয়ালা, সুতাকল মালিকের পরিবারে। মেহনতিদের দারিদ্র্যে সহানুভূতি বোধ করতেন। ১৮৪২ সালে ইংলণ্ডে আসেন, সেখানে 'এর্মেন অ্যাণ্ড এঙ্গেলস' ফার্মের বাণিজ্য দপ্তরে কাজ শুরু করেন। ইংরেজ শ্রমিক শ্রেণীর অবস্থা গভীরভাবে পর্যালোচনা করে তিনি 'রাইন পত্রিকা' ও অন্যান্য প্রকাশনায় পুঁজিবাদের পরিস্থিতিতে প্রলেতারিয়েতের নিঃস্বীভবন নিয়ে কতিপয় প্রবন্ধ প্রকাশ করেন। ১৮৪৪ সালে মার্কসের সঙ্গে সাক্ষাতের পর শুরু হয় বৈপ্লবিক তত্ত্ব সংরচন ও কমিউনিস্ট পার্টি গঠন নিয়ে একত্র কার্যকলাপের দীর্ঘ পর্ব।

১৮৪৮ সালে তাঁরা লেখেন 'কমিউনিস্ট পার্টির ইশতেহার' — মার্কসবাদের প্রথম কর্মসূচিগত দলিল। এঙ্গেলসের প্রভাবে মার্কস অর্থশাস্ত্র নিয়ে গবেষণা শুরু করেন এবং তাতে পুরো একটা বিপ্লব ঘটান। মার্কসের মৃত্যুর পর এঙ্গেলস ইউরোপীয় সমাজতন্ত্রীদের উপদেশক ও নেতার কাজ চালিয়ে যেতে থাকেন। — ৮, ৩৮, ৬১, ৬২, ৭৩, ৭৬, ৮৮, ১৪৭, ১৪৮, ১৭৭, ১৮১, ২১৭, ২১৯, ২২০, ২৪১, ২৪৪, ২৪৫।

লেনিন (উলিয়ানভ), ভ্লাদিমির ইলিচ (১৮৭০-১৯২৪) — অসাধারণ এক মানবিক প্রতিভা, সোভিয়েত ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টির স্রষ্টা, সোভিয়েত সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠাতা। জন্ম সিম্বির্স্ক (বর্তমানে উলিয়ানোভস্ক) শহরে, স্কুল পরিদর্শকের পরিবারে। ১৮৮৭ সালে কাজান বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন বিভাগে প্রবেশ করেন। ছাত্রদের মধ্যে বৈপ্লবিক কাজকর্মের জন্য বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বহিষ্কৃত হন। বাইরের ছাত্র হিশেবে পিটার্সবুর্গ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে আইনের ডিগ্রি পান। ১৮৯৩ সালে পিটার্সবুর্গ চলে আসেন এবং সেখানকার মার্কসবাদীদের নেতা হয়ে দাঁড়ান। ১৮৯৫ সালে সমস্ত মার্কসবাদী শ্রমিক চক্রগুলিকে ঐক্যবদ্ধ করেন একটি সংগঠনে — 'শ্রমিক শ্রেণীর মুক্তির জন্য সংগ্রামের ইউনিয়ন' — যা ছিল বৈপ্লবিক পার্টির প্রথম গুরুত্বপূর্ণ ভ্রূণ। ১৮৯৫ সালের ডিসেম্বরে ধৃত হন ও কারাবাসে থাকেন এবং ১৮৯৭ সালে ৩ বছরের জন্য সাইবেরিয়ায় নির্বাসিত হন। সেখানে তিনি ৩০টির বেশি রচনা লেখেন। নির্বাসন থেকে ফেরার পর জেনেভায় আসেন, সেখান থেকে 'ইস্ক্রা' পত্রিকা প্রকাশ করতে থাকেন, শ্রমিক শ্রেণীর মার্কসবাদী বৈপ্লবিক পার্টি গঠনে যার নির্ধারক ভূমিকা ছিল। ১৯১৭ সালের জুনে সাময়িক সরকারের বিরুদ্ধে সশস্ত্র অভ্যুত্থানের প্রস্তুতি শুরু করেন এবং সরাসরি অক্টোবর বিপ্লব ঘটান ও তার পরিচালনা করেন। বিপ্লবের ও বৈদেশিক হস্তক্ষেপকারী শক্তির বিরুদ্ধে দেশের প্রতিরক্ষার ব্যবস্থা করেন এবং তারা চূর্ণ হবার পর জাতীয় অর্থনীতির পুনঃপ্রতিষ্ঠা ও পুনর্গঠনের পরিকল্পনা, সমাজতন্ত্রের অর্থনৈতিক বনিয়াদের পরিকল্পনা রচনা করেন। —১০, ৩৫, ৩৮, ৬২, ৭০, ৭৩, ৭৬, ১২৩, ১৪৮, ১৭৯, ২২৫, ২২৬, ২৩৫।

অ

অগাস্টিন, সেন্ট (আশিসধন্য) (Augustinus Sanctus), আরেলিয়াস (৩৫৪-৪৩০) — হিপনের (উত্তর আফ্রিকার) বিশপ। ধর্মীয় গোঁড়ামির প্রবর্তক, অন্য ধর্মবিশ্বাসীদের কঠোরভাবে দমন করার

আ

ই

উ

গির্জার জমিকে লোকায়তকরণের (রাষ্ট্রীয় সম্পত্তিতে পরিণতি) দাবি করেন। — ২৩৮, ২৩৯।

উইনস্টেনলি (Winstanley), **জেরার্ড** (১৬০৯-১৬৫২) — ১৭ শতকের ইংলণ্ডে বুর্জোয়া বিপ্লবের সময় 'ডিগার'দের (স্বল্পভূমি কৃষক ও ক্ষেতমজুরদের) আন্দোলনের নেতা ও ভাবাদর্শী। ইংলণ্ডে গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠার দাবি করেন। — ৩২।

ও

ওয়েন, (Owen), **রবার্ট** (১৭৭১-১৮৫৮) — মহান ইংরেজ ইউটোপীয় সমাজতন্ত্রী, বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রের অন্যতম অগ্রদূত। শ্রমিকদের অবস্থা উন্নয়নের জন্য তিনি লড়াই করেন। তাঁর ক্রিয়াকলাপ ইংলণ্ডের ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনের বিকাশে প্রবল একটা প্রেরণা যোগায়। — ১৪২।

ক

কনর্ডোর্সে (Condorcet), **জাঁ আঁতুয়াঁ দে** (১৭৪৩-১৭৯৪) — ফরাসি আলোকদাতা, সমাজবিদ, ১৮ শতকের শেষের ফরাসি বুর্জোয়া বিপ্লবের একজন কর্মকর্তা। — ৬৮।

কনফুশিয়াস (কুন ফু-ৎস্‌জি) (Confucius) (খ্রিঃ পূঃ ৫৫১-৪৭৯) — প্রাচীন চীনের দার্শনিক, নৈতিক-রাজনৈতিক মতবাদের স্রষ্টা হিশেবে বিশ্বখ্যাতি লাভ করেছেন। কনফুশিয়াসের মূল নীতিসূত্র হল 'জেন' (মানবতা) দ্বারা নির্ধারিত হওয়া উচিত লোকেদের মধ্যে সম্পর্ক। সমাজ ও পরিবারে কঠোরভাবে লোকের অবস্থা অনুসারে চলার দাবি করেন তিনি। — ৩৪, ৫৩, ৮২—৮৪, ১০৯—১২১, ২২৩।

কাণ্ট, (Kant), **ইম্মানুয়েল** (১৭২৪-১৮০৪) — জার্মান দার্শনিক, ১৮ শতকের শেষ ও ১৯ শতকের গোড়াকার জার্মান ভাববাদের প্রতিষ্ঠাতা। কাণ্টের দর্শনের মূল ধারা হল ''বিচারবুদ্ধিকে' সীমিত রেখে বিশ্বাসকে দৃঢ় করা'। তিনি মনে করেন যে বিশ্ব পরিপূর্ণ 'তৎসত্তার বস্তুতে', যাদের অবজেকটিভ অস্তিত্ব আছে, কিন্তু তা প্রজ্ঞানের অনায়ত্ত; দেশ এবং কাল হল ধ্যানের সাবজেকটিভ রূপ, যা বোধের শৃঙ্খলীকরণ, বিচারবুদ্ধিই। প্রকৃতির নিয়মদাত। — ৫৩, ৫৭, ৬৪, ৬৮, ৭২, ৭৫, ১৪৩—১৪৫, ১৬৪, ১৭৩, ১৭৪।

কাম্পানেলা (Campanella), **তোমাসো** (১৫৬৮-১৬৩৯) — ইতালীয় ইউটোপীয় কমিউনিস্ট। স্পেনের আধিপত্য থেকে ইতালির স্বাধীনতার জন্য সংগ্রাম করেন। কালাব্রিতে অভ্যুত্থানের আয়োজন করেন, সেজন্য ১৫৯৮ সালে তিনি কারারুদ্ধ হন। সেখানে থাকেন ২৭ বছর। কারায় তিনি লেখেন 'সূর্যের নগর' গ্রন্থ। তাতে তিনি একটা আদর্শ সমাজের

বর্ণনা করেছেন, যেখানে ব্যক্তিগত মালিকানা নেই, সামাজিক অসাম্য দূর হয়েছে, শ্রম হয়ে দাঁড়িয়েছে প্রতিটি লোকের অভ্যন্তরীণ চাহিদা ও সম্মানের ব্যাপার। — ১৪১।

কুইন্টিলিয়ান (Quintillian), **মার্ক ফাবি** (আনুঃ ৩৫-৯৫) — রোমের অলংকারশাস্ত্রী, বাকপটুতার শিক্ষক, 'বাগ্মিতার উপদেশ' নামে বই লেখেন। — ৫৬, ৮৮।

কেলজেন (Kelsen), **হানস** (১৮৮১—) অস্ট্রিয়ার ব্যবহারশাস্ত্রী। আইনের নর্মাটিভ স্কুলের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা, ব্যাপক প্রচারিত 'বিজ্ঞান থেকে ভাবাদর্শের বিচ্ছেদ' ধ্বনির প্রবর্তক। — ৬৭।

কোঁতে (Comte), **অগাস্ত** (১৭৯৮-১৮৫৭) — ফরাসি দার্শনিক ও সমাজবিদ, অজ্ঞেয়বাদী, দৃষ্টবাদের প্রবর্তক, বিজ্ঞানের আনুষ্ঠানিক, কৃত্রিম শ্রেণীবিভাগ করেন। পুঁজিবাদী ব্যবস্থাকে চিরস্থায়ী করে তোলা এবং সমাজের বৈপ্লবিক পুনর্গঠনে বাধা দেবার চেষ্টা করেন। — ৬৮।

কৌটিল্য (চানক্য) (জন্ম ও মৃত্যুর বৎসর জানা নেই) — প্রাচীন ভারতের রাষ্ট্রীয় কর্মকর্তা। কৌটিল্যকে 'অর্থশাস্ত্র' নামক গ্রন্থের প্রণেতা বলে ধরা হয়। এতে বিস্তারিত পুলিসী ব্যবস্থা ও প্রবল রাজক্ষমতা নিয়ে এক আদর্শ রাষ্ট্রের বর্ণনা আছে, যাকে শক্তিশালী করার জন্য যেকোনো উপায় অবলম্বনীয়। — ৩৪, ১০৩।

ক্রিজানিচ, ইউরি (আনুঃ ১৬১৮-১৬৮৩) — ১৭ শতকের স্লাভ জাতির বৈজ্ঞানিক ও সামাজিক-রাজনৈতিক চিন্তার প্রতিনিধি। ক্রিজানিচের কর্মসূচি ছিল নিরংকুশ রাজতন্ত্রের শক্তিবর্ধনের উদ্দেশ্যে চালিত। — ২২২।

ক্রোচে (Croce), **বেনেদেত্তো** (১৮৬৬-১৯৫২) — ইতালীয় দার্শনিক ও রাজনৈতিক কর্মকর্তা, ঐতিহাসিক ও সাহিত্য সমালোচক, মার্কসবাদের প্রতিপক্ষ। — ৬৩, ৬৪।

গ

গাইয়াস *(Gaius)* (২ শতক) — রোমের ব্যবহারশাস্ত্রী। তাঁর প্রধান রচনা 'ইনস্টিটিউশন' (ব্যক্তিগত আইনের মূল প্রথাগুলির নিবন্ধন)। — ৫৬, ৮৮, ২০২, ২০৫, ২০৯—২১২।

গুস (Hus), **ইয়ান** (১৩৬৯-১৪১৫) — মহান চেক দেশপ্রেমিক, চেখিয়ায় রিফর্মেশন আন্দোলনের প্রমুখ কর্মী। জার্মানদের এবং ক্যাথলিক গির্জার বিরুদ্ধে সংগ্রামে তিনি উদ্বুদ্ধ করেন চেক জনগণকে। জার্মান সম্রাট সিগিজমুণ্ড গুসকে বেইমানি করে ভুলিয়ে নিয়ে আসেন কনস্তানসিয়ায় গির্জার সভায়, যা তাঁকে আগুনে পুড়িয়ে মারার দণ্ড দেয়। — ২৩৮—২৪০।

গের্ৎসেন, আলেক্সান্দর ইভানোভিচ (১৮১২-১৮৭০) — মহান রুশ বিপ্লবী

দ

ন

প

সাবজেকটিভ ভাববাদী, ১৮ শতকের শেষ ও ১৯ শতকের গোড়াকার জার্মান ভাববাদী দর্শনের অন্যতম বৃহৎ প্রতিনিধি। রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গিতে রাজতন্ত্রবাদী ও জাতীয়তাবাদী। — ৭২, ৭৫, ৭৬, ১৪৪, ১৬৪।

ফুরিয়ে (Fourier), **শার্ল** (১৭৭২-১৮৩৭) — মহান ফরাসি ইউটোপীয় সমাজতন্ত্রী। বুর্জোয়া ব্যবস্থার তীব্র সমালোচনা করে ভবিষ্যৎ সমাজের ছবি আঁকেন, যাতে সমস্ত মানবিক সামর্থ্য বিকশিত হবে। তাঁর আদর্শের রূপায়ণকে তিনি জড়িত করেন বিপ্লবের সঙ্গে নয়, লোকেদের পুনঃশিক্ষায়। — ১৪২।

ব

বদেন (Bodin), **জান** (১৫৩০-১৫৯৬) — ফরাসি রাজনৈতিক মনীষী, রাষ্ট্রবিদ ও সমাজবিদ। পরারাজতন্ত্রের তাত্ত্বিক। — ১৩৭, ১৭১।

বসসুইয়ে (Bossuet), **জাক বেনিন** (১৬২৭-১৭০৪) — ফরাসি যাজক, সামন্ততান্ত্রিক-ক্যাথলিক প্রতিক্রিয়র ও পরারাজতন্ত্রের ভাবাদর্শী। ১৭ শতকের জায়মান বস্তুবাদ ও নাস্তিক্যতার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করেন। জনাধিকার এবং জনগণের সার্বভৌমত্ব বিষয়ক তত্ত্বের বিরোধিতা করেন। — ২২১।

বাবেফ (Babeuf), **গ্রাখাস** (আসল নাম **ফ্রাঁসুয়া নোয়েল**) (১৭৬০-১৭৯৭)— ফরাসি বিপ্লবী, ইউটোপীয় কমিউনিস্ট। সমমাত্রিক কমিউনিজমের অন্যতম প্রবক্তা। জায়মান ফরাসি প্রলেতারিয়েতের স্বার্থ প্রকাশ করেন। বিপ্লবের মাধ্যমে ব্যক্তিগত মালিকানা ধূলিসাৎ করার ডাক দেন।—২৫।

বার্কের (Barker), **এডমন্ড** (১৭২৯-১৭৯৭) — ইংরেজ রাজনৈতিক কর্মকর্তা ও প্রাবন্ধিক। ১৮ শতকের শেষে ফরাসি বুর্জোয়া বিপ্লবের বিরুদ্ধে ইউরোপীয় রাজতন্ত্রগুলির যুদ্ধের অন্যতম প্রেরণাদাতা। — ৫৭, ১৭০।

বার্নার্ড, ক্লেরভের (Bernard of Clairvaux) (১০৯০-১১৫৩) — পশ্চিম ইউরোপের যাজক ও রাজনৈতিক কর্মকর্তা। পশ্চিম ইউরোপের মানসজীবনে অতি প্রতিক্রিয়াশীল ধর্মীয়-অতীন্দ্রিয়বাদী ধারার একজন বড়ো দরের প্রতিনিধি। — ২১৮।

বেক্কারিয়া (Beccarie), **চোজারে** (১৭৩৮-১৭৯৪) — ইতালীয় ব্যবহারশাস্ত্রী ও প্রাবন্ধিক। 'অপরাধ ও শাস্তি' গ্রন্থে সামন্ততন্ত্রের সঙ্গে সংগ্রামরত বুর্জোয়ার দাবি প্রকাশ করেন। — ৯।

ব্রুটাস (Brutus), **মার্ক ইউনিয়াস** (খ্রিঃ পূঃ ৮৫-৪২) — সিজারের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রের অন্যতম নায়ক। — ১৪৯, ২০৯।

ভ

ভলফ (Wolf), **খিস্টিয়ান** (১৬৭৯-১৭৫৪) — জার্মান ভাববাদী দার্শনিক, লেইবনিট্সের অনুগামী। ভলফের আধিবিদ্যক দর্শনের সর্বোচ্চ নীতি হল বস্তু ও চিন্তার মধ্যে বিরোধ অস্বীকার। এঙ্গেলস ভলফের ওঁছা টেলিওলজিকে বিদ্রূপ করেন: 'তদনুসারে বেড়ালের সৃষ্টি হয়েছে ইঁদুর খাবার জন্য, ইঁদুরের সৃষ্টি বিড়ালের ভক্ষ্য হবার জন্য, আর গোটা প্রকৃতির সৃষ্টি সৃষ্টিকর্তার প্রজ্ঞা প্রমাণের জন্য'। — ১৪২।

ভল্টেয়ার (Voltaire), **ফ্রাঁসুয়া-মারি** (১৬৯৪-১৭৭৮) — বিখ্যাত ফরাসি লেখক, দার্শনিক, জ্ঞানপ্রচারক। ১৮ শতকের ফরাসি বুর্জোয়া বিপ্লবের ভাবাদর্শীয় প্রস্তুতিতে বড়ো ভূমিকা নেন। সামন্ততান্ত্রিক ভাবাদর্শ, বিশেষ করে ক্যাথলিক মত ও ধর্মীয় গোঁড়ামির তীব্র সমালোচনা করেন। তবে সামন্ততান্ত্রিক-অধিরাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার মুখোশ খুললেও ভল্টেয়ারের আদর্শ আলোকপ্রাপ্ত রাজতন্ত্র আর দর্শন — ডেইবাদের বেশি যায় নি। — ২৮, ৬৮, ১৪৩।

ভিকো (Vico), **জাম্বাতিস্ত** (১৬৬৮-১৭৪৪) — ইতালিয়ান সমাজবিদ, দার্শনিক, ব্যবহারশাস্ত্রী, ক্যাথলিক মতের সমর্থক। সমাজ বিকাশে আধিবিদ্যক আবর্তন তত্ত্বের প্রণেতা। সে তত্ত্ব অনুসারে মানবজাতি বিকাশের কয়েকটা পর্যায় ও সাময়িক অগ্রগতি পেরিয়ে ফিরে আসে যাত্রাবিন্দুতে। — ৫৬, ৫৭, ৬৪।

ভেবের, (Weber), **মাক্স** (১৮৬৪-১৯২০) — জার্মান প্রতিক্রিয়াশীল সমাজবিদ। — ৬৭, ৭৫।

ভ্লাদিমির মনোমাখ (১০৫৩-১১২৫) — কিয়েভের মহান প্রিন্স। রাষ্ট্রীয় কর্মকর্তা, সেনাপতি, লেখক। খণ্ডবিখণ্ড রুশ প্রিন্সতন্ত্রকে ঐক্যবদ্ধ করতে চেয়েছিলেন। — ২২২।

ম

মঁতেস্ক্যু (Montesquieu), **শার্ল লুই** (১৬৮৯-১৭৫৫) — ফরাসি জ্ঞানপ্রচারক, উদারনৈতিক বুর্জোয়ার মতাদর্শী। সামন্ততান্ত্রিক পরারাজতন্ত্রের বিরোধিতা করে সমর্থন করেন নিয়মতান্ত্রিক রাজতন্ত্র, যা ছিল অভিজাতদের সঙ্গে বুর্জোয়াদের একটা আপোস। ক্ষমতা বিভাগ তত্ত্বের স্রষ্টা। — ৫৭, ৭২, ১৩৭, ১৪২, ১৪৩, ১৭২, ১৯৬।

মডেস্টিনাস (Modestinus), **গেরেন্নি** (জন্ম-মৃত্যুর বছর অজ্ঞাত) — রোমের ব্যবহারশাস্ত্রী। রোমের প্রমুখ ব্যবহারশাস্ত্রী উলপিয়ানের ছাত্র। মডেস্টিনের রচনাগুলিকে বাধ্যতামূলক ব্যবহারশাস্ত্রীয় জ্ঞান বলে গণ্য করা হয়। — ৫৬, ৮৮।

মরেলি (Morelly) (নাম এবং জন্ম-মৃত্যুর বছর অজ্ঞাত) — ১৮ শতকের

প্রমুখ ফরাসি ইউটোপীয় কমিউনিস্ট। সমস্ত সামাজিক অভিশাপের উৎস হিশেবে ব্যক্তিগত মালিকানার উচ্ছেদ দাবি করেন। তাঁর দৃষ্টিভঙ্গির সীমাবদ্ধতা প্রকাশ পায় সরল ধরনের সমমাত্রিকতা প্রচারে। — ১৪২।

মাকিয়াভেলি (Mackiavelli,) **নিকোলো দি বের্নার্দো** (১৪৬৯-১৫২৭) — ইতালিয়ান রাজনৈতিক কর্মকর্তা ও ঐতিহাসিক, বুর্জোয়ার ভাবাদর্শী, পরারাজতন্ত্রের পক্ষপাতী। — ৫৩, ১০৩, ১৩৭, ১৭০, ১৭১, ১৭৩।

মাব্লি (Mably) **গাব্রিয়েল দে** (১৭০৯-১৭৮৫) — ফরাসি সামাজিক-রাজনৈতিক মনস্বী, ইউটোপীয় কমিউনিস্ট। জনগণের সার্বভৌমত্বের ধারণা প্রচার করেন তিনি, ব্যক্তিগত মালিকানার ওপর প্রতিষ্ঠিত সমাজের বিপরীতে তিনি দাঁড় করান আদর্শ কমিউনিস্ট ব্যবস্থাকে, তাঁর মতে, যা অতীতে বিদ্যমান ছিল। — ১৪২।

মার্সিলিয়াস, পাদুয়ার (Marsilius Paduanis) (১২৭৫ ও ১২৮০'র মধ্যে-আনুঃ ১৩৪৩) — ইতালীয় মনীষী, বুর্জোয়া শীর্ষের ভাবাদর্শী। সামাজিক চুক্তির ফলে রাষ্ট্রের উদ্ভব হয়েছে এ ভাবনা যাঁরা প্রথম উপস্থিত করেন, তাঁদের একজন। রাজতন্ত্রকে মনে করতেন রাষ্ট্রের সেরা রূপ। — ১৪১, ১৭০, ২১৯।

মুর (More), **টমাস** (১৪৭৮-১৫৩৫) — প্রমুখ ইংরেজ মানববাদী মনীষী, ইউটোপীয় সমাজতন্ত্রের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা। 'ইউটোপিয়া' গ্রন্থে তিনি তাঁর সমসাময়িক ইংলণ্ডের সমাজ ব্যবস্থার সমালোচনা করে সামাজিক মালিকানার ওপর প্রতিষ্ঠিত এক আদর্শ সমাজের ছবি আঁকেন। সমাজতান্ত্রিক ভাবধারার বিকাশে মুরের দৃষ্টিভঙ্গি বড়ো একটা ভূমিকা নেয়। — ১৪১।

মেন ৎসজি (খ্রিঃ পূঃ (৩৭২-২৮৯) — প্রাচীন চীনের মনীষী, কনফুশিয়াসের অনুগামী। মানবিক প্রশাসনের ডাক দেন। সর্বোচ্চ শাসক থাকা সম্ভব তা মানেন। — ১১৯।

মেস্ত্র (Maistre), **জোসেফ দে** (১৭৫৩-১৮২১) — ফরাসি দার্শনিক ও লেখক। ১৮ শতকের শেষ দিককার ফরাসি বুর্জোয়া বিপ্লব ও জ্ঞানপ্রচারকদের দর্শনের চরম শত্রু, চরম যাজকপন্থী। — ৫৭।

মোজেস (Moses) — কিংবদন্তীর পয়গম্বর ও আইনদাতা। মিশরে নিয়ে যাওয়া ও দাস করে রাখা ইজরাইল উপজাতিগুলির নেতা, তাদের নিয়ে আসেন সিনাই মরুভূমিতে। — ৮৮।

র

রিশেলিয়ে (Richelieu), **আরমাঁ জাঁ দিউ প্লেসিস** (১৫৮৫-১৬৪২) — ফরাসি রাষ্ট্রীয় কর্মকর্তা, পরারাজতন্ত্রবাদের বৃহৎ প্রতিনিধি। রাষ্ট্রের কেন্দ্রীভূত ক্ষমতা বাড়িয়ে তুলতে চেষ্টা করেন। — ২৮।

রুসো (Rousseau), **জাঁ জাক** (১৭১২-১৭৭৮) — ফরাসি জ্ঞানপ্রচারক, মনীষী, পেটি-বুর্জোয়া গণতন্ত্রী, ১৮ শতকের ফরাসি বুর্জোয়া বিপ্লবের ভাবাদর্শ প্রস্তুতিতে বড়ো একটা ভূমিকা নেন। রুসোর সামাজিক মতবাদ বস্তুবাদী প্রবণতাক্রান্ত। তাঁর প্রধান রচনা: 'অসাম্যের উদ্ভব ও প্রতিষ্ঠা বিচার', 'সামাজিক চুক্তি বা রাজনৈতিক আইনের নীতি'। — ১৫, ২৮, ৭২, ৭৬, ১৪২, ১৪৩, ১৫৩, ১৭০, ১৭২, ১৭৩।

ল

লক (Locke), **জন** (১৬৩২-১৭০৪) — ইংরেজ বস্তুবাদী দার্শনিক। লক সংবেদনবাদ প্রণয়ন করেন, এটি হল — সমস্ত জ্ঞানের উদ্ভব ইন্দ্রিয়গত অভিজ্ঞতা থেকে — এই তত্ত্ব। — ৭২।

লাও-ৎসজি (**লি এর**) — প্রাচীন চীনের দার্শনিক, কিংবদন্তি অনুসারে কনফুশিয়াসের সমকালীন। খিঃ পূঃ ৪-৩ শতকে লেখা হয় 'লাও-ৎসজি' গ্রন্থ, তাতে সে সময়কার ধর্মীয় ও সামাজিক-রাজনৈতিক ঐতিহ্যের তীব্র সমালোচনা করা হয়। অস্বীকার করা হয় ঈশ্বরের অস্তিত্ব, দাবি করা হয় যে সবই ঘটছে মানুষের চেতনা থেকে স্বাধীন 'দাও' থেকে। — ৮২, ৮৩।

লিকোফ্রন (Lycophron) (আনুঃ খিঃ পূঃ ৩২০) — গ্রীক কবি ও বৈয়াকরণ। 'আলেকজাণ্ডার' কাব্য তাঁর রচিত বলে ধরা হয়, ট্রয়ের পতনের পর গ্রীকদের ভাগ্য সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণী তার বিষয়বস্তু। — ৮৭।

লুথার (Luther), **মার্টিন** (১৪৮৩-১৫৪৬) — জার্মানিতে রিফর্মেশনের প্রমুখ কর্মকর্তা, লুথারবাদের প্রতিষ্ঠাতা। সামন্ততন্ত্রের বিরুদ্ধে সংগ্রামের বৈপ্লবিক পদ্ধতির তীব্র সমালোচনা করেন লুথার। জার্মানিতে ১৫২৫ সালে কৃষক সমরের সময় কৃষকদের ওপর নিষ্ঠুর দলনের ডাক দেন। — ২২০, ২৩৬, ২৩৮—২৪৬।

শ

শেলিঙ (Schelling), **ফ্রিডরিখ** ভিলহেল্ম (১৭৭৫-১৮৫৪) — বিশিষ্ট জার্মান দার্শনিক, অবজেকটিভ ভাববাদী, ১৯ শতকের প্রাকৃতিক দর্শনের বৃহৎ প্রতিনিধি। সামন্ততান্ত্রিক রাজতন্ত্রের পক্ষপাতী। — ৭৫।

শ্লেগেল (Schlegel), **ফ্রিডরিখ** (১৭৭২-১৮২৯) — জার্মান লেখক ও সমালোচক। তারুণ্যে বুর্জোয়া বিপ্লবের আদর্শে আকৃষ্ট হন, কিন্তু অচিরেই আভিজাত্যিক প্রতিক্রিয়ার পক্ষে যোগ দেন। — ৫৭।

হ

হবস (Hobbes), **টমাস** (১৫৮৮-১৬৭৯) — ইংরেজ বস্তুবাদী দার্শনিক। হবস মনে করতেন 'স্বাভাবিক অবস্থায়' সীমাহীন স্বার্থপরতা ও হিংসার রাজত্ব, চলে 'সকলের সঙ্গে সকলের যুদ্ধ'। রাষ্ট্রকে তিনি তুলনা করেছেন বাইবেলোক্ত দানব লেভিয়াথানের সঙ্গে। ধর্ম এবং গির্জা 'সামাজিক লাগাম' হিশেবে রাষ্ট্রের পক্ষে উপকারী মনে করতেন, কিন্তু নিজে ছিলেন নাস্তিক। — ৪৩, ৭২, ১৪২।

হলবাক (Holbach), **পোল আঁরি** (১৭২৩-১৭৮৯) — ফরাসি দার্শনিক, ১৮ শতকের বস্তুবাদের বিশিষ্ট প্রতিনিধি। প্রাক্-বিপ্লব বুর্জোয়ার মতাদর্শী। হলবাকের বস্তুবাদ স্বকালে একটা প্রগতিশীল ভূমিকা নিলেও তার চরিত্র ছিল আধিবিদ্যক ও যান্ত্রিক। — ১৪৩।

হান ফেই (আনুঃ খিঃ পূঃ ২৮০-২৩০) — প্রাচীন চীনের দার্শনিক। কঠোর আইন ও প্রচণ্ড শাস্তির সাহায্যে ক্ষমতার কেন্দ্রীকরণ ও সাম্রাজ্যের আমলাতান্ত্রিক প্রশাসনের পক্ষপাতী। — ৮৩।

হিউম (Hume), **ডেভিড** (১৭১১-১৭৭৬) — ইংরেজ বুর্জোয়া দার্শনিক, অর্থনীতিবিদ ও ঐতিহাসিক। তাঁর দর্শনের মূল দিক হল অজ্ঞেয়বাদ, বিশ্বকে জানা যাবে না এই মত। — ৬৮।

হিপ্পিয়াস (Hippias) (আনুঃ খিঃ পূঃ ৫ শতক) — প্রাচীন গ্রীসের সফিস্ট দার্শনিক। — ৮৭।

হেগেল (Hegel), **গেওর্গ ভিলহেল্ম ফ্রিডরিখ** (১৭৭০-১৮৩১) — ১৮ শতকের শেষ আর ১৯ শতকের গোড়ায় জার্মান ভাববাদী দর্শনের বৃহৎ প্রতিনিধি, যে দর্শন হল ১৮ শতকের ফরাসি বুর্জোয়া বিপ্লব ও ফরাসি বস্তুবাদের বিরুদ্ধে আভিজাতিক প্রতিক্রিয়া। প্রুশীয় রাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রের প্রশংসা করে হেগেল প্রতিক্রিয়াশীল সামাজিক-রাজনৈতিক ভাবনা উপস্থিত করেন। — ১৫, ৫৭, ৫৯ — ৬১, ৬৪, ৬৬—৬৮, ৭৫, ৭৬, ১৪৩, ১৪৬, ১৫৩, ১৬৪, ১৭২—১৭৫।

হেরাক্লিটাস (Heraclitus) (আনুঃ খিঃ পূঃ ৫৩০-৪৭০) — প্রাচীন গ্রীসের বস্তুবাদী দার্শনিক. প্রাচীন যুগের দ্বন্দ্বতত্ত্বের প্রতিষ্ঠাতা। তাঁর মতে 'বিশ্ব সব নিয়ে এক, ঈশ্বর বা লোকে তা সৃষ্টি করে নি, আছে এবং থাকবে চিরন্তন জীবন্ত অগ্নি, নিয়মানুগততায় তা জ্বলবে আর নিভবে'। — ৬৪, ৬৭, ৭৬, ৮৭, ১২৩, ১৭৫।

হেরেমি (Ieremiah) (খিঃ পূঃ ৭ শতকের দশম বছর-৫৮৬-এর পর) — 'মহা পয়গম্বরদের' একজন। 'ওল্ড টেস্টামেণ্ট' এর যে অংশ তাঁর নামাঙ্কিত, তার মূলভাবে আছে তাঁর প্রচার ও বাণী। ইহুদি'র সবচেয়ে প্রবল শত্রু ব্যাবিলনের সঙ্গে শান্তির প্রয়োজনীয়তা প্রচার করেন। — ৮৩।

হেরোডোটাস (Herodotus) (আনুঃ খিঃ পূঃ ৪৮৪-৪২৫) — প্রাচীন গ্রীসের ঐতিহাসিক, 'ইতিহাসের পিতা' বলে অভিহিত। তাঁর প্রধান রচনা 'গ্রীস-পারস্য যুদ্ধের ইতিহাস'। — ৮৫, ৮৬।

হের্ডার (Herder), **ইয়োহান গটফ্রিড** (১৭৪৪-১৮০৩) — ১৮ শতকের বুর্জোয়া আলোকপ্রাপ্তির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট জার্মান মনীষী ও তাত্ত্বিক। — ৫৭।

হেলভেশিয়াস, (Helvetius), **ক্লদ আদ্রিয়ান** (১৭১৫-১৭৭১) — প্রমুখ ফরাসি বস্তুবাদী দার্শনিক, ১৮ শতকের ফরাসি বিপ্লবী বুর্জোয়ার ভাবাদর্শী, সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থা ও ক্যাথলিক ধর্মের সমালোচনা করেন। বুর্জোয়া ব্যবস্থাকে তিনি বর্ণনা করেছেন সর্বজনীন সুখের ব্যবস্থা বলে। — ১৪৩।

হেসিওড (Hesiod) (খিঃ পূঃ ৮-৭ শতক) — প্রাচীন গ্রীসের কবি। 'শ্রম ও দিন' এবং 'থিয়োগোনি' নামে কাব্য লেখেন। প্রথমটিতে প্রাচীন কালের কৃষি শ্রম বর্ণিত হয়েছে, দ্বিতীয়টিতে গোছানো হয়েছে দেবতাদের উদ্ভবের অতিকথাগুলি। — ৮৬।

হোমার (Homer) — প্রাচীন গ্রীসে কিংবদন্তী হয়ে ওঠা মহাকবি খিঃ পূঃ ১২-৮ শতকের মধ্যে তাঁর জন্ম। রচনা করেন 'ইলিয়াড' ও 'ওডেসি' মহাকাব্য। তার একটিতে ট্রয় যুদ্ধের যে বিবরণ দেওয়া হয়েছে তার ভিত্তিতে আবিষ্কৃত হয়েছে প্রাচীন ট্রয় নগর। — ৮৬।